পিশাচ কাহিনী

পিশাচ দেবতা

অনীশ দাস অপু





পিশাচ কাহিনী

পিশাচদেবতা

অনীস দাস অপু

হরর গল্প-প্রিয় পাঠকদের জন্য এ বই। বইটিতে চমৎকার কিছু হরর কাহিনী সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা পড়ে পাঠক কখনও আঁতকে উঠবেন ভয়ে, কখনও বা শিউরে উঠবেন।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পিশাচ কাহিনী

পিশাচদেবতা

অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী



ISBN 984-16-0228-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

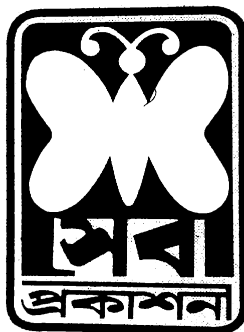
প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮-১৯০২০৩



চল্লিশ টাকা

PISHACHDEBOTA
Horror Stories
By:
Anish Das Apu

পিশাচ কাহিনী

পিশাচদেবতা

অনীশ দাস অপু

পিশাচদেবতা : ৭৮–২০০

পিশাচদেবতা

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

হেনরিকাস ভ্যানিং-এর সেদিনের অনুষ্ঠানে যাওয়া আমার মোটেই ঠিক হয়নি। ওর দাওয়াত যদি ফিরিয়ে দিতাম, খুব ভাল করতাম। তাহলে সেই রাতের ওই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি আমাকে আর তাড়া করে ফিরত না। নিউ অরলিন্স ছেড়ে যাচ্ছি বটে, চোখ বুজলেই ভেসে উঠছে ব্যাখ্যার অতীত ঘটনাগুলো। ইস্! কেন যে মরতে সেদিন রাস্তায় বেরিয়েছিলাম।

নিউ অরলিন্স এসেছিলাম লেখালেখির কিছু কাজ করতে। এক বহুলপঠিত পত্রিকার সম্পাদক খুব করে ধরেছিলেন মিশরীয় সভ্যতার ওপর কিছু গল্প লিখে দিতে। তিনি জানতেন রহস্যময় এই সভ্যতার প্রতি আমার নিজের আগ্রহও যথেষ্ট। বিশেষ করে মিশরীয় ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবী এবং প্রেতশাস্ত্রের ওপর আমার পড়াশোনা প্রচুর। সম্পাদকের অনুরোধ ফেলতে না পেরে সিদ্ধান্ত নিলাম মিশরীয় দেবতাদের নিয়ে এবার অন্যরকম কিছু গল্প লিখব। একটু নিরিবিলির জন্য তাই নিউ অরলিন্সের লুইজিয়ানা সিটিতে চলে এসেছি। এখানে এই প্রথম আমি। বেশ একা লাগল। প্রথম দুটো দিন অবশ্য গেল খসড়া তৈরি করতে। টাইপরাইটারের একঘেয়ে খটাখট শব্দে ক্লান্তি এসে গেল। মিশরীয় দেবতা নায়ারলাথোটেপ, বুবাস্টিস আর অ্যানুবিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে বেজায় বিরক্তি ধরে গেল। ঘরের কোণে বসে থাকতে ভাল লাগল না। শরীরে ঘুণ ধরে গেছে এই দু'দিনেই। তৃতীয় দিনে আর পারলাম না। ছড়ানো কাগজ-পত্র ওভাবে রেখেই সন্ধ্যা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। বুকটা খাঁ খাঁ করছে এক ঢোক পানীয়র জন্য। হাতের কাছের একটা কাফেতে ঢুকে পুরো এক বোতল ব্রান্ডি নিয়ে বসে গেলাম একটা টেবিলে। ঘরটা গরম, লোকের ভিড়ও প্রচুর; আজ কি যেন একটা উৎসব। তাই সবাই বিচিত্র পোশাকে সেজেছে।

চার পেগ গেলার পর পরিবেশটা আর আগের মত অসহনীয় মনে হলো না। আমার পাশে ক্লাউনের পোশাক পরা যে মোটা লোকটাকে দেখে ঘণ্টাখানেক আগে হাসি চাপা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল, এখন ওর জন্যেই কেমন মায়া হতে লাগল। মুখোশের আড়ালে লোকটার যাবতীয় দুঃখ কষ্ট আর বেদনার চিত্র যেন উপলব্ধি করতে পারলাম আমি। আশপাশের লোকজনের প্রতিও করুণা বোধ করলাম। ওরা সবাই যেন জাগতিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এখানে জড় হয়েছে। আমিও তো ওদের মতই একজন।

এসব আগাড়ম বাগাড়ম ভাবতে ভাবতে কখন বোতলটা শেষ করে ফেলেছি মনে নেই। বিল চুকিয়ে পা রাখলাম রাস্তায়, আরেকটু হাঁটব। তবে এবার আর নিজেকে আগের মত একাকী মনে হলো না। বরং উৎসবের রাজা ভাবতে ভাল লাগল নিজেকে প্রতিটি পা ফেলার সময়।

উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমি বোধহয় একটা ক্লাব লাউঞ্জে ঢুকে পড়েছিলাম স্কচ আর সোডা খেতে, মনে পড়ছে না ঠিক। তবে আবার হাঁটা শুরু করি আমি। পা জোড়া কোথায় আমাকে নিয়ে চলেছে নিজেও জানি না। শুধু মনে

হচ্ছে ভেসে চলেছি। তবে চিন্তা করার শক্তি হারাইনি।

আমি ভাবছিলাম লেখাগুলো নিয়ে। ভাবতে ভাবতে কখন প্রাচীন মিশরের হারানো সময়ে ফিরে গেছি, কে জানে!

মনে হলো হালকা অন্ধকার, জনশূন্য একটা রাস্তায় ঢুকে পড়েছি আমি।

হাঁটছি থিবস মন্দিরের মাঝখান দিয়ে, স্ফিংক্স-এর পিরামিডগুলো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

হঠাৎ মোড় নিলাম আলোকিত এক পথের দিকে। এখানে উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা নাচছে।

আমিও মিশে গেলাম সাদা কাপড় পরা পাদ্রীদের মাঝে।

তারপর একের পর এক পাল্টাতে লাগল দৃশ্য।

কখনও মনে হলো ক্রিয়োল শহরে ঢুকে পড়েছি আমি। শহরের লম্বা, উঁচু প্রাচীন বাড়িগুলোর আশপাশ শূন্য, অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। আবার কখনও মনে হলো একটা হাজার বছরের পুরানো মন্দিরে প্রবেশ করেছি আমি। মন্দিরের সেবা দাসীরা বিশ্বাসঘাতক দেবতা ওসিরিসের রক্তের মত লাল গোলাপ ছিটিয়ে দিচ্ছে আমার গায়ে।

আবার যেন বহু প্রাচীন এক নগরীতে ঢুকে পড়লাম আমি। শত বছরের পুরানো, অন্ধকার বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে এক সারে, গাদাগাদি করে। খালি ঘরগুলো যেন কঙ্কালের খুলির মণিহীন কোটর, যেন অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে খুলিগুলোতে।

রহস্য।

মিশরের রহস্য।

ঠিক এই সময় লোকটাকে চোখে পড়ল আমার। অন্ধকার, ভৌতিক রাস্তাটা দিয়ে ভোজবাজির মত আমার পাশে উদয় হলো সে। দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ, আমি কি করি যেন দেখতে চায়। দ্রুত পাশ কাটাতে গেলাম, কিন্তু নিথর দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার একটা ব্যাপার আমার নজর কাড়ল হঠাৎ। লোকটার পোশাক—সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

ঝাঁকি খেলাম যেন একটা, কল্পনার জগৎ থেকে দ্রুত ফিরে এলাম বাস্তবে।

লোকটার পরনে প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিতদের পোশাক।

একি সত্যি দৃষ্টি বিভ্রম নাকি ওসিরিস-এর সাজে সেজেছে সে? ওই লম্বা, সাদা আলখেল্লাটাকে অস্বীকার করি কিভাবে? লোকটার হাড্ডিসার, সরু হাত দু'খানা যেন সর্পদেবতা সেট-এর হাত।

লোকটার দিকে স্রেফ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। চোখে চোখ রাখল সে, পাতলা, টানটান মুখখানা শান্ত, অভিব্যক্তিহীন। একটা ঝাঁকি দিয়ে আলখেল্লার মধ্যে হাত ঢোকাল সে দ্রুত। আমি আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেলাম, হাতটা বের করল আগন্তুক পকেট থেকে—একটা সিগারেট।

'দেশলাই হবে, ভাই?' জিজ্ঞেস করল মিশরের পুরোহিত!

এই প্রথম হাসলাম আমি, মনে পড়েছে এই মুহূর্তে কোথায় আছি। শালার মদ আমাকে ধরেছিল খুব। কিসব উদ্ভট চিন্তা করেছি এতক্ষণ। দ্রুত মাথাটা পরিষ্কার

হয়ে এল। লাইটার বাড়িয়ে দিলাম লোকটার দিকে। আগুন জ্বালল সে, শিখার আলোয় কৌতূহল নিয়ে তাকাল আমার দিকে।

লোকটার বাদামী চোখ দেখে মনে হলো যেন চিনতে পেরেছে আমাকে। অবাক হয়ে গেলাম ওর মুখে আমার নাম শুনে। মাথা ঝাঁকালাম সায় দেয়ার ভঙ্গিতে।

'কি আশ্চর্য!' মুখ টিপে হাসল সে। 'আপনিই তাহলে সেই স্বনামধন্য লেখক? আপনার তো মস্ত ভক্ত আমি, সাহেব। সম্প্রতি প্রকাশিত বইটাও পড়ে ফেলেছি। কিন্তু বুঝলাম না নিউ অরলিন্সে কি করছেন আপনি।'

অল্প কথায় ব্যাখ্যা করলাম ওকে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'পরিচিত হয়ে সৌভাগ্যবান মনে করছি নিজেকে। আমার নাম ভ্যানিং–হেনরিকাস ভ্যানিং। আমিও আপনার মতই প্রেতশাস্ত্রে ভীষণ আগ্রহী।'

আলাপে ওস্তাদ লোক ভ্যানিং। জমিয়ে ফেলল কয়েক মিনিটের মধ্যে। অথবা বলা যায় সে একভাবে বকবক করে গেল আর আমি শুধু শ্রোতার ভূমিকা পালন করলাম। জানলাম মি. ভ্যানিং প্রচুর সহায়-সম্পত্তির মালিক, ধর্মীয় পুরাণ বা শাস্ত্রের ওপর তার সংগ্রহ যেমন বিস্তর, পড়াশোনাও করেছে প্রচুর। বিশেষ করে মিশরের ওপর তার আগ্রহ সীমাহীন। কথায় কথায় ভ্যানিং জানাল ওদের একটা দল আছে যারা অধিবিদ্যা নিয়ে প্রায়ই গঠনমূলক আলোচনায় বসে, এ নিয়ে গবেষণাও করে। এ ব্যাপারটা আমাকেও আগ্রহী করে তুলতে পারে, এমন একটা আভাসও দিল ভ্যানিং।

হঠাৎ যেন আবেগে উথলে উঠল সে, আমার হাতদুটো চেপে ধরে ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল, 'আজ রাতে কি করছেন?'

জানালাম কাজ-কাম করতে ভাল লাগছে না। তাই দিবা-স্বপ্ন দেখছি। হাসল সে।

'বেশ! আমি খানিক আগে ডিনার সেরেছি। বাড়ি যাচ্ছিলাম কয়েকজন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে। এরা আমার সেই ছোট্ট দল–যাদের কথা একটু আগেই বলেছি আপনাকে–ওদের নিয়ে একটা পার্টির ব্যবস্থা করেছি ওখানে। যাবেন নাকি? কস্টিউম পার্টি। মজা পাবেন।'

'কিন্তু আমার পরনে তো কোন কস্টিউম নেই,' বললাম আমি।

'তাতে কিছু হবে না। আপনি এমনিই পার্টি উপভোগ করতে পারবেন। একেবারে আলাদা জিনিস। চলুন তাহলে।'

ওকে অনুসরণের ইশারা করে আগে আগে হাঁটতে শুরু করল হেনরিকাস ভ্যানিং। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের জয় হলো। তাই সদ্য পরিচিত লোকটার পেছন পেছন এগোলাম আমি।

হাঁটতে হাঁটতে বাকপটু ভ্যানিং তার বন্ধুদের সম্পর্কে বলতে শুরু করল। ওরা যে ক্লাব করেছে তার নাম দিয়েছে কফিন ক্লাব। চিত্রকলা, সাহিত্য আর সঙ্গীত নিয়েই দলের সদস্যদের সময় কাটে। তবে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু শিল্পকলার এই তিনটে মাধ্যমের অন্ধকার দিকগুলো।

ভ্যানিং জানাল, আজ রাতে দলটা অদ্ভুত, নিজস্ব সাজে সাজবে। কারণ আজ তাদের একটি বিশেষ উৎসবের দিন। ডাকাত, ক্লাউন, জলদস্যু ইত্যাদি গতানুগতিক

সাজ আজকের দিনে মোটেই চলবে না। অতি প্রাকৃত সাজে সাজতে হবে সবাইকে। মনে মনে চিন্তা করলাম ওরা নিশ্চয়ই ওয়্যারউলফ, ভ্যাম্পায়ার, পুরোহিত, কালো জাদুকর ইত্যাদির রূপ ধরবে। এসব ব্যাপারে আমার আগ্রহও আছে। কারণ অকাল্ট শাস্ত্রের ওপর পড়াশোনা করে নিজের অজান্তে এসব আধি ভৌতিক ব্যাপারগুলোর প্রতি কবে ঝুঁকে পড়েছি এখন আর তা মনে নেই। ভ্যানিং-এর সাথে যেতে যেতে নতুন কিছু দেখার আশায় মনে মনে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠছিলাম।

হেনরিকাস ভ্যানিং-এর সাথে কথা বলতে এমন মশগুল ছিলাম যে, কোত্থেকে কোথায় এসে পড়েছি জানি না। শেষমেশ আমাদের গতি শ্লথ হয়ে এল গুল্মাচ্ছাদিত লম্বা, সরু একটি রাস্তার মুখে এসে। রাস্তাটার শেষ মাথা গিয়ে ঠেকেছে যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আলোকিত এক রাজ প্রাসাদ।

ভ্যানিং-এর বাকচাতুরীতে মুগ্ধ আমি প্রাসাদের চারপাশে ভাল করে চোখ বোলালাম না পর্যন্ত, দরজা খোলা ছিল, সেই দরজা দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেলাম আমরা—প্রবেশ করলাম নির্জলা এক আতঙ্কের জগতে।

বিশাল বাড়িটার সব জায়গায় আলো জ্বলছে। রক্তের মত টকটকে লাল আলো।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা হলওয়েতে; নরকের মত হলওয়ে। লাল আলোর ছুরি যেন আয়না ঘেরা দেয়ালের ওপরের অংশ কেটে বেরুচ্ছে। সিঁদুররঙা ঝালর টানানো ভেতরের প্রবেশ পথে, ফায়ারপ্লেসের ধিকি ধিকি জ্বলা আগুনের শিখার ছায়া তিরতির করে কাঁপছে গাঢ় লাল সিলিং-এ, যেন আগুন ধরে গেছে। খোদ শয়তানের মত চেহারার এক বাটলার আমার হ্যাটটা নিয়ে হাতে ধরিয়ে দিল চেরী ব্রান্ডি বোঝাই সুদৃশ্য পানপাত্র।

লাল ঘরে একা আমি, ভ্যানিং ফিরল আমার দিকে, ওর হাতেও একটা গ্লাস।

'পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য ঘরটা এভাবে সাজিয়েছি। পো-র গল্প থেকে আইডিয়াটা সামান্য ধার করা।'

লোকটার খেয়ালী স্বভাব আমাকে বেশ অবাক করল। কি যেন করতে চাইছে ও। মিশরের পুরোহিতের ছদ্মবেশধারীর হাতে খালি গ্লাসটা দেয়ার সময় আমি কেন জানি সামান্য শিউরে উঠলাম।

'এখন চলুন—অতিথিদের সাথে দেখা করে আসি।' একটা ট্যাপেস্ট্রি একপাশে ঠেলে সরাল ভ্যানিং, আমরা ডানদিকে গুহার মত একটা ঘরে ঢুকলাম।

এ ঘরের দেয়ালগুলো সব সবুজ আর কালো পর্দায় ঢাকা; কুলুঙ্গির মোমবাতি শুধু আলোকিত করে রেখেছে ঘরটাকে। আসবাবপত্রগুলো আধুনিকই বলা যায়, তবে বৈচিত্র্যহীন। আমন্ত্রিত অতিথিদের ভিড়ের দিকে যখন তাকালাম, মনে হলো বুঝি স্বপ্ন দেখছি।

'ওয়্যারউলফ, দেব-দেবী এবং পিশাচ জাদুকর,' বলেছিল ভ্যানিং। কিন্তু এখানে তারচেয়েও অদ্ভুত সব লোকজন হাজির, যেন নরক থেকে নেমে এসেছে সব ক'টা। বীভৎস এবং অশ্লীল ভঙ্গি করছে সবাই। কেউ সেজেছে এক চোখো দানব, কেউ কানা-খোঁড়া, কেউ আবার পিশাচ। কালো জাদুকরদেরও চোখে পড়ল। বিকট চেহারার ডাইনীও নজর এড়াল না।

এবার ভ্যানিং-এর তাড়ায় ভিড়টার সাথে মিশে যেতে হলো আমাকে, সবার সাথে পরিচয় হলো। মুখোশ খুলতেই একেকজন নিপাট চেহারার ভদ্রলোক এবং সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হলো।

প্রায় ডজনখানেক অতিথি উপস্থিত ঘরে। পরিচয় হলেও খুব দ্রুত ভুলে গেলাম সবার নাম। ভ্যানিং আমার কনুই ধরে টেনে নিয়ে গেল এক কোণে। 'আরে, এদের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করছেন কেন?' গলা নামাল সে। 'আমার সাথে আসুন। আসল লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।'

ঘরের এক কোণে চারজনের একটা দল বসে ছিল। সবার পরনে ভ্যানিং-এর মত পুরোহিতদের পোশাক। এক এক করে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ভ্যানিং।

'ড. ডেলভিন,' বুড়ো এক মানুষ, বেবিলোনিয়ান।

'আঁতিয়েন ডি মারগনি,' অ্যাডোনিসের প্রিস্ট, হ্যান্ডসাম। গায়ের রঙ কালো।

'প্রফেসর উইলড্যান,' দাড়িওয়ালা, প্রায় বামন আকৃতির মানুষটা। মাথায় পাগড়ি।

'রিচার্ড রয়েস,' অল্পবয়েসী, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার তরুণ।

চারজনেই বিনীত ভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে নড করল। ভ্যানিং বলল, 'আমার দলের এই চারজনই আসল লোক। আমরা সবাই প্রেত চর্চায় বিশ্বাসী।'

চমকালাম না। কারণ অকাল্ট শাস্ত্রের প্রতি যাদের প্রবল খিদে, প্রেত চর্চায় তাদের একটু-আধটু আগ্রহ থাকেই।

'এই যে চারজনকে দেখছেন এদের মধ্যে আমার বাঁ পাশের জন অর্থাৎ ড. ডেলভিন এদেশের সবচেয়ে নামকরা জাতি বিজ্ঞানী। ডি ম্যারিগনি প্রখ্যাত অকালটিস্ট–র‍্যানডলফ কার্টারের সাথে যাঁর এক সময় যোগাযোগ ছিল। রয়েস আমার পার্সোনাল এইড, আর প্রফেসর উইলড্যান বিখ্যাত মিশর-বিজ্ঞানী।' ভারি মজা তো! ভাবলাম আমি। মিশর নিয়ে গল্প লিখছি। এখানেও সেই মিশর!

'আপনাকে কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। অবশ্যই তা দেখতে পাবেন। আধঘণ্টাটাক আমাদেরকে এই পার্টিতে কাটাতে হবে। তারপর আসল সেশন করতে আমরা ওপরে, আমার ঘরে যাব। আশা করি ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকবেন।'

ভ্যানিং আমাকে নিয়ে আবার ঘরের কেন্দ্রের দিকে এগোতে শুরু করলে ওরা চারজন 'বো' করল। নাচ থেমে গেছে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সবাই গল্প-গুজবে মত্ত। দু'একজনের সাথে হালকা দু'একটা কথাও বললাম। এইসময় দেখলাম–তাকে।

স্রেফ এডগার অ্যালান পো'র গল্প মনে পড়ে গেল আমার তাকে দেখে। ঘরের শেষ মাথার কালো-সবুজে মেশানো পর্দা ফাঁক হয়ে গেল, সে পা রাখল ভেতরে, যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল আগন্তুক।

মোমের রূপালী আলো পড়েছে তার গায়ে, হাঁটতে শুরু করল সে, প্রতিটি পদক্ষেপে অশুভ এবং ভয়ঙ্কর কি যেন একটা বিচ্ছুরিত হতে লাগল তার শরীর থেকে। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো বুঝি একটা প্রিজমের মাঝখান থেকে

দেখছি তাকে, কাঁপা আলোয় তার নড়াচড়া আমার কাছে অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ মনে হলো।

মিশরের আত্মা সেজে এসেছে সে।

লম্বা, সাদা আলখেল্লায় ঢাকা তার হাড্ডিসার শরীর। ঝুলঝুলে আস্তিন থেকে বেরিয়ে আসা হাতদুটো পাখির নখের মত বাঁকানো, দামী আংটি পরা আঙুলের মুঠিতে ধরে আছে সোনার একটা লাঠি, আই অভ হোরাসের চিহ্ন সীল করা।

আলখেল্লার ওপরের অংশটা কালো, গলা কাটা; ওটার ওপরে, ঘোমটার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে ভৌতিক একটা মাথা।

মাথাটা কুমিরের। আর ধড়টা মিশরীয় পুরোহিতের।

মাথাটা—এক কথায় ভয়ঙ্কর। কুমিরের মাথার মতই খুলির দিকটা ঢালু, ওপরটা সবুজ আঁশে ভরা; লোমশূন্য, পাতলা, চকচকে, দেখলে বমি আসে। বড় বড় হাড়ের কাঠামোর মাঝখানে অক্ষিকোটর, লম্বা, সরীসৃপ আকৃতির নাকটার পেছনে এক জোড়া চোখ, কটমট করে তাকিয়ে আছে। কোঁচকানো নাকের ফুটো, শক্ত এবং কঠিন দুই চোয়াল সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, বেরিয়ে পড়েছে গোলাপী লকলকে জিভ, খুরের মত ধারাল দাঁতের সারিসহ।

মুখোশ বটে!

আমি প্রশংসার চোখে ওটার দিকে চেয়ে আছি, হঠাৎ যেন ঝাঁকি খেলাম একটা। এখানকার মুখোশধারীদের চেয়ে এই কুমির-মানবের মুখোশটা যেন অনেক বেশি জীবন্ত, মনে হয় সত্যি।

লোকটা বোধহয় একা এসেছে, ওর সাথে কাউকে সেধে কথা বলতেও দেখলাম না। ভ্যানিং-এর কাছে এক লাফে পৌঁছে গেলাম আমি, কাঁধে টোকা দিলাম। লোকটার সাথে পরিচিত হবার ইচ্ছে জেগেছে আমার।

ভ্যানিং আমার দিকে নজর দিল না। সে ব্যস্ত ব্যান্ড পার্টির এক লোকের সাথে কথা বলতে। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, কুমির-মানবের সাথে নিজেই আলাপ করব ভেবে।

চলে গেছে সে।

তীক্ষ্ণ নজর বোলালাম উপস্থিত অভ্যাগতদের ওপর। লাভ হলো না কোন। নেই সে। যেন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অদৃশ্য হয়ে গেল? লোকটার অস্তিত্ব সত্যি ছিল কি? ওকে আমি দেখেছি—বরং বলা যায়—এক পলকের জন্য ওকে আমার চোখে পড়েছে। নাকি আদৌ সে এখানে ছিল না। গোটা ব্যাপারটাই হয়তো আমার কল্পনা। যেভাবে মিশর নামের দেশটা আমার মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে তাতে দৃষ্টিবিভ্রম হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তাহলে মনের মধ্যে খচখচ করে কেন? কেন মনে হয় কল্পনা নয়, বাস্তবিকই দেখেছি আমি তাকে।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় পেলাম না। ভ্যানিং আধঘণ্টার 'ফূর্তি'র ব্যবস্থা করেছে তার দাওয়াতীদের জন্য। গান-বাজনা হবে।

আলোগুলো সব নীলচে হয়ে এল—অস্পষ্ট, কবরখানার মত নীলচে কুয়াশার রঙ। অতিথিরা সবাই নিজেদের আসনে বসতে শুরু করেছে। তাদের ভৌতিক ছায়া

গাঢ় দেখাল। অর্কেস্ট্রা প্ল্যাটফর্মের নিচ থেকে বেজে উঠল একটি যন্ত্র, শুরু হলো সঙ্গীতানুষ্ঠান।

আমার প্রিয় একটা সুর, চাইকোভস্কির 'দ্য সোয়ান লেক' বাজাচ্ছে ওরা। সুরটা যেন গুঞ্জনধ্বনি তুলল, কেঁপে কেঁপে উঠল, কখনও ম্লান হয়ে এল, আবার যেন ভেঙচি কাটল সবাইকে। ওটা ফিসফিসানি শুরু করল, গর্জে উঠল, ভয় দেখাল, হুমকি দিল। এমনকি আমার ভেতরের অস্থিরতাকেও শান্ত করে তুলল মাতাল করা সোয়ান লেক।

মিউজিকের তালে শুরু হলো শয়তানের নাচ; এক জাদুকর আর এক পিশাচ ভয়ঙ্কর নাচ শুরু করে দিল। গোটা ব্যাপারটাই গা কিরকির করা, নোংরা এবং বানোয়াট মনে হলো। শেষপর্যন্ত সব আলো গেল নিভে, ব্যান্ডদল পাগল হয়ে উঠল যেন এবার। এইসময় ভ্যানিং এল আমার কাছে, আমাকে নিয়ে এগোল ঘরের এক দিকে। ওখানে সেই চারজন অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

ভ্যানিং ইশারা করল ওই চারজনকে অনুসরণ করতে। প্ল্যাটফর্মের পাশের পর্দা তুলে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম লম্বা, অন্ধকার একটা হলওয়েতে ঢুকে পড়েছি। ভ্যানিং ওক-কাঠের একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাবি ঢোকাল ফুটোয়, শব্দ করে খুলে গেল তালা। ঢুকলাম একটা লাইব্রেরীতে।

ঘরটা সুসজ্জিত। মদের সরবরাহও প্রচুর। চমৎকার এক গ্লাস কনিয়্যাক পান করার পরে আমার চিন্তা-চেতনাগুলো আবার কেমন ঘোঁট পাকাতে শুরু করল। সবকিছুই অবাস্তব আর অস্বাভাবিক মনে হতে লাগল; ভ্যানিং, তার বন্ধুরা, এই বাড়িটা, গোটা সন্ধ্যা। সবকিছুই যেন একটা কল্পনা। শুধু সেই কুমিরের মুখোশ পরিহিত লোকটা ছাড়া। ওর কথা ভ্যানিংকে জিজ্ঞেস করতেই হবে…

একটা কণ্ঠস্বর হঠাৎ আমাকে পার্থিব জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। কথা বলছে ভ্যানিং, আমাকে ডাকছে। ওর গলা গুরুগম্ভীর শোনাল, অস্থিরতায় কাঁপছে যেন। মনে হলো এই প্রথম যেন ওর গলা শুনছি আমি। এখানে ও-ই একমাত্র বাস্তব, আর সবকিছু কাল্পনিক।

কথা বলছে ভ্যানিং, লক্ষ করলাম পাঁচ জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

ভ্যানিং বলল, 'আমি আপনাকে একটি বিশেষ জিনিস উপহার দেব বলেছিলাম। এখন সে সময় উপস্থিত। তবে বিনাস্বার্থে আপনাকে এখানে আমি নিয়ে আসিনি। আপনাকে আসলে আমার প্রয়োজন ছিল বলে নিয়ে এসেছি। আমি আপনার লেখা গল্প পড়েছি। আমার মনে হয়েছে শ্রোতা হিসেবেও আপনি খুব আন্তরিক হবেন। আপনার পরামর্শ এবং বুদ্ধি দুটোই আমার প্রয়োজন। এজন্যই আমরা একজন অপরিচিত লোককে আমাদের এই গোপন অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছি। আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি—অবশ্যই বিশ্বাস করি।'

'স্বচ্ছন্দে আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।' শান্ত গলায় বললাম। এই প্রথম টের পেলাম ভ্যানিং শুধু উত্তেজিত নয়, নার্ভাসও হয়ে আছে। ওর হাতে ধরা সিগারেটটা কাঁপছে; মিশরীয় ঘোমটার নিচে ঘাম জমেছে কপালে। বয়েস তার

কোমরের বেল্ট ক্রমাগত মুচড়ে চলেছে। বাকি তিনজন চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তাদের নীরবতা ভ্যানিং-এর কণ্ঠের অস্বাভাবিক ওঠানামার চেয়েও অস্বস্তিকর।

কি হচ্ছে এসব? স্বপ্ন দেখছি? নীলাভ আলোর দ্যুতি, কুমিরের মুখোশ, অবশেষে নাটকীয় এক রহস্যময়তা। তারপরও এগুলোকে আমার বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

বিশ্বাস করছি, কারণ ভ্যানিং বড় টেবিলটার একটা পায়ার সুইচে চাপ দিতেই নিচের কৃত্রিম ড্রয়ার খুলে যে ফাঁকটার সৃষ্টি হলো সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। মারিগনির সাহায্যে ওখান থেকে একটা মমির বাক্স বের করে আনল ভ্যানিং। তারপর একটা শেলফ থেকে কিছু বই বগলদাবা করে ফিরল সে, কোন কথা না বলে তুলে দিল ওগুলো আমার হাতে।

বইগুলো দেখেই বুঝলাম এগুলো শুধু দুষ্প্রাপ্যই নয়, অকালটিস্ট ছাড়া এসব বই কারও পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভবও নয়। কাঁচের হালকা মলাট দিয়ে বাঁধানো প্রতিটি বই। এগুলোর মধ্যে আছে বুক অভ আইবন, 'কুল্টে দে গুলস'-এর অরিজিনাল এডিশন, আর অতি বিখ্যাত 'ডি ভারমিস মিস্টিরীজ'।

বইগুলোতে নজর বুলিয়েই আমি বুঝে ফেলেছি এগুলো কি দেখে ভ্যানিং-এর ঠোঁটে চেষ্টাকৃত হাসি ফুটল।

'এগুলো আমরা বহুদিন ধরে লুকিয়ে রেখেছিলাম,' বলল সে। 'জানেনই তো এরমধ্যে কি আছে।'

জানি আমি। কারণ 'ডি ভারমিস মিস্টিরীজ' বইটা আমারই লেখা।

ভ্যানিং আরেকটা বই-এর পাতা খুলে দেখাল। 'এ বইটা সম্পর্কেও আপনি জানেন নিশ্চই। এটার কথা আপনি আপনার একটা লেখায় উল্লেখ করেছিলেন।'

'সারসেনিক রিচুয়াল' লেখা অধ্যায়ে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল সে।

মাথা ঝাঁকালাম। এটাও প্রাচীন, রহস্যময় মিশর নিয়ে লেখা।

আবার সেই মিশর! চট করে একবার চোখ চলে গেল মমি-কেসটার দিকে।

ভ্যানিংসহ অন্যরা আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। একসময় শ্রাগ করল ভ্যানিং।

'শোনো,' আপনি থেকে 'তুমি'তে চলে এল সে হঠাৎ। 'আমি বাজি ধরেছি। তোমাকে আমার বিশ্বাস করতেই হবে।'

'বলে যাও,' অধৈর্য গলায় বললাম আমি। এক কথা বারবার ভাল লাগে না শুনতে।

'ঘটনার শুরু এই বইটা থেকে,' বলল হেনরিকাস ভ্যানিং। 'রয়েস এটার ব্যাপারে আমাকে প্রথম কৌতূহলী করে তোলে। প্রথমে আমরা বুবাস্টিস কিংবদন্তীর ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করি। কর্নওয়ালে ইতিমধ্যে আমি কিছু অনুসন্ধানও চালাই–ইংল্যান্ডে মিশরীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে থাকি। এই সময় মিশর সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার আগ্রহ শতগুণে বেড়ে যায় যখন প্রফেসর উইলভ্যান গত বছর এক অভিযানে মিশর যান। কিছু আবিষ্কার করতে পারলে সেটা আমি তার কাছ থেকে বেশি দামে কিনে নেব এ কথা বলি আমি তাঁকে। গত হপ্তায় উনি ওখান

থেকে ফিরেছেন এই জিনিসটা সাথে নিয়ে।'

মমির বাক্সটার দিকে পা বাড়াল ভ্যানিং। অনুসরণ করলাম ওকে আমি।

ওকে আর বেশি কিছু ব্যাখ্যা করতে হলো না। যা বোঝার বুঝে নিয়েছি।

বাক্সটার ওপর প্রতিলিপি এবং চিহ্ন দেখে বোঝা গেল ওটার ভেতরে জনৈক মিশরীয় পুরোহিতের লাশ আছে। দেবতা সেবেকের পুরোহিত। 'সারাসেনিক রিচুয়ালস'-এ এ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে।

সেবেক সম্পর্কে যা জানি আমি চট করে মনে পড়ে গেল সব। প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সেবেক হলো মিশরের এক দেবতা, নীলনদের উর্বরতার দেবতা। যদি স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের কথা সত্যি হয়, তাহলে সেবেকের চার পুরোহিতের মমি করা লাশের সন্ধান পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত। যদিও এই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার অসংখ্য মূর্তি এবং আকৃতি তৈরি হয়েছে, কবরে আঁকা হয়েছে ছবি। মিশরের বিজ্ঞানীরা সেবেক সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। শুধু নৃবিজ্ঞানী নুডভিগ প্রিন এ নিয়ে যাহোক কিছুটা এগোতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখার কথা মনে পড়তেই হিম একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে।

'সারাসেনিক রিচুয়ালস'-এ প্রিন বলেছেন মরুভূমি আর নীলনদের গুপ্ত উপত্যকার গোপন-কবরস্থান ঘুরে তিনি কি তথ্য পেয়েছেন সে সম্পর্কে।

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এক গল্পের বর্ণনা দিয়েছেন প্রিন। বলেছেন কিভাবে মিশরীয় পুরোহিতবাদ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে–কিভাবে পিশাচ দেবতাদের অনুগতরা সিংহাসনের পেছনে থেকে ফারাওদের শাসন করত এবং গোটা দেশ তাদের মুঠিতে পুরে রাখত। মিশরীয় দেবতা এবং ধর্মের গোটা ব্যাপারটাই ছিল গোপন বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে। অদ্ভুত শংকর জাতীয় প্রাণীরা হাঁটত পৃথিবীর মাটিতে; দানবীয়, বিকট ছিল তাদের চেহারা–আধা পশু আধা মানুষ। মানুষের শুধু সৃষ্টি ছিল না বিশালদেহী সাপ দেবতা সেট, প্রচণ্ড পেটুক বুবাস্টিস, এবং বিরাট অসিরিস কিংবা শিয়ালমুখো অ্যানুবিস কিংবা ওয়্যারউলফ।

প্রাচীন পুরুষরা প্রবল ক্ষমতা নিয়ে দেশ শাসন করত, পশুরা ছিল তাদের আজ্ঞাবহ। দেবতাদের ইচ্ছে করলেই তারা ডেকে পাঠাত। সেই দেবতাদের চেহারা ছিল মানুষের মত, মাথা পশুর।

যখন তারা মিশরে রাজত্ব করত তখন তাদের কথাই ছিল আইন। দেশ জোড়া ছিল শুধু দামী দামী মন্দির, দেবতাদের উদ্দেশে বলি দেয়া হত মানুষ। পশুমুখো দেবতারা সব সময় উন্মাদ থাকত রক্তের তৃষ্ণায়। অমরত্ব আর পুনর্জন্মের লোভে তারা দেব-দেবীকে তুষ্ট করত তাদের প্রবল খিদে মেটানোর ব্যবস্থা করে। মমিতে যেন পচন না ধরে এ জন্য মানুষের রক্ত মাখিয়ে দিত কফিনে। এজন্য কত মানুষকে যে জীবন দিতে হয়েছে তার হিসেব নেই।

প্রিন সেবেক দেবতার কথাও বিস্তারিত বলেছেন। পুরোহিতরা বিশ্বাস করত উর্বরতার দেবতা সেবেক অমর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দেবতা কবরে তাদের অনন্তকাল পাহারা দিয়ে রাখবে যতদিন না শেষ বিচারের দিন মৃত ব্যক্তিদের আত্মা কবর থেকে ওঠে, ততদিন। আর যারা তাদের কবরে, চিরনিদ্রার শান্তি বিঘ্নিত করবে সেবেক সেই শত্রুদের ধ্বংস ডেকে আনবে। এজন্য পুরোহিতরা তাকে

কুমারীদের উৎসর্গ করবে তার উদ্দেশে, এদের ছিঁড়ে খাবে সোনার কুমির। আর সে কুমির হলো দেবতা সেবেক স্বয়ং, যার শরীর মানুষের, মাথা কুমিরের।

উৎসবের সেই বর্ণনা বড় ভয়ানক। পুরোহিতরা সেই ভয়ঙ্কর উৎসবে তাদের প্রভুর মত কুমিরের মুখোশ পরে। প্রতি বছর, তাদের ধারণা, সেবেক নিজে এসে হাজির হয় মেমফিসের মন্দিরে, সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন পুরোহিতদের সামনে আধা মানুষ আধা কুমিরের বেশে।

পুরোহিতরা বিশ্বাস করত সেবেক তাদের কবর পাহারা দেবে। আর তাদের এই বিশ্বাসের বলি হতে হত ওই উৎসবের দিনে অগুনতি কুমারী মেয়েদের।

প্রিন-এর বইয়ের দৌলতে এ সব কথাই আমার জানা। সেবেকের পুরোহিতের মমির দিকে দ্রুত একবার চোখ বোলালাম কথাগুলো মনে পড়তে।

দেখলাম মমির গা থেকে কাপড় খুলে ফেলা হয়েছে, শুয়ে আছে একটা গ্লাস প্যানেলের নিচে।

'তুমি তো গল্পটা জানোই,' আমার চোখের ভাষা পড়তে পেরেছে ভ্যানিং। 'হপ্তা খানেক হলো মমিটা আছে আমার কাছে; রাসায়নিকভাবে এটাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। অবশ্য এ ধন্যবাদ উইলড্যানের প্রাপ্য। পরীক্ষা করতে গিয়ে এই জিনিসটা মমির বুকের ওপর পাই আমি।'

একটা জেড পাথরের কবচের দিকে ইঙ্গিত করল ভ্যানিং, কুমির আকৃতির কবচ, গায়ে দুর্বোধ্য হরফে কি যেন লেখা।

'কি এটা?' জানতে চাইলাম আমি।

'পুরোহিতবাদের গোপন কোড। ডি মারিগনির ধারণা এটা নাকাল ভাষা। যার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়–প্রিনের গল্পের সেই অভিশাপের মত–কবর লুঠকারীদের ওপর অভিশাপ। সেবেক নিজের হাতে তাদের শাস্তি দেবে এসব কথা। অনেক অশ্লীল ভাষা।'

বাক্যবাগীশ ভ্যানিংকে জোর করে কথাগুলো বলানো হলো। ড. ডেলভিন খামোকা খক খক করে কাশতে শুরু করলেন; রয়েসকে আবার তার বেল্ট মোচড়ানো রোগে পেয়ে বসল; ডি মারিগনি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল। বামন প্রফেসর উইলড্যান এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মমিটার দিকে, যেন মণিহীন কোটরের ভেতর থেকে সব রহস্যের সমাধান পেতে চাইছেন।

'আমার ধারণার কথা ওকে জানিয়ে দাও, ভ্যানিং,' মৃদু স্বরে বললেন তিনি।

'উইলড্যান এখানে কিছু তথ্যানুসন্ধান করেছেন। কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে মমিটা এখানে নিয়ে আসতে ওঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এটার সন্ধান তিনি কোথায় পেয়েছেন তাও বলেছেন। সে বড় রোমহর্ষক কাহিনী। দেশে ফেরার সময় ক্যারাভানের নয়টা ছেলে মারা যায়, ধারণা করা হয় দূষিত পানি তাদের মৃত্যুর কারণ। একমাত্র প্রফেসরই জীবিত ফেরার সৌভাগ্য লাভ করেন।'

'তবে আমি আরও অনেকদিন বাঁচতে চাই,' ধারাল গলায় বললেন উইলড্যান। 'এই মমিটাকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে বলেছিলাম। কারণ এটা অশুভ। এখানে এটাকে যে কাজে আনা হয়েছে তা কখনোই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

কারণ আমি সেবেকের অভিশাপে বিশ্বাস করি।

'আপনারা জানেন, সেবেকের মাত্র চার পুরোহিতের মমির সন্ধান মিলেছে। বাকিদের সন্ধান পাওয়া যায়নি কারণ খুব গোপনে তাদের কবর দেয়া হয়েছে। যারা এই চারটে মমির খোঁজ দিয়েছে তাদের সবার কপালেই জুটেছে নির্মম মৃত্যু। প্যারিংটন নামে একজনকে আমি চিনি। তৃতীয় মমির সন্ধান পেয়েছিল সে। অভিশাপের ব্যাপারটা সত্য কিনা তাই অনুসন্ধান করছিল প্যারিংটন। কিন্তু দেশে ফেরার পরে, রিপোর্ট প্রকাশ করার আগেই মারা যায় সে। তার মৃত্যুও হয়েছিল অদ্ভুতভাবে, লন্ডনের চিড়িয়াখানায়, ব্রিজের রেলিং ফস্কে, নিচে কুমিরের গর্তে পড়ে যায় প্যারিংটন। ওরা যখন তাকে উদ্ধার করে, ছিন্ন ভিন্ন বিকৃত লাশটাকে মানুষ বলে চেনার উপায় ছিল না।'

ভ্যানিং তাকাল আমার দিকে। বেশ সিরিয়াস গলায় বলল, 'শুনলে তো সব কথা। এজন্যই তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি আমি। একজন প্রেতশাস্ত্রবিদ এবং পণ্ডিত হিসেবে তোমার নিজস্ব মতামত চাই আমরা। এই মমিটাকে কি সত্যি ফেলে দেব আমরা? তুমি এই অভিশাপের গল্পে বিশ্বাস করো? আমি করি না, তবে অস্বস্তি হয় শুনলে। প্রচুর কাকতালীয় ঘটনার কথা আমি জানি, প্রীনের সত্যবাদিতার প্রতিও আমার অবিশ্বাস নেই। মমিটাকে দিয়ে আমরা কি করব বা করতে চেয়েছি সেটা মুখ্য ব্যাপার নয়। এতে হয়তো এটাকে অপবিত্র করা হবে। চাই না কোন দেবতা আমাদের ওপর গোস্বা করুক। কুমিরমুখো কোন প্রাণী আমার গলা কামড়ে দেবে তাও চাই না। এখন তুমি কি বলো?'

আমার হঠাৎ সেই মুখোশধারী লোকটার কথা মনে পড়ে গেল। দেবতা সেবেকের ছদ্মবেশে সে এসেছিল।

লোকটার কথা ভ্যানিংকে জানালাম। 'কে সে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'অসাধারণ ছদ্মবেশ নিয়েছিল সে।'

ভ্যানিং-এর মুখ সাদা হয়ে গেল কথাটা শুনে। তার আঁতকে ওঠা দেখে মনে মনে অনুতপ্ত হলাম। এভাবে লোকটাকে ভয় না দেখালেও চলত।

'আমি তো দেখিনি! শপথ করে বলেছি অমন কাউকে আমি পার্টিতে দেখিনি। লোকটাকে এক্ষুণি খুঁজে বের করতে হবে।'

'হয়তো ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছিল লোকটা,' বললাম আমি। 'তোমার কাছ থেকে টাকা হাতানোর তালে।'

'হতে পারে,' কেঁপে গেল ভ্যানিং-এর গলা। অন্যদের দিকে ঘুরল সে।

'তাড়াতাড়ি,' বলল ও। 'অতিথিদের ঘরে যাও। সবার ওপর নজর বোলাও। ওই লোকটাকে খুঁজে বের করো। ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে।'

'পুলিশ ডাকব?' নার্ভাস ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল রয়েস।

'আরে বোকা, না। যাও যাও। শিগগির।'

তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল চারজন। বাইরের করিডরে পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি হয়ে বাজল কিছুক্ষণ।

একটু নীরবতা। হাসার চেষ্টা করল ভ্যানিং। আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। মিশর নিয়ে যে স্বপ্ন আমি দেখি, কল্পনা করি, গল্প লিখি তা কি সব সত্যি? মুখোশধারী ওই

লোকটার কথা বারবার ভাবছি কেন আমি? ওই অভিশাপের ব্যাপারটা কি সত্যি? নাকি ভ্যানিং আজগুবী একটা গল্প ফেঁদেছে।

হঠাৎ হালকা একটা শব্দ হলো…

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালাম, দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে সেই মুখোশধারী কুমির-মানব।

'ওই, ওই যে সে!' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'সেই–' টেবিলের গায়ে হেলে গেল ভ্যানিং, ছাই হয়ে গেছে মুখ। চৌকাঠের দিকে তাকাল সে, দৃষ্টি ফিরে এল আমার দিকে, উদ্‌ভ্রান্ত। মৃত্যুর ছায়া দেখলাম ওর চোখে।

কুমিরের মুখোশ পরা ওই লোকটা…আমি ছাড়া আর কেউ ওকে দেখেনি। একি আসলেই মুখোশধারী কেউ নাকি পিশাচদেবতা সেবেক স্বয়ং? তার কবর খোঁড়ার অপরাধে এসেছে প্রতিশোধ নিতে?

দোরগোড়ায় দাঁড়ানো মূর্তিটাকে আমার অশুভ এবং ভয়ঙ্কর মনে হলো। স্থির হয়ে আছে। হঠাৎ দড়াম করে শব্দ হতে দেখি কাঁপতে কাঁপতে ভ্যানিং আছাড় খেয়েছে মমির বাক্সটার গায়ে।

তারপর এত দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটে গেল যে আমি নড়াচড়াও ভুলে গেলাম। সরীসৃপ আকৃতিটার দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল, ঢেউ খেলে যেন এগিয়ে এল সে। চোখের পলকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভ্যানিং-এর দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে থাকা শরীরের সামনে। সাদা আলখেল্লার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করল কঠিন, পাখির মত বাঁকানো দুটো হাত। চেপে ধরল ভ্যানিং-এর দুই কাঁধ। হাঁ করল মুখোশধারী, খুলে গেল ক্ষুরধার দাঁতের সারি নিয়ে প্রকাণ্ড চোয়াল। নড়ে উঠল। এগোল ভ্যানিং-এর গলা লক্ষ্য করে।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম আমি বীভৎস দৃশ্যটার দিকে। দানবীয় নাকটা ঠেকে আছে ভ্যানিং-এর ঘাড়ে, কামড় বসাচ্ছে। মাথাটাই শুধু দেখছি আমি ক্যামেরা ক্লোজ-আপের মত।

মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনাটা ঘটল। সংবিৎ ফিরে পেলাম হঠাৎ। সাদা আলখেল্লার একটা আস্তিন ধরে ফেললাম, অন্য খালি হাতটা দিয়ে চেপে ধরলাম খুনীর মুখোশটা।

খুনেটা ঝড়ের গতিতে ঘুরল, নিচু করল মাথা। পিছলে গেল আমার হাত, এক মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল কুমির-মানবের নাক, রক্তাক্ত চোয়াল।

তারপর, একটা ঝলক যেন দেখলাম আমি ঘূর্ণি উঠল হামলাকারীর শরীরে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ভ্যানিং-এর রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন শরীরের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করলাম।

মারা গেছে ভ্যানিং। ওর খুনী অদৃশ্য। দূর থেকে লোকজনের হৈ-হল্লা ভেসে আসছে। আমার এখন দরজা খুলে সাহায্য চাওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু পারলাম না। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিতে থাকলাম। আমার দৃষ্টি ক্রমশ অস্পষ্ট হতে শুরু করল। মনে হলো ঘরের সবকিছু বন বন ঘুরতে শুরু করেছে–রক্তমাখা বই; শুকনো মমি, ওটার বুকেও রক্ত লেগে গেছে ধস্তাধস্তির সময়; আর রক্তাক্ত, অসাড় ওই মাংসল জিনিসটা। সব কেমন ঘোলাটে হতে লাগল।

ঠিক তখন, ওই সময় যেন চেতনা ফিরে পেলাম আমি। ঘুরেই দিলাম দৌড়।

এর পরের ঘটনা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে আমার। মৃত ভ্যানিংকে রেখে চিৎকার করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি আমি। যেন মুখোশধারী সেই পিশাশদেবতা তাড়া করেছে আমাকে। দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই রাস্তায়। কারা যেন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল।

তার পরদিনই নিউ অরলিন্স ছেড়ে চলে আসি আমি। ভ্যানিং-এর ব্যাপারে কোন খোঁজ-খবরও নিইনি। এমনকি খবরের কাগজও কিনিনি। ফলে জানা সম্ভব হয়নি পুলিশ ভ্যানিং-এর লাশ খুঁজে পেয়েছিল কিনা বা মৃত্যু রহস্য তদন্ত করেছিল কিনা। এ ব্যাপারে জানার কোন আগ্রহও নেই আমার। বলা উচিত, সাহস নেই।

এ ঘটনার কি ব্যাখ্যা দেব আমি? নিজেকে প্রবোধ দিই–মাতাল ছিলাম। আর মাতালরা নেশার ঘোরে কত কিছুই না দেখে। কিন্তু সেই ব্যাপারটিকে কি করে অস্বীকার করব আমি? সেই যে, পিশাচদেবতার মুখটা চেপে ধরেছিলাম আমি এক হাতে, আর ওটা পিছলে গেল।

সেই মুহূর্তে, যখন আমি রক্তাক্ত সরীসৃপটার নাক চেপে ধরেছিলাম, স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম, আমার হাতের নিচে ওটা কোন মুখোশ নয়, জ্যান্ত একটা প্রাণী!

[মূলঃ রবার্ট ব্লচের 'দ্য সিক্রেট অভ সেবেক']

ভ্যাম্পায়ারের প্রতিহিংসা

গরম! প্রচণ্ড গরম পড়েছে রাজধানীতে। ঢাকা শহরে গ্রীষ্মের সময় এমনিতেও বেশি তাপমাত্রা থাকে। তবে গত কয়েক বছরে এত গরম পড়েনি। তাপমাত্রা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীতে উঠে গেছে। ভয়াবহ গরমে ইতিমধ্যে মারা গেছে দশ জন। সকাল ন'টার পরে রাস্তায় বেরুনোর কথা ভাবলেই শুকিয়ে যায় কলজে। রাস্তার পিচ গলতে শুরু করে দশটা থেকে। এগারোটার পরে ঢাকা প্রায় ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়। লোকজন মগজ ফোটানো গরমে একান্ত বাধ্য না হলে বেরুতেই চায় না। রাস্তা দিয়ে তীব্র ভাপ ওঠে, গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। শুয়োরের মত দরদর করে ঘামে শরীর। যতই পানি খাও, কিচ্ছু লাভ নেই। চোষ কাগজের মত পানিটুকু শুষে নেবে গা, জিভ শুকনো, খরখরেই থাকে। আর কুঁকড়ে যায় ঠোঁট। সারাক্ষণ সাহারা মরুর তেষ্টা বুকের ভেতর। তীব্র উত্তাপ শরীর থেকে শুষে নেয় শক্তি। কুকুরের মত হ্যা-হ্যা করে হাঁপাতে থাকে মানুষ।

পাগল করা গরমের সঙ্গে যোগ হয়েছে ধুলো। ধুলোময় বাতাসে শ্বাস না নিয়ে উপায় নেই। নাক-মুখ দিয়ে ঢুকে পড়ে ধুলো, বন্ধ হয়ে আসে দম।

গরম এবং ধুলো দুই প্রবল প্রতাপশালী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা মুশকিল। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল, তবুও এমন দাবদাহের মাঝে বেরুতে হয়েছে বিশেষ কাজে। ঘামে ভিজে পিঠের সঙ্গে লেগে রয়েছে জামা। জিভ শুকিয়ে খরখরে। নাকে ধুলোর সমুদ্র, হাজারটা সূর্য যেন একযোগে তাপ আর আলো ছড়াচ্ছে, তাকানো যায় না।

চোখে সানগ্লাসটা ভাল মত এঁটে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম আমি। ভেতরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। তবে খুব বেশি নয়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে তূর্ণা। চারদিকে একবার চোখ বুলালাম। প্ল্যাটফর্ম যথারীতি জনারণ্য। জীবিকা আর প্রয়োজনের তাগিদে বেরুতেই হয় মানুষকে। যাত্রীদের কেউ কেউ ভাড়া নিয়ে বচসা করছে কুলিদের সঙ্গে, হকারদের হাঁকডাক, সব মিলে নরক গুলজার। বুকিং অফিস থেকে টিকেট কিনলাম একটা, এগোলাম ট্রেনের দিকে।

সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টগুলো এরই মধ্যে ভরে গেছে। ওদিকে আর দ্বিতীয়বার তাকালাম না। ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টের টিকেট কিনেছি। ফাঁকা দেখে উঠে পড়লাম একটা কূপে-তে।

না, কম্পার্টমেন্টটা সম্পূর্ণ খালি নয়। একজন সঙ্গী পেয়েছি আমি। এই গরমেও নীল সাফারি স্যুট পরা। ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশ/বত্রিশ হবে। মাসুদ রানার লেটেস্ট সিরিজে তাঁর এ-মুহূর্তে মনোযোগ।

জানালার ধারে বসে পড়লাম আমি। ভদ্রলোক বই রেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে। সম্ভবত জানালার পাশের সিট দখল করার ব্যাপারটি পছন্দ হয়নি তার।

'মাফ করবেন,' বিনীত গলায় বললাম আমি। 'এখানে কি কেউ বসবে?'

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল সে।

লোকটির দিকে আর তাকালাম না। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। একটু পরে আড়চোখে লোকটিকে লক্ষ করতে লাগলাম। আবার বইয়ে মনোনিবেশ করেছে সে। যাক, এখানে বসেছি বলে কোন আপত্তি করছে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। চা-অলার কাছ থেকে এক কাপ চা কিনে চুপচাপ চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন কেরানী গোছের লোক ঢুকল আমাদের কম্পার্টমেন্টে। টিকেট চেক করবে। টিকেট চেকার প্রথমে ভদ্রলোকের কাছে গেল। দু'জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনে বুঝলাম ওই লোকের নাম মি. চৌধুরী, রাজশাহী যাচ্ছে। টিকেট চেকার এবার ফিরল আমার দিকে।

'আপনিও রাজশাহী যাচ্ছেন দেখছি,' বলল চেকার।

'আমি আসলে যাব নওগাঁ,' জানালার বাইরে চোখ রেখে জবাব দিলাম। 'রাজশাহী পর্যন্ত টিকেট কিনেছি। তবে তাড়াহুড়োর কারণে রিজার্ভেশন করতে পারিনি। আমার নামটা লিখে রাখবেন এ কম্পার্টমেন্টের জন্যে?

'অবশ্যই, স্যার,' বিনয়ের সাথে বলল সে। 'আপনার নামটা বলুন?'

'জি. এস শিকদার,' বললাম আমি।

রেজিস্ট্রেশন চার্টে আমার নাম লিখে নিল টিকেট চেকার, সই করে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে হুইশ্‌ল শোনা গেল ট্রেনের, দুলে উঠল দানবটার শরীর। চলতে শুরু করেছে তূর্ণা। কিছুক্ষণের মধ্যে শহর থেকে বেরিয়ে এল ট্রেন, দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত রেখে ছুটছে। 'আপনি নওগাঁ থাকেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল আমার সঙ্গী।

ফিরলাম ভদ্রলোকের দিকে। মাসুদ রানা রেখে দিয়েছে সে, আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। মৃদু গলায় বললাম, 'না। ওখানে ব্যবসার কাজে যাচ্ছি।'

ফ্যান ঘুরছে ফুল স্পীডে, জানালা দিয়ে বাতাস আসছে, তারপরও দরদর করে ঘামছে লোকটি। বহুরঙা একটা রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড় মুছল সে।

'খোদাকে শুকরিয়া। ট্রেন ছাড়ল অবশেষে,' নীরবতা ভেঙে বলল সহযাত্রী।

'খোদাকে শুকরিয়া কেন?' বললাম আমি। 'এ দেশে ট্রেন লেট হবার কথা সবাই জানে। তবে খুব বেশি লেট কখনোই করে না।'

'না!' বলল সে। 'আমি রেলওয়ের পাংচুয়ালিটি নিয়ে ভাবছি না। ভাবছি নিজের জীবন নিয়ে।'

'আপনার জীবন নিয়ে?' অবাক হলাম আমি।

'হ্যাঁ, নিজের জীবন নিয়ে,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে।

উঠে দাঁড়াল আমার সহযাত্রী, দরজার কাছে গেল। খুলল কপাট। করিডরের চারপাশে একবার চোখ বুলাল। তারপর সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে এল নিজের জায়গায়। চারদিকে একবার তাকালাম আমি, তারপর চোখ ফেরালাম জানালায়।

লোকটি বোধহয় ভেবেছিল তার জীবন সঙ্কটের কথা শুনে খুব বেশি প্রভাবিত হইনি আমি, হয়তো তার কথা বিশ্বাসই করিনি। তাই এবার সেধে নিজের পরিচয় দিল সে।

'আমার নাম জীবন,' বলল সে। 'জীবন চৌধুরী।'

'আচ্ছা,' জানালা থেকে মুখ না ঘুরিয়েই বললাম।

'আমি একজন শখের গোয়েন্দা,' বলে চলল সে, 'ঢাকার একটি নামকরা প্রাইভেট এজেন্সিতে আছি।'

'বেশ,' এ ছাড়া আর কিছু বলার মত খুঁজে পেলাম না আমি।

'শার্লক হোমসের মত কাজ-কারবার আমাদের। গোয়েন্দা শার্লক হোমসের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'হুঁ,' বললাম আমি। 'কে না শুনেছে?'

'দ্য সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার গল্পে শার্লক হোমস যেভাবে একটি চিঠি পায়, ওরকম একটি চিঠি সম্প্রতি পাই আমি এক প্রাক্তন জমিদারের কাছ থেকে। তার আসল নামটা বিশেষ কারণে গোপন রাখছি। ধরুন, তাঁর নাম মি. অরিন্দম গুহ।'

'এ লোক গোয়েন্দা হোক বা না হোক তবে মাসুদ রানা যে খুব পড়ে তাতে সন্দেহ নেই,' মনে মনে ভাবলাম আমি।

যমুনা ব্রিজ পার হচ্ছে ট্রেন, শব্দের জন্যে চুপ করে থাকল চৌধুরী। ব্রিজ পার হবার পরে বলল, 'চিঠির প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল অবিকল "সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার" গল্পের মত। গুহ জানালেন তাঁর পরিবার এক ভ্যাম্পায়ারের আতঙ্কে অস্থির। ভ্যাম্পায়ারের কারণে তাঁদের জীবন থেকে শান্তি উধাও। রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। মি. গুহ আমাদের এজেন্সির কাছে একজন গোয়েন্দা ভাড়া করতে চাইলেন। বললেন সবচে' সেরা গোয়েন্দাকে যেন তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কারণ তাঁরা ভয় পাচ্ছেন ভ্যাম্পায়ার আবার হামলা করতে পারে।'

থামল জীবন চৌধুরী, কপালের ঘাম মুছে আবার শুরু করল. 'চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে বস্ আমাদের কয়েকজন গোয়েন্দাকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। মি. অরিন্দম গুহ'র ব্যাকগ্রাউন্ড ঘেঁটে জানা গেল, ওটা ফালতু কোন চিঠি নয়। শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, একজন গোয়েন্দাকে পাঠানো হবে মি. গুহ'র বাড়িতে। বস্ শরাফত আলি এজেন্সির সবচে' করিৎকর্মা লোক হিসেবে আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন বলেই হয়তো রহস্য অনুসন্ধানের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন আমার কাঁধে।' গর্বের হাসি ফুটল চৌধুরীর ঠোঁটে।

আমি চুপ করে তার কথা শুনছি। তবে দৃষ্টি জানালার বাইরে।

'যাক, আমি পরদিনই বাসে চেপে গেলাম সোনারগাঁ,' শুরু করল শখের গোয়েন্দা। 'টার্মিনালে আমার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মি. গুহ। গাড়িতে চড়ে পৌঁছে গেলাম তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িতে।

'শহরের উপকণ্ঠে মি. গুহের প্রাসাদ। তিনতলা বাড়ি। ত্রিশটিরও বেশি রুম, কমপক্ষে পঞ্চাশ বিঘা জমির ওপর বাড়িটি। তবে বোঝাই যাচ্ছিল বহু পুরানো বাড়ি, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় জরাজীর্ণ অবস্থা। অবশ্য আজকালকার যুগে এতবড় বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করা মুখের কথা নয়। প্রচুর খরচের ব্যাপার। আর যদ্দূর জানতাম গুহদের আর্থিক অবস্থাও ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। বিশাল সদর দরজার সামনে এসে হঠাৎ ধাক্কা খেলাম। দরজায় মানুষের একটা কঙ্কাল ঝুলছে। ধাক্কাটা হজম করে নিলাম মনে মনে। পরিচয় হলো মি. গুহ'র সাথে। সুদর্শন, মাঝারী গড়নের এক

ভদ্রলোক। মাথার চুল রাতের মত কালো, কোঁকড়ানো। বয়স বত্রিশ/তেত্রিশ হবে। মি. গুহই তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলে যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিল।

'মি. গুহ'র পরিবারের সদস্যদেরকে দেখলাম আগ্রহ নিয়ে। প্রথমে পরিচয় হলো গুহ'র মা'র সাথে। লম্বা, হাড্ডিসার চেহারার ভদ্রমহিলা। মাথার চুল প্রায় সবটাই পেকে গেছে। অথচ বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে না। বয়সের তুলনায় অনেক বুড়ি লাগছিল তাঁকে, চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেছে। শুধু চোখজোড়া, ঝকঝকে, কালো তারা থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল শক্তি।

'অরিন্দম গুহ এরপর তাঁর স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বেশ সুন্দরী মহিলা। এককালে হয়তো মডেলিং করতেন। ধারাল, কাটাকাটা চেহারা। মেকআপ ছাড়াই তাঁর ঝলমলে ত্বক থেকে দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। বনেদী ঘরের বউরা এরকমই হয়। তবে মিসেস গুহ'র চোখের তারায় কালি দেখে বুঝলাম ঠিকমত ঘুম হয় না তাঁর। দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। ভ্যাম্পায়ারের ভয়েই হয়তো।

'গুহ'র কিশোর দু'টি ভাই-বোনও আছে। ছেলেটির ১৬/১৭ হবে বয়স, মেয়েটি ভাইয়ের চেয়ে ২/৩ বছরের ছোট। বড় ভাইয়ের রূপ পেয়েছে তারাও। ওদেরকেও খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছিল।

'এখানে আমার মেয়েটি শুধু নেই,' বললেন অরবিন্দ গুহ। 'ও হাসপাতালে। হপ্তাখানেক আগে ভ্যাম্পায়ারের হামলার শিকার হয়েছে আমার পাঁচ বছরের রূপা। এ কথা আপনার এজেন্সিকে জানিয়েছিও চিঠিতে। তবে প্রাণে বেঁচে গেছে আমার মেয়ে। ওই মোতির জন্যে,' বিশালকায় একটা ডোবারম্যানের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'কুকুরটা আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। নিঃশব্দে। দেখে লাফ মেরে উঠলাম। ওটা কখন চলে এসেছে খেয়ালই করিনি।

'ঘটনাটা পরে বললেও হবে,' দ্রুত বলে উঠলাম আমি। ভ্যাম্পায়ারের কথা উচ্চারণ করা মাত্র মিসেস গুহ'র মুখ সাদা হয়ে গেছে। শুধু মিসেস গুহ নয়, উপস্থিত সবার চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। কিছু একটা ঘটার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে আছে যেন সবাই। ভ্যাম্পায়ারের শিকার হবার ভয়? ভাবলাম আমি।

'পরিচয় পর্ব শেষে দেখিয়ে দেয়া হলো আমার ঘর। বেশ বড় রুম, অনেক উঁচুতে ছাদ, বিছানাটা ছোটখাট ফুটবল খেলার মাঠের মত। তিনতলার এই ঘরের বিরাট জানালা দিয়ে গুহদের জমিদারির অনেকখানি দেখা যায়।

'হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। পোশাক পাল্টে নিচে চললাম আমার নিমন্ত্রণকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন মি. গুহ। ডজনখানেক সোফা সুবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা, চারটে অপূর্ব সুন্দর ঝাড়বাতি ঝুলছে ছাদ থেকে। একেকটা ছোটখাট গাছের মত।

'আরাম করে গা এলিয়ে দিলাম তুলতুলে সোফায়। সূর্য অস্ত যাচ্ছে গোধূলি বেলার আবিরে শেষবারের মত পৃথিবীকে রাঙিয়ে। এক চাকরকে ড্রিংকস আনতে হুকুম দিলেন গুহ। তারপর শুরু করলেন তাঁর গল্প।

'আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই এক সময় সোনারগাঁয়ে আমাদের বিশাল জমিদারী ছিল। এ বাড়িটি আমার প্রপিতামহের। অনেকদিন এ বাড়িতে কেউ ছিল না। আমরা

গত বছর থেকে থাকতে শুরু করেছি এখানে। আমাদের জমিদারী খতম হয়ে যায় আমার প্রপিতামহের আমলে। সোনারগাঁয়ের প্রায় অর্ধেকটাই আমাদের ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বেশিরভাগ সম্পত্তি বেদখল হয়ে যায়। আমার বাবা এ দুঃখ সইতে না পেরে হার্ট-অ্যাটাক করে বসেন। বাবাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে আমরা এখানেই থাকতে শুরু করি। বাবা অবশ্য চাননি আমরা এ বাড়িতে থাকি। তিনি বারবার অন্য কোথাও থাকার কথা বলছিলেন আমাদেরকে। আমার মনে হচ্ছিল তিনি কিছু একটা গোপন করছেন।'

'এ সময়ে ড্রিংকস নিয়ে এক চাকর ঢুকল, চুপ হয়ে গেলেন মি. গুহ। গ্লাসে ঠুকে আমরা 'চিয়ার্স' বলে ড্রিংকস পান করলাম। এত চমৎকার মদ বহুদিন পান করিনি।

'চাকর চলে যাবার পরে আবার শুরু করলেন গুহ। 'আমি বাবাকে বহুবার জিজ্ঞেস করেছি কেন তিনি আমাদেরকে পূর্ব-পুরুষের বাড়িতে বাস করতে দিতে নারাজ। কেন বলছেন এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে। কিন্তু বাবা জবাব দেননি। বাবার জেদের কারণে আমরা সোনারগাঁ ছেড়ে ঢাকা চলে আসি।

'তবে বাবার সঙ্গে তর্ক করা উচিত হয়নি আমার। রাগারাগি করে দ্বিতীয়বার হার্ট-অ্যাটাক করে বসেন তিনি। আর এবারের অ্যাটাকে বাবা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিন দিন পরে মারা যান তিনি।

'মৃত্যুর আগের দিন বাবা ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও দরজা বন্ধ করে কথা বলেছেন আমার সঙ্গে। ফিসফিস করে ভয়ানক এক গল্প শুনিয়েছেন। গায়ের সমস্ত রোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল গল্পটা শুনে।

'বাবার কাছে জানলাম আমার প্রপিতামহ বিক্রান্ত গুহ চৌধুরী এক সময় প্রবল প্রতাপে সোনারগাঁয়ে জমিদারী চালাতেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড বদরাগী এবং কুটিল স্বভাবের অত্যন্ত নিষ্ঠুর একজন মানুষ। সোনারগাঁয়ের মানুষের জীবন, তাদের মধ্যে বিক্রান্তের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও রয়েছেন, নরক করে তুলেছিলেন তিনি। সবাই তাকে যেমন ভয় পেত ঘৃণাও করত তেমন। বেশ কয়েকবার তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। প্রতিবারই অলৌকিকভাবে বেঁচে যান আমার প্রপিতামহ।

'আমার প্রপিতামহ কেমন নিষ্ঠুর ছিলেন তার একটা উদাহরণ দিই। একদিন তিনি বসে আছেন, তাঁর নায়েবকে হুকুম করেছেন গরম জল আনতে। পায়ে বাত হয়েছিল। গরম জলের সেঁক দেবেন। এখানে একটা কথা বলি, নায়েবের পদমর্যাদা উঁচু ধরনের হলেও বিক্রান্ত গুহ চৌধুরীর কাছে তিনি চাকরের চেয়ে বেশি কিছু ছিলেন না। নায়েব মশাইকে দিয়ে তিনি নানা ফাইফরমাশ খাটাতেন। যা হোক, নায়েব জল নিয়ে এসেছেন গামলা ভর্তি করে। বুড়ো মানুষ। হাত কাঁপছিল। গরম জল খানিকটা ছলকে বিক্রান্ত গুহ চৌধুরীর পায়ে পড়ে যায়। সাথে সাথে তারস্বরে চিৎকার দিয়ে ওঠেন তিনি। রাগে উন্মাদ হয়ে চাকরদেরকে হুকুম করেন নায়েবকে বেঁধে ফেলার জন্যে। তারপর নায়েবকে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ দিতে শুরু করেন প্রপিতামহ। রক্তক্ষরণে মারা যান নায়েব মশাই। আপনিই বলুন—এরচে' নিষ্ঠুরতা হতে পারে?' আবার বিরতি পড়ল চাকর ঘরে ঢোকায়। গ্লাস ভরে দিয়ে চলে গেল সে। গল্প শুরু করলেন গুহ, 'নায়েব মশাই হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণভিক্ষা চাইছিলেন

তাঁর মনিবের কাছে। কিন্তু অসহায়ের সে ফরিয়াদ কানে তোলেননি বিক্রান্ত। মারা যাবার আগ মুহূর্তে নায়েব শিকদার অভিশাপ দিয়ে গেলেন আমার প্রপিতামহকে। শপথ করলেন আবার ফিরে আসবেন তিনি ভ্যাম্পায়ার রূপে। তখন প্রতিশোধ নেবেন বিক্রান্ত এবং তাঁর পরিবারের ওপরে। তারপর মারা গেলেন তিনি। এ ঘটনার মাস ছয়েক পরে, একদিন সকালে বিক্রান্ত গুহ চৌধুরীকে তাঁর শোবার ঘরে পাওয়া গেল মৃত অবস্থায়। গলা ফালাফালা করে ছেঁড়া, রক্তে ভেসে যাচ্ছে শরীর। কে বা কারা এই নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়েছে বোঝা গেল না। তবে ঘরের দরজা-জানালা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। হত্যাকারী দরজা-জানালা না ভেঙে ভেতরে ঢুকল কি করে?' চুপ হয়ে গেলেন অরিন্দম। স্মৃতিগুলোকে মনে করার চেষ্টা করছেন। প্রপিতামহের মৃত্যুর ত্রিশ বছরের মধ্যে পরিবারের তিন সদস্যের একই রকম মৃত্যু ঘটে এ বাড়িতে। প্রত্যেকেরই গলা ছিল ফালা ফালা করে ছেঁড়া, যেন কেউ তীব্র আক্রোশে ছিড়ে নিয়েছে কণ্ঠনালী। আর প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটেছে বন্ধ ঘরের মধ্যে। দু'টি ক্ষেত্রে অজানা হত্যাকারীর শিকার হয়েছে দুই শিশু। শেষজন ছিল মহিলা। এদের শরীর ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। কেউই হত্যাকারীকে দেখেনি বা ঘটনা কখন ঘটেছে বলতে পারেনি। কারণ ঘটনা যে ঘটছে তা টেরই পায়নি কেউ।

'স্বাভাবিকভাবেই ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। আমাদের বাড়িটাকে সভয়ে এড়িয়ে চলতে শুরু করল মানুষজন। পালিয়ে গেল চাকর-বাকররা। পরিবারের সদস্যরাও এ বাড়ি বর্জন করলে এটি ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হলো। একজন কেয়ারটেকার রেখে দেয়া হলো বাড়ি দেখাশোনার জন্যে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রাণভয়ে আমর ভারত চলে যাই। ওখান থেকে অন্য দেশ। অনেকদিন বিদেশে ছিলাম। বিদেশ থেকে ফেরার পরে দেখি, এ বাড়ি ছাড়া আমাদের বেশিরভাগ সম্পত্তি বেদখল হয়ে গেছে। বাবা এতে শক্‌ড হয়ে হার্ট অ্যাটাক করে বসেন আগেই বলেছি। তবে বাড়ির পূর্ব-ইতিহাস জানতেন বলে তিনি চাননি এখানে কেউ বাস করুক।

'সত্যি বলতে কি বাবার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি আমার। এ যুগে ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্ব বিশ্বাস করাটাই তো পাগলামি। কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। আর সে ভুলের খেসারত আমাকে দিতে হয়েছে ভয়ঙ্করভাবে।'

থামলেন মি. গুহ। কৌতূহল নিয়ে তাকালাম তাঁর দিকে। উনি কি বলতে চাইছেন ভ্যাম্পায়ারের সত্যি অস্তিত্ব রয়েছে? গ্লাসে ড্রিংকস ঢেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ পান করে চললাম। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ঝাড়বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে এক চাকর। 'আমাদের পরিবারের গোপন ইতিহাস বলার কয়েক ঘণ্টা পরে মারা গেলেন বাবা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে বিষয়টি নিয়ে কথা বললাম আমার মা এবং স্ত্রীর সাথে। মা বললেন এ ধরনের গুজব তিনিও শুনেছেন। তবে বাবা কখনও এ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। মা'র ধারণা এটা স্রেফ গুজবই, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। মা'র কথায় সায় দিলাম। তবে আমার স্ত্রীর চেহারা দেখে মনে হলো গুজবটা সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

'ঢাকায় আমাদের পারিবারিক স্ট্যাটাস অনুযায়ী থাকতে গেলে প্রচুর অর্থের দরকার ছিল। আর অত টাকাও আমার ছিল না। তাই বাবার প্রবল নিষেধাজ্ঞা মাথা থেকে দূর করে দিয়ে আমরা পিতৃ-পুরুষের বাড়িতেই বসবাস শুরু করে দিই।

'শুরুতে অবশ্য কোন সমস্যা ছিল না। ভালই কাটছিল দিনকাল। একটা সময় আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করি ভ্যাম্পায়ারের গল্প আসলে গল্পই।' এ জায়গায় নাটকীয় ভঙ্গিতে বিরতি দিলেন গুহ। গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'ঠিক তখন হামলা চালাল ভ্যাম্পায়ার।' 'এক রাতে,' বলে চললেন তিনি, 'দেরী করে ফিরেছি পার্টি থেকে। অধিক ভোজনের ক্লান্তিতে বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম। হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে ভেঙে গেল ঘুম। চেয়ে দেখি এক লোক দাঁড়িয়ে আছে আমার বিছানার পাশে। সাধার চেহারার মানুষটির বেশভূষাও সাধারণ, শুধু চোখ জোড়া ছাড়া। টকটকে লাল চোখ থেকে আগুন যেন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। এমন ভয়ানক চাউনি, শরীর অবশ হয়ে গেল আমার। মুখ হাঁ করলাম, শব্দ বেরুল না গলা থেকে।

নিচু, কাঁপা গলায় কথা বলে উঠল আগন্তুক, 'চলে যাও। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এখান থেকে চলে যাও। তোমার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু আমার সাবধান বাণীর পরেও যদি এ বাড়িতে থাকো, আক্রান্ত হবে তোমরা। কারণ এ পরিবারের রক্ত খাওয়ার শপথ নিয়েছিলাম আমি। কাজেই আমার হাত থেকে বাঁচতে চাইলে এক্ষুণি কেটে পড়ো।'

'কথা শেষ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। আমি হতবুদ্ধির মত শুয়ে রইলাম বিছানায়। সারা গা কাঁপছে। ঘুম থেকে জাগালাম আমার স্ত্রী বীনাকে। ঘটনাটা খুলে বললাম ওকে। বীনা অভয় দিয়ে বলল ও কিছু না। পার্টিতে বেশি খেয়ে ফেলেছি বলে উল্টোপাল্টা স্বপ্ন দেখছি। গুরুপাক ভোজনে অমন হতেই পারে। তবে বীনার যুক্তি মেনে নিতে পারলাম না। স্বপ্ন নয়, সত্যি কেউ একজন এসেছিল আমাদের ঘরে। শাসিয়ে গেছে আমাকে।

'দরজা-জানালা পরীক্ষা করে দেখলাম। সব বন্ধ। আমার ছোট্ট মেয়েটা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। বীনা তাগাদা দিল ঘুমিয়ে পড়তে। শুয়ে পড়লাম। তবে সে রাতে আর ঘুম এল না। আগন্তুকের কথা মনে পড়ল বারবার।

পরদিন সকালেই চলে এলাম শহরে। বাড়ি খুঁজতে। আগের বাড়িতে থাকতে ভয় করছিল। তবে মা কিংবা বীনাকে জানাইনি ভয়ের কথা। ওদেরকে ভীত করে তুলতে চাইনি। তবে সারা দিন বাড়ি খোঁজাই সার হলো। পেলাম না মনের মত বাড়ি। সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরলাম ক্লান্ত এবং হতাশ হয়ে। দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল বেশ। তবে চেহারা ভাবলেশশূন্য রেখে রাতের খাবার খেলাম সবার সাথে। সে রাতে একটু তাড়াতাড়িই গেলাম বিছানায়।

'আমাদের কুকুর মোতি সাধারণত বারান্দায় ঘুমায়। সে রাতে সৌভাগ্যক্রমে ও খেলা করছিল আমার মেয়ে রূপার সঙ্গে। আমার খাটের নিচেই খেলা শেষে শুয়ে পড়েছিল জানোয়ারটা।

'রাত আনুমানিক দু'টোর দিকে মোতির ঘেউ ঘেউ ডাকে ঘুম ভেঙে গেল আমার। বীনাও জেগে গেছে। সাথে সাথে চিৎকার শুরু করে দিল ও।

'ভ্যাম্পায়ারটা আবার ঢুকে পড়েছে ঘরে। টকটকে লাল চোখে, প্রতিহিংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ধীরে ধীরে, ফ্যাঁসফেঁসে গলায় কথা বলতে শুরু করল সে।

'তোমাকে বলেছিলাম এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। আমার আদেশ অমান্য

করেছ। এ জন্যে এখন শাস্তি পেতে হবে তোমাকে। তোমার মেয়ের রক্ত খাব আমি। ও মারা যাবে।'

মোতি ভ্যাম্পায়ারের সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে সমানে ঘেউ ঘেউ করে চলছিল। ভ্যাম্পায়ার ওকে গ্রাহ্যই করছিল না। মোতির চিৎকার ছাপিয়েও তার কণ্ঠ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম আমরা।

'আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্যে বিছানা থেকে নামতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই ঘুরে দাঁড়াল ভ্যাম্পায়ার, বিদ্যুৎগতিতে পৌঁছে গেল আমার বিছানার পাশে। আর ঠিক তখুনি একটা ভেল্কি দেখলাম আমরা। রূপার গায়ে থাবা চালিয়েছে ভ্যাম্পায়ার, একই সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মত লাফিয়ে উঠেছে মোতি, ঝাঁপিয়ে পড়ল পিশাচটার গায়ে। কিন্তু চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ভ্যাম্পায়ার মোতিকে বোকা বানিয়ে।

বীনা লাফিয়ে নামল খাট থেকে। এক দৌড়ে রূপার বিছানায়। ভয়ানক দৃশ্যটা দেখে মাথা ঘুরে গেল আমার। ভ্যাম্পায়ারটার থাবার আঘাত লেগেছে রূপার ঘাড়ে, স্রোতের বেগে রক্ত পড়ছে। ভয়ে, যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেছে আমার মেয়ে। রূপার ঘাড়ে কোন মতে ব্যান্ডেজ বেঁধে তক্ষুণি ওকে নিয়ে ছুটলাম হাসপাতালে। আর আধাঘণ্টা দেরী হয়ে গেলে মেয়েকে বাঁচানো যেত না, এতই রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

যমে-মানুষে লড়াই চলল টানা দুই দিন। এই দুই দিন অজ্ঞান হয়ে রইল রূপা। তিন দিনের দিন জ্ঞান ফিরল ওর। এখন আগের চেয়ে সুস্থ। তবে বেচারীর শরীরে একটুও শক্তি নেই। অবশ্য কয়েকদিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে রূপা।

'এ ঘটনার পরে আপনার এজেন্সিতে চিঠি লিখি আমি। প্রথমে পুলিশের কাছে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের কথা হয়তো বিশ্বাসই করবে না তারা। উল্টো হাসাহাসি করবে আমাকে নিয়ে। পাগল ঠাওড়াবে। আর ডাক্তারদেরকে বলেছি খেলতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে ব্যথা পেয়েছে রূপা।

'ওই ঘটনার পর থেকে আমাদের জীবনে শান্তি বলে কিছু নেই। সেদিনের পরে ভ্যাম্পায়ারের চেহারা আর দেখিনি বটে। তবে আমার বিশ্বাস আবার ফিরে আসবে সে। আমার মা ওঝা ডেকে এনেছিলেন। কে জানে হয়তো তার মন্ত্রের জোরে সাময়িকভাবে পালিয়েছে ভ্যাম্পায়ার। ওঝা সদর দরজায় কঙ্কাল টাঙিয়ে রেখেছে। বলেছে মন্ত্রপূত এ কঙ্কাল ঠেকিয়ে রাখবে ভ্যাম্পায়ারকে। ওঝার কথা বিশ্বাস হয়, আবার হয়ও না। জানি না শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে কি আছে।'

গল্প শেষ হলো মি. গুহ'র। রাতের খাবারের আগে আরও কিছুক্ষণ ড্রইংরুমে কাটিয়ে দিলাম দু'জনে নানা বিষয়ে আলোচনা করে। ডিনার সারতে হলো পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে। ভ্রমণে ক্লান্ত ছিলাম বলে তাড়াতাড়ি বিছানায় গেলাম। কিন্তু ঘুম এল না সহজে। বারবার ভ্যাম্পায়ারের কথা মনে পড়ছে।

'ভ্যাম্পায়ার? রক্ত-চোষা ভ্যাম্পায়ার, সত্যি সম্ভব এ যুগে? কিন্তু কি করে সম্ভব? অথচ মি. গুহ'র চেহারা দেখে এবং কথা শুনে মনে হয়েছে ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্ব প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন তিনি। আর এমন গণ্যমান্য একজন ব্যক্তির কথা হালকাভাবে নেয়ার কোন অবকাশ নেই। আমি আমার হেভী-ক্যালিবারের রিভলভারটা বালিশের তলায় গুঁজে ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি এবং কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। হঠাৎ জেগে উঠলাম। চোখ মেলে চাইতেই হিম হয়ে গেল গা।

ডিম বাতির নীলচে আলোয় দেখলাম এক লোক দাঁড়িয়ে আছে আমার বিছানার পাশে। অতি সাধারণ বেশভূষা তার, চেহারায়ও কোন বিশেষত্ব নেই। শুধু চোখজোড়া ছাড়া। ভয়ানক জ্বলছে তার চোখ। লাল টকটকে। আমি কিছু বলার আগেই সে মুখ খুলল।

'আমিই সেই ভ্যাম্পায়ার,' ফ্যাঁসফেঁসে, কাঁপা কণ্ঠ তার। 'তুমি বোকা, তাই এখানে এসেছ। এখান থেকে চলে যাও। নইলে তুমিও মারা পড়বে। কাল যেন তোমাকে আর এ বাড়িতে না দেখি।' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

ভয়ে আমার শরীর প্রায় অসার হয়ে গিয়েছিল। বহু কষ্টে বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলাম রিভলভার। ভ্যাম্পায়ার ঘুরে দাঁড়াতেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম। বন্ধ ঘরে বিকট শোনাল গুলির আওয়াজ। মনে হলো গুলি লেগেছে ভ্যাম্পায়ারের গায়ে। কারণ ঝাঁকি খেতে দেখেছি ওকে গুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। উল্লসিত হয়ে উঠলাম আমি। 'ওটা ভ্যাম্পায়ার নয়, মানুষ,' ভাবলাম আমি। 'তাই গায়ে গুলি লেগেছে।'

'ধীরে ধীরে শরীরটা ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। পরপর আরও দু'বার গুলি করলাম। দু'বারই ঝাঁকি খেল ভ্যাম্পায়ার। বারুদের গন্ধে ভরে গেল ঘর। গুলির শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়।

'আমি তোমাকে শেষ করব,' আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় বলল ভ্যাম্পায়ার। তারপর পা বাড়াল ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে। অদৃশ্য হয়ে গেল। বিছানা থেকে নেমে পড়লাম আমি। ত্রস্ত হাতে আলো জ্বালালাম। ডান হাতে রিভলভার বাগিয়ে ধরে একে একে পরীক্ষা করে দেখলাম বাথরুম, কাপবোর্ড এমনকি বিছানার তলাও। কোথাও ভ্যাম্পায়ারের চিহ্ন নেই। দরজা-জানালা বন্ধ করেই শুয়েছিলাম। তাহলে কোত্থেকে ঢুকল ওটা? এরকম জিনিসের সঙ্গে মোকাবিলা আমার এই প্রথম। ভ্যাম্পায়ারের কথা ভাবছি, এমন সময় দরজায় দমাদম বাড়ি। গুহ'র কণ্ঠ শুনতে পেলাম। দরজা খুলতে বলছেন।

'রিভলভার হাতে নিয়েই সাবধানে খুলে দিলাম দরজা। গুহই। ড্রেসিং গাউন পরনে, চুল এলোমেলো, এক চাকরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আমার হাতে অস্ত্র দেখে আঁতকে উঠলেন, এক লাফে পিছু হটলেন। অবশ্য পরের মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইলেন মি. গুহ। 'গুলির আওয়াজ শুনলাম যেন!'

'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম তাঁর কাছে। 'মাই গড!' শিউরে উঠলেন মি. গুহ। 'অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছেন। সত্যি কি ভ্যাম্পায়ারটার গায়ে গুলি লেগেছে?'

'হয়তো,' বললাম আমি। 'আপনার কাছে ভ্যাম্পায়ারের গল্প শুনে প্রথমে বিশ্বাস করিনি আমি। পরে ভেবেছি সাবধানের মার নেই। তাই রিভলভারে সিলভার বুলেট ভরে রেখেছিলাম। এখানে আসার আগে ভ্যাম্পায়ারের ওপর প্রচুর পড়াশোনা করি আমি। দু'টো ব্যাপারে নিশ্চিত হই—এক ভ্যাম্পায়ার বলে যদি সত্যি কিছু থাকে তাহলে ওরা মানুষের রক্ত পান করে। দুই. ওদেরকে শুধু সিলভার বুলেট দিয়েই ধ্বংস করা সম্ভব। তাই বিশেষ প্রক্রিয়ায় সিলভার বুলেট তৈরি করি নিজেই।'

'বাহ, দারুণ!' আমার বুদ্ধিমত্তায় খুশি হন গুহ। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এক চাকর এসে হাজির। ভয়ে চোখ বিস্ফারিত। 'স্যার!' উত্তেজিত গলায় বলল সে।

'জলদি চলেন। মেমসাব আপনেরে বোলায়। আপনের ভাই, বিজয় সাবের কোন সাড়া শব্দ নাই। হের কিছু একটা হইছে-মনে লয়।'

'দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলাম আমরা। বিজয়ের ঘরের সামনে ছোটখাট জটলা। বীনা দেবীর মুখ কালো, আমাদের দেখে বললেন, 'অনুরাধারও কোন সাড়া পাচ্ছি না,' বিজয়ের পাশের ঘরে ইঙ্গিত করলেন তিনি। মি. গুহ'র ছোটবোন থাকে ও ঘরে।

'দরজা ভাঙো,' আদেশ দিলেন গুহ। চাকররা একযোগে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে ভেঙে ফেলল বিজয়ের ঘরের দরজা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল সবাই। যা দেখল তাতে ভয়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল চোখ।

'ঘরে আলো জ্বলছে। বিজয় তার বিছানায়, রক্তের পুকুরের মধ্যে ভাসছে। দেখেই বুঝেছি আসতে দেরী করে ফেলেছি আমরা। ভ্যাম্পায়ার তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে চলে গেছে। কণ্ঠনালী ছেঁড়া হতভাগ্য বিজয়ের।

'এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান বীনা দেবী। মি. গুহ'র মনের জোর সাংঘাতিক। নিহত ভাইয়ের দিকে এক পলক তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বজ্র নির্ঘোষে বললেন, 'পাশের রুমে, জলদি।'

'অনুরাধার ঘরের দরজাও ভাঙা হলো। এখানেও সেই একই দৃশ্য। চতুর্দশী কিশোরীর ছিন্নভিন্ন শরীর দেখে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না ভ্যাম্পায়ার কল্পনাশ্রয়ী কোন বস্তু নয়।

সে রাতটা যে কি বিভীষিকার মধ্যে কেটেছে! বীনা দেবী অজ্ঞান। গুহ'র মা প্যারালাইজড় রোগীর মত বসে আছেন। চোখে ফ্যালফেলে চাউনি। ডাক্তার এল, পুলিশে খবর দেয়া হলো, আমার সঙ্গে কথা বলল পুলিশ অফিসাররা। রিভলভার পরীক্ষা করল, লাইসেন্স খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল আমি যেতে পারি।

'নিজের ঘরে এসে পাথর হয়ে বসে রইলাম। চিন্তা-ভাবনাগুলো সব জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। আশপাশে কি ঘটছে সে ব্যাপারে যেন সচেতন ছিলাম না ওই সময়।

'তবে এই খুনের ঘটনা খবরের কাগজের কাছে সযত্নে গোপন রাখা হলো। ভ্যাম্পায়ার প্রতিহিংসার বশে খুন করেছে বিশ্বাস করবে কেউ? পুলিশী তদন্ত শুরু হলো বটে, তবে তারাও ব্যাপারটা যেন বিশ্বাস করতে চাইছিল না।

যা হোক, কয়েকদিন পরে অর্থাৎ আজ সকালে মি. গুহ'র বাড়ি থেকে ছাড়া পাই আমি। আমাকে পইপই করে বলে দেয়া হয়েছে এ বিষয়ে যেন মুখ না খুলি কারও কাছে। মি. গুহ তার মা, স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ঢাকা চলে গেছেন। ও বাড়ির আর ছায়াও মাড়াবেন না বলেছেন। পুলিশের অনুমতি ছাড়া এ খুনের বিষয়ে কারও সঙ্গে কথা বলা তাদেরও নিষেধ। আমি শুধু ফোনে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। তারপর ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে সোজা ট্রেনে। আপাতত রাজশাহীতে থাকব কয়েকদিন। তারপর ফিরব।'

চৌধুরীর দীর্ঘ গল্পের মাঝে আমি কোন প্রশ্ন করিনি। শুধু 'হুঁ হাঁ' এবং 'কি অদ্ভুত' ধরনের মন্তব্য করে গেছি। আর বেশ কয়েক কাপ চা গিলেছি।

শখের গোয়েন্দার কথা শেষ হলে বললাম, 'এমন অদ্ভুত গল্প জীবনেও শুনিনি।

তবে আপনি ভাগ্যবান। আপনার আয়ু রেখা বেশ লম্বা মনে হচ্ছে।'

'সত্যিই তাই,' ডান হাতের তালু দেখতে দেখতে বলল জীবন চৌধুরী। 'আপনার সঙ্গে আমি একমত। রিভলভারে আগেভাগে সিলভার বুলেট ভরে না রাখলে ঐ মুহূর্তে আমাকে এ জায়গায় দেখতে পেতেন না।'

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। কম্পার্টমেন্টে অন্ধকার নামছে। জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

'আলোটা জ্বেলে দিন না,' বলল চৌধুরী।

'জ্বালছি। এক মিনিট,' বললাম বটে তবে আলো জ্বালানোর জন্য ব্যস্ত হলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, একটা কথা খোলাসা করুন তো। আপনি বলেছেন ভ্যাম্পায়ারটার চেহারা সাধারণ মানুষের মত, পরেও সাধারণ পোশাক, তাহলে আপনি কি করে বুঝলেন সে ভ্যাম্পায়ার ছিল?'

'সেই ভয়ঙ্কর লাল চোখ দেখে,' বলল চৌধুরী। 'কোন সাধারণ মানুষের চোখ অমন হতে পারে না।'

এই প্রথম গাঢ় সানগ্লাসটা চোখ থেকে খুললাম আমি। সরাসরি তাকালাম লোকটার দিকে।

'এরকম চোখ কি?'

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ানক আঁতকে উঠল সে। মুখ হাঁ করল, চিৎকার দেবে। তার আগেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর। এক কামড়ে ছিঁড়ে ফেললাম কণ্ঠনালী।

[রাজেন্দ্র সিং ও রাজেশ্বরী সিং-এর 'দ্য ভ্যাম্পায়ার'-এর ছায়া অবলম্বনে]

বানর

হ্যাল শেলবার্ন যখন দেখল, তার ছেলে ডেনিশ পুরানো একটা র‍্যালস্টন-পুরিনার কার্টন থেকে বের করে আনল ওটা, ভয়ের একটা শিহরণ আর তীব্র বিবমিষা ধাক্কা দিয়ে গেল ওকে। এক মুহূর্তের জন্য ইচ্ছে করল চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল হ্যাল মুখে হাত চাপা দিয়ে। কাশল খুকখুক করে। টেরি বা ডেনিশ কেউ খেয়াল করল না ব্যাপারটা। তবে পেটি কৌতূহলী হয়ে উঠল জিনিসটা দেখে। বড় ভাই ডেনিশকে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই, ওটা কি?'

'এটা একটা বানর, মাথামোটা,' বলল ডেনিশ। ওর বয়স বারো। কিন্তু নিজেকে সবজান্তা ভাবে। 'বানর দেখিসনি কোনদিন?'

'আমি এটা নিই, বাবা?' জানতে চাইল পেটি। ওর বয়স নয়।

'মানে!' চেঁচাল ডেনিশ। 'ওটা আমার। বানরটাকে আমি পেয়েছি।'

'আহ্, চুপ কর না তোরা,' দাবড়ে উঠল ওদের মা টেরি। 'চিল্লাচিল্লিতে মাথা ধরে গেল।'

ওদের কারও কথা কানে ঢুকছে না হ্যালের। সে ডেনিশের হাতে ধরা বানরটার দিকে তাকিয়ে আছে। বানরটা যেন হ্যালের দিকে তাকিয়ে খিকখিক হাসছে। সেই পরিচিত হাসি। যে হাসি শৈশবে দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফিরেছে হ্যালকে–

বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস উঠল। শিসের মত শব্দ তুলল পাক খেতে খেতে। ভয় পেল পেটি। বাবার কাছ ঘেঁষে এল। 'কিসের শব্দ, বাবা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বাতাসের শব্দ, সোনা।' জবাব দিল হ্যাল। স্থির তাকিয়ে আছে বানরটার দিকে। ওটার হাতে ঢোল। হাত উঁচিয়ে আছে বাজানোর ভঙ্গিতে। 'বাতাস শিস দিতে পারে, কিন্তু সুর তুলতে জানে না,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল ও। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঠিক এ কথাটাই বলতেন উইল চাচা।

লম্বা শিসের শব্দটা আবার শোনা গেল। ক্রিস্টাল লেকের ওপর দিয়ে বাতাসটা আসছে। অক্টোবরের ঠাণ্ডা বাতাস বাড়ি মারছে হ্যালের মুখে। এ বাড়িটা তাদের হার্টফোর্ডের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ত্রিশ বছর আগের সময়টা যেন ফিরে এসেছে এখানে।

আমি ওই ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবব না, সিদ্ধান্ত নিল হ্যাল। কিন্তু ভাবতে না চাইলেই কি আর না ভেবে থাকা যায়? ভাবছে হ্যাল, আমি ব্যাক ক্লজিটে, এরকম একটা বাক্সে হারামজাদা বানরটাকে দেখেছিলাম।

কাঠের একটা ক্রেট বোঝাই নানা হাবিজাবি জিনিস দেখছে টেরি, পেটি বাপের হাত ধরে বলল, 'এ জায়গাটা আমার ভাল্লাগছে না, বাবা। ভাইয়া ওটা নিতে চায় নিক। চলো, বাবা। এখান থেকে যাই।'

'ভূতের ভয় লাগছে, মুরগী ছানা?' ঠাট্টা করল ডেনিশ।

'আহ, ডেনিশ থামলি!' চাইনিজ আদলের পাতলা একটা কাপ দেখতে দেখতে

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল টেরি। জিনিসটা খুব সুন্দর! এটা—হ্যাল দেখল ডেনিশ বানরের পিঠে বসানো চাবিটা নিয়ে গুঁতোগুঁতি করছে। হিম শীতল একটা স্রোত নামল তার শিরদাঁড়া বেয়ে।

'ওটা ঘুরাবি না! তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল হ্যাল। বুঝতে পারল বেশি জোরে বলে ফেলেছে কথাটা। ডেনিশের সাথে এভাবে ধমকের সুরে কথা বলে না সে অনেকদিন। ডেনিশের হাত থেকে একটানে ছিনিয়ে নিল বানরটাকে। টেরি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল স্বামীর দিকে। ডেনিশ হতভম্ব। পেটিও অবাক। এক মুহূর্তের জন্যে চুপ হয়ে গেল সবাই। আবার শিস কাটল বাতাস। এবার আগের চেয়ে আস্তে। 'বানরটাকে এভাবে না নিলেও পারতে,' অভিযোগ করল ডেনিশ। জবাবে কিছু বলল না হ্যাল। ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাশনাল এরোডাইন কোম্পানি থেকে চাকরিচ্যুত হবার পর থেকে তার মেজাজটা প্রায়ই খাট্টা হয়ে থাকছে।

ডেনিশ আর কিছু না বলে কার্টনটা আবার ঘাঁটতে শুরু করল। তবে ভাঙাচোরা কিছু পুতুল ছাড়া কিছু পেল না।

বাতাসের বেগ আবার বাড়তে শুরু করেছে। মড়মড় শব্দ হচ্ছে চিলেকোঠায়। যেন সিঁড়ি বেয়ে কেউ নামছে।

হ্যাল বলল, 'আর এখানে নয়। চলো সবাই।'

একটা মোটেলে পাশাপাশি দুটো ঘর ভাড়া নিয়েছে হ্যাল। রাত দশটার মধ্যে ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়ল। টেরিও ঘুমাচ্ছে ঘুমের বড়ি খেয়ে। বাথরুমে ঢুকল হ্যাল। বন্ধ করে দিল দরজা। তারপর তাকাল বানরটার দিকে।

নরম, বাদামী লোমে মোড়া বানরটার শরীর। কয়েক জায়গায় পশম উঠে বেরিয়ে পড়েছে নগ্ন গা। হাসি হাসি মুখ। ওর এই হাসিটাকে সবচে ঘৃণা করে হ্যাল। সবগুলো দাঁত বের করে আছে বানরটা। চাবি মোড়ালে ঠোঁট নড়বে, দাঁতগুলো মনে হবে আরও বড় হয়ে গেছে, অবিকল ভ্যাম্পায়ারের দাঁত। ঢোল বাজাতে শুরু করবে বানর। এই হারামজাদাটা হ্যালের সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জনি ম্যাকবির মৃত্যুর জন্য দায়ী। সবাই জানে জনি গাছ থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙেছে। কিন্তু হ্যাল জানে এই খেলনা বানরটাই খুন করেছে তার বন্ধুকে। হ্যাল দেখেছে এটা যখন ঢং ঢং শব্দে ঢোল বাজাতে শুরু করে তখনই কারও না কারও করুণ মৃত্যু ঘটে। অথচ এটাকে ত্রিশ বছর আগে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিল সে।

'তুমি এখানে কিছুতেই আসতে পারো না,' ফিসফিস করে বলল হ্যাল। 'কারণ নয় বছর বয়সে তোমাকে আমি আমাদের বাড়ির কুয়োয় ফেলে দিয়েছিলাম।'

বানরটা হ্যালের কথা শুনে মুখের হাসিটা যেন প্রসারিত করল। শিউরে উঠল হ্যাল। হাত থেকে ফেলে দিল ওটাকে। বাইরে, রাতের আঁধারে ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপাদাপি। মোটেলটাকে বারবার ঝাঁকি মেরে যাচ্ছে।

ওরা দুই ভাই। হ্যাল ও বিল। খুব ছোটবেলায় ওদের ব্যবসায়ী বাবা ওদেরকে ছেড়ে চলে যায়। বাবার কথা বিলের অল্প অল্প মনে আছে। কিন্তু হ্যালের স্মৃতিতে বাবার চেহারাটা নেই। হ্যালের আট বছর বয়সে মা মারা যান। বিল তখন দশে

পড়েছে। তারপর ওরা হার্টফোর্ডে চলে আসে চাচা-চাচীর কাছে। চাচা উইল এবং চাচী ইডা খুব আদর করতেন দুই ভাইকে। ওখানেই বড় হয়ে ওঠে ওরা। কলেজে যায়। বিল বর্তমানে পোর্টল্যান্ডে আইন ব্যবসা করছে। ভালই পসার তার।

বানরটাকে হ্যাল প্রথম দেখেছে চার বছর বয়সে। ওদের বাবা হার্টফোর্ডে বাড়ি কিনেছিলেন, মা হোমস এয়ার ক্রাফটে তখন সেক্রেটারির কাজ করেন। ছয় বছরের বিল স্কুলে যায়। হার্টফোর্ডে অনেক বেবী সিটার ছিল, নানা জায়গা থেকে আসত। বাচ্চা দেখাশোনাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। এরকম এক কৃষ্ণাঙ্গী, বিশালদেহী বেবী সিটারের নাম ছিল বিউলাহ্। হ্যালের মা কাজে গেলে সে হ্যালের দেখাশোনা করত। বিউলাহ্ যখন তখন চিমটি কাটত হ্যালকে। তারপরও হ্যাল পছন্দ করত বিউলাহকে সে মজার মজার গল্প শোনাত বলে।

বানরটাকে হ্যাল খুঁজে পায় ব্যাক ক্লজিটে। সেটা ছিল মার্চের এক ঠাণ্ডা, বিষণ্ন দিন। বিউল্লাহ্ বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছে, হ্যাল গেল ক্লজিটে, তার বাবার ফেলে দেয়া জিনিসপত্র দেখতে।

দোতলার বাম দিকে, বাড়তি জায়গাটুকুতে ছিল ক্লজিটটা। ওটার প্রতি দারুণ আকর্ষণ অনুভব করত হ্যাল। পুরানো ক্লজিটটাকে কখনও ভার্নিশ করা হয়নি। ভেতরে রাজ্যের হাবিজাবি জিনিস। হ্যাল তার ভাইকে নিয়ে সুযোগ পেলে এখানে চলে আসে। বাক্সপেঁটরা খুঁজে দেখে, জিনিসপত্র উল্টে দেখে। প্রতিটি জিনিসের স্পর্শে শিহরিত হয়ে ওঠে। তারপর যেখানকার জিনিস সেখানে আবার গুছিয়ে রেখে দেয়। মাঝে মাঝে হ্যাল এবং বিল ভাবে যদি তাদের হারানো বাবার সন্ধান পাওয়া যেত তাহলে কতই না ভাল হত।

সেদিন ক্লজিটে ঢুকেছে হ্যাল, একটা বাক্স একপাশে সরিয়ে রাখতেই ওটার পেছনে আরেকটা বাক্স চোখে পড়ল। একটা র‍্যালস্টন-পুরিনা কার্টন। ওটার ওপর দিয়ে এক জোড়া চকচকে চোখ জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ানক চমকে গেল হ্যাল, উত্তেজনায় ধড়ফড় করতে লাগল বুক। যেন মৃত একটা পিগমি আবিষ্কার করে ফেলেছে। এক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারল ওটা একটা খেলনা।

এক পা সামনে বাড়াল হ্যাল, সাবধানে জিনিসটা তুলে নিল বাক্স থেকে। ওটা হাসছে হ্যালের দিকে তাকিয়ে, হলদে আলোয় দাঁতগুলো বিকট দেখাল। ঢোল জোড়া আপনা আপনি সরে গেল দুই পাশে।

দারুণ। হ্যাল হাত বোলাল ওটার তুলতুলে পশমী গায়ে। মুচকি হাসিটা মজাদার এবং কৌতুককর লাগছে। পিঠে একটা চাবিও আছে। খেলনাটা নিয়ে নিচে নেমে এল হ্যাল। খেলবে।

'তোমার হাতে ওটা কি, হ্যাল?' ঘুম ভেঙে জানতে চাইল বিউলাহ্।

'কিছু না,' বলল হ্যাল। 'কুড়িয়ে পেয়েছি এটাকে। বেডরুমে, তার পাশের শেলফের মাথায় বানরটাকে রেখে দিল হ্যাল। ওটা হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইল শূন্যে, ঢোল বেজে ওঠার জন্য তৈরি।

সে রাতে ডিম ডিমা ডিম ডিম শব্দে ঘুম ভেঙে গেল হ্যালের। অজান্তে চোখ চলে গেল বানরটার দিকে। ঢোল বাজাতে শুরু করেছে বানর। শরীর ঝাঁকি খাচ্ছে

বাজনার তালে, ঠোঁট জোড়া বারবার বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে। বিকট দেখাচ্ছে বড় বড় দাঁতগুলো।

'থামো!' ফিসফিস করল হ্যাল।

হ্যালের ভাই পাশ ফিরে শুলো। নাক ডাকছে। গভীর ঘুমে অচেতন। সব কিছু নীরব···শুধু বানরটা বাদে। ঢোলে বাড়ি পড়ছে। ডিম ডিমা ডিম ডিম। শব্দ শুনে ওর ভাই জেগে উঠবে, ঘুম ভেঙে যাবে মা'রও। এতই জোরাল শব্দ, লাশও উঠে পড়বে কবর ছেড়ে।

ডিম ডিমা ডিম ডিম–

হ্যাল হাত বাড়াল বানরের দিকে। এমন সময় থেমে গেল বাজনা। আবার আগের মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে রইল বানর। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

বাড়িতে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। হ্যাল কম্বলের নিচে ঢুকতে ঢুকতে সিদ্ধান্ত নিল কাল সকালেই বানরটাকে ক্লজিটে রেখে আসবে।

তবে পরদিন সকালে কথাটা ভুলে গেল সে। মা সেদিন কাজে গেল না। কারণ মারা গেছে বিউলাহ্। মা অবশ্য আসল কথা খুলে বলল না দুই ভাইকে। শুধু বলল, 'ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্ট।'

সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটা খবরের কাগজ চুরি করে আনল বিল জামার নিচে ঢুকিয়ে। হেড লাইনে ছিল অ্যাপার্টমেন্টে গুলিবিদ্ধ হয়ে দু'জন মৃত। মা রান্নাঘরে সাপার তৈরিতে ব্যস্ত, খবরটা বিল পড়ে শোনাল তার ভাইকে। খবরে ছাপা হয়েছে বিউলাহ্ ম্যাককাফেরি (১৯) এবং স্যালি ট্রেমন্ট (২০) কে গুলি করে মেরে ফেলেছে মিস ম্যাককাফেরির ছেলে বন্ধু লিওনার্দ হোয়াইট (২৫)। তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে লিওনার্দ গুলি করে। মিস ট্রেমন্ট হার্টফোর্ড হাসপাতালে মারা যায়, বিউলাহ্ ম্যাককাফেরির মৃত্যু ঘটে ঘটনাস্থলেই।

বিউলাহ্ খুব গোয়েন্দা গল্প পড়ত। হ্যালের খবরটা শুনে মনে হলো সে তার গোয়েন্দা গল্পের চরিত্রের মতই অদৃশ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা জলের স্রোত নামতে শুরু করল হ্যালের, স্রোতটা পৌঁছে গেল হৃৎপিণ্ডেও। ওর মনে পড়ে গেছে খুনের ঘটনাটা যখন ঘটে ঠিক ওই সময় বানরটা বাদ্য বাজাচ্ছিল···

'হ্যাল?' ভেসে এল টেরির নিদ্রাতুর কণ্ঠ। 'ঘুমাবে না?'

বাথরুমে দাঁত মাজছিল হ্যাল, পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, 'আসছি।'

খানিক আগে বানরটাকে সুটকেসে ভরে ফেলেছে হ্যাল। ওরা দুই/তিনদিনের মধ্যে টেক্সাস যাচ্ছে। তার আগে ওই হারামজাদার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করা দরকার। যেন আর কোনদিন ওটার মুখ দেখতে না হয়।

যেভাবেই হোক কাজটা করতেই হবে।

'তুমি আজ বিকেলে ডেনিশের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছ,' অন্ধকারে বলল টেরি।

বিকেলে হ্যালের মুখে মুখে কথা বলার জন্যে ডেনিশকে থাপ্পড় মেরেছে হ্যাল। ছেলেটা দিন দিন বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে। অথচ পেটি কত শান্ত। এ জন্যেই ছোট ছেলেটাকে বেশি ভালবাসে হ্যাল।

'ডেনিশের সাথে এখন থেকে একটু কড়া না হলে ছেলেটা উচ্ছন্নে যাবে,' বলল হ্যাল।

'কিন্তু মারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না–'

'বেশি বেয়াদবি করলে একটু আধটু পিট্টি দিতেই হয়। তাছাড়া ডেনিশ ওর ভুল বুঝতে পেরেছে।'

'তবু তোমার আচরণ আজ আমার পছন্দ হয়নি,' বলল টেরি।

শঙ্কিত বোধ করল হ্যাল। বানরটা কি শুনতে পাচ্ছে তাদের আলাপচারিতা? বিকেলে ডেনিশকে মারার পরে, সন্ধ্যায় বানরটাকে দেখে হ্যালের মনে হচ্ছিল ওটা যেন এই ঘটনায় খুব মজা পেয়েছে। যদিও ডেনিশ ক্ষমা চেয়েছে হ্যালের কাছে। কিন্তু বানরটা যেন মুচকি হেসে বলছিল–তুমি কখনোই ডেনিশের সাথে অন্তরঙ্গ হতে পারবে না। সে যতই চেষ্টা করো। ওটার হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল হ্যালের। রাগের চোটে ঢুকিয়ে ফেলেছে সুটকেসে।

টেরির কথার কোন জবাব দিল না হ্যাল। চুপচাপ শুয়ে পড়ল বিছানায়। তবে সারারাত ঘুম এল না। সারাক্ষণ চিন্তা করল কিভাবে বানরটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

বানরটাকে দ্বিতীয়বার খুঁজে পেয়েছিল বিল।

সেটা ছিল বিউলাহ্ ম্যাককাফেরির মৃত্যুর দেড় বছর পরের ঘটনা। গ্রীষ্মকাল। হ্যাল মাত্র কেজি শেষ করেছে।

স্টিভি আর্লিংজেনের সাথে খেলেটেলে ঘরে ঢুকেছে হ্যাল, মা বললেন, 'হাত মুখ ধুয়ে আয়, হ্যাল। তোকে ভাগাড়ের শুয়োরের মত লাগছে।' মা বারান্দায়, চা খেতে খেতে বই পড়ছিলেন। তখন মা'র ছুটি চলছে। দুই হপ্তা।

হাত-মুখ ধুয়ে এল হ্যাল, শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'বিল কোথায়?'

'দোতলায়। ওর ঘরটা পরিষ্কার করতে বলবি। যা দশা করে রেখেছে ঘরের।'

হ্যাল লাফাতে লাফাতে ছুটল বড় ভাইয়ের ঘরে। বিলকে দেখল বসে আছে মেঝেতে। ব্যাক ক্লজিটের দরজা ভেজানো। বিলের হাতে বানরটা। 'ওটা নষ্ট,' সাথে সাথে বলল হ্যাল। 'কাজ করে না।'

কথাটা মিথ্যা বলেনি হ্যাল। বানরটা বিকলই ছিল। তবে বিউলাহ্'র মৃত্যুর দিনে কিভাবে যে ওটা জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল বোধগম্য হয়নি হ্যালের। অবশ্য গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়েছে। বানরটাকে নিয়ে, বিউলাহ্'র মৃত্যুর পরে ভয়ানক সব স্বপ্নও দেখেছে হ্যাল। এক রাতে সে জেগে দেখে ওটা তার বুকে চেপে বসেছে, হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল হ্যাল। মা সাথে সাথে চলে আসেন পাশের ঘর থেকে। ছেলেকে পানি পান করান। ভেবেছিলেন বিউলাহ্'র আকস্মিক মৃত্যু গভীর রেখাপাত করেছে হ্যালের কচি মনে। সান্ত্বনা দিয়েছেন ছেলেকে। কিন্তু হ্যালের আসল ভয়ের কারণ জানতে পারেননি।

এ সব ঘটনা অস্পষ্ট মনে পড়ে হ্যালের। তবে বানরটা এখনও তাকে ভীত করে তোলে। বিশেষ করে ওটার হাতের ঢোল আর বড় বড় দাঁতগুলো। 'জানি,'

হ্যালের কথা শুনে বলল বিল, ছুঁড়ে ফেলল বানরটাকে এক পাশে। 'এটা একটা বোকা বানর।'

বানরটা গিয়ে পড়ল বিলের বিছানায়, ছাদের দিকে মুখ, উঁচু হয়ে থাকল ঢোল। ওটাকে দেখে খুশি হতে পারল না হ্যাল। বলল, 'মা তোমাকে বলেছে ঘর পরিষ্কার করতে।'

'সে পরে পরিষ্কার করলেও চলবে,' বলল বিল। 'পপসিক্‌ল্‌ কিনতে টেডির দোকানে যাবি?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল হ্যাল বিষণ্ন মুখে। 'নাহ্‌। পয়সা নেই।'

'তোকে আমি ধার দেব,' বলল বিল। 'চল্‌।'

'তাহলে যেতে পারি,' কৃতজ্ঞ গলায় বলল হ্যাল। 'বানরটাকে ক্লজিটে ভরে রেখে যাই?'

'দরকার নেই,' উঠে দাঁড়াল বিল, 'পরে রাখা যাবে। এখন চল্‌।'

গেল হ্যাল। কারণ বিলের মেজাজ মর্জির ওপর ভরসা নেই। সে বানরটাকে ক্লজিটে রাখতে গিয়ে পপসিক্‌ল্‌ কেনার সুযোগ হারাতে চায় না। ওরা টেডির দোকানে গেল, তারপর গেল রেক-এ। ওখানে কয়েকটা ছেলে বেসবল খেলছিল। তবে হ্যাল খুব ছোট বলে ওকে কেউ খেলায় নেয় না। সে পপসিক্‌ল্‌ খেতে খেতে খেলা দেখল। বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা।

তারপর হাত মুখ ধুয়ে, সাপার খেয়ে টিভি দেখতে দেখতে বানরটার কথা ভুলেই গেল হ্যাল। অবশ্য মা বিলকে পিট্টি দিলেন সে ঘর পরিষ্কার করেনি বলে। হ্যাল বানরটাকে দেখল বিলের শেলফের ওপর, অটোগ্রাফ খাতার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে বানরটা কিভাবে গেল বুঝতে পারল না হ্যাল। হয়তো মা রেখেছে।

হ্যালের এখন সাত বছর। বেবী সিটার রাখা বেহুদা খরচ। মিসেস শেলবার্ন প্রতিদিন সকালে অফিসে যাবার সময় বলে যান, 'বিল, তোর ভাইকে দেখিস।'

সেদিন বিলকে স্কুলে থাকতে হলো সেফটি প্যাট্রলবয় মিটিং-এর জন্য। তাই একা বাড়ি ফিরল হ্যাল। বাসায় ঢুকেই ফ্রিজ খুলল দুধ খাওয়ার জন্য। কিন্তু দুধের বোতল হাত ফস্কে পড়ে গেল মেঝেতে। ভেঙে চৌচির। মেঝে বোঝাই ভাঙা কাঁচ। বানরটা হঠাৎ ডিম ডিমা ডিম ডিম ঢোল বাজাতে শুরু করেছে।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হ্যাল, তাকিয়ে আছে ভাঙা কাঁচ আর দুধের স্রোতের দিকে। প্রচণ্ড একটা ভয় গ্রাস করল ওকে।

খানিকপর ঘুরে দাঁড়াল হ্যাল, দ্রুত চলে এল ওদের ঘরে। বানরটা দাঁড়িয়ে আছে বিলের শেলফের ওপর, কটমট করে তাকাচ্ছে হ্যালের দিকে। বানরটা বিলের অটোগ্রাফ খাতা ফেলে দিয়েছে বিছানায়, মুচকি মুচকি হাসছে। শরীর দুলছে বাজনার তালে। ধীর পায়ে ওটার দিকে এগোল হ্যাল। বানরের বাজনার গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হ্যাল, পরক্ষণে এক থাবড়ায় বানরটাকে ফেলে দিল শেলফ থেকে। উড়ে গিয়ে ওটা পড়ল বিলের বালিশে, ওখান থেকে ডিগবাজি খেয়ে মেঝেতে। তখনও ঢোল বাজিয়ে চলেছে ডিম ডিমা ডিম ডিম।

ঠিক তখন বিউলাহ্‌'র কথা মনে পড়ে গেল হ্যালের। বিউলাহ্‌ যেদিন মারা যায়, সে রাতে ঠিক এভাবে ঢোল বাজিয়েছিল বানরটা।

বানরটাকে লাথি মারল হ্যাল সর্বশক্তি দিয়ে। এবার ভয় নয়, রাগে চিৎকার করে উঠল। মেঝে থেকে ছিটকে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেল বানর। তারপর আর নড়ল না। হ্যাল দাঁড়িয়ে রইল। হাত মুঠো করা। পাঁজরের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আশ্চর্য, ওটা এখনও মুচকি হাসছে ওর দিকে চেয়ে। চকচকে চোখ মেলে যেন বলছে–*যত ইচ্ছে লাথি মারো। কিন্তু আমি তো পুতুল বৈ কিছু নই। আচ্ছা, বলো তো তোমার মা এখন কোথায়? ব্রুক স্ট্রীট কর্নারে। একটা গাড়ি ছুটে আসছে তার দিকে। আর গাড়ির ড্রাইভারটা মাতাল। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ বিলের খুলি ভাঙার মটমট শব্দ? দেখতে পাও ওর মগজ গলে গলে পড়ছে কান বেয়ে? হ্যাঁ নাকি না? তবে আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আমি জানি না। আমি শুধু জানি কিভাবে আমার ঢোলটা ডিম ডিমা ডিম ডিম করে বাজে। আর তুমি জানো আমার ঢোল বাজার সময় কেউ না কেউ মারা যায়। এবার কার পালা, হ্যাল? তোমার? নাকি তোমার ভাই'র?*

বেগে বানরটার দিকে ছুটল হ্যাল। ওকে পা দিয়ে মাড়িয়ে থেঁতলে দেবে, গায়ের ওপর উঠে লাফাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটার সমস্ত যন্ত্রপাতি শরীর থেকে ছুটে পড়ে, ভয়ংকর চোখজোড়া গড়াগড়ি যায় মেঝেতে। কিন্তু বানরটার সামনে আসতেই ওটা আবার সচল হয়ে উঠল। এবার আস্তে আস্তে বাজতে শুরু করল ঢোল। ভয়টা আবার ফিরে এল হ্যালের মনে। বানরটা তখন দাঁত বের করে হাসছে। যেন জেনে ফেলেছে হ্যালের কিসে ভয়। কিন্তু হ্যালের রাগও হচ্ছিল প্রচণ্ড। ভয়টাকে পাত্তা না দিয়ে সে পুতুলটাকে তুলে নিল হাতে। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে বানরটার একটা হাত ধরল। হ্যালের চেহারা বিকৃত। যেন একটা লাশ ধরে আছে। ব্যাক ক্লজিটের ছোট দরজাটা হাতড়ে খুলে ফেলল। আলো জ্বালল। বানরটা মুচকি হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। হ্যাল স্টোরেজ এলাকার মাঝ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। চারপাশে প্রচুর বাক্স। একটার ওপর আরেকটা ডাঁই করে রাখা। পুরানো কেমিকেল, কাপড় আর স্যুভেনিরের গন্ধ ভেসে এল নাকে। হ্যাল ভাবছে: বানরটা যদি এখন আবার ঢোল বাজাতে শুরু করে আমি নির্ঘাত চিৎকার করে উঠব। আর আমি যদি চিৎকার করি তাহলে ওটা আরও বেশি করে হাসবে। তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব। লোকে আমাকে যখন এখানে খুঁজে পাবে দেখবে পাগলের মত হাসছি আমি। আমি পাগল হয়ে যাব! ওহ্, ঈশ্বর, দয়া করো যীশু, আমাকে পাগল হতে দিয়ো না–'

ক্লজিটের দূর প্রান্তে চলে এল হ্যাল, দুটো বাক্সের একটা সরাতেই র‍্যালস্টন-পুরিনার বাক্সটা চোখে পড়ল। ওটার ভেতর ঢোকাল বানরটাকে। তারপর ঠেলে সরিয়ে দিল কোণার দিকে। পিছিয়ে এল হ্যাল। হাঁপাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে কখন আবার বেজে ওঠে ঢোল। ঢোল বাজলেই হয়তো বাক্স ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে বানর, লাফিয়ে পড়বে হ্যালের ওপর।

কিন্তু এসব কিছুই ঘটল না। হ্যাল বাতি নেভাল। বন্ধ করে দিল ক্লজিটের দরজা। এখনও হাঁপাচ্ছে। তবে আগের চেয়ে ভাল লাগছে। ক্লান্ত পায়ে নেমে এল নিচে। একটা খালি ব্যাগ জোগাড় করল। তারপর ভাঙা কাঁচের টুকরো তুলতে শুরু করল মেঝে থেকে। তোয়ালে দিয়ে পরিষ্কার করল মেঝের দুধ। শেষে অপেক্ষা

করতে লাগল মা আর ভাইয়ের জন্য।

মা এলেন আগে। জিজ্ঞেস করলেন, 'বিল কোথায়?' হ্যাল জানাল বিল প্যাট্রল বয় মিটিং-এ গেছে। তবে ওর ফিরে আসার কথা আরও আধাঘণ্টা আগে।

হ্যালের শুকনো, নিষ্প্রাণ কণ্ঠ শুনে বিচলিত বোধ করলেন মা। উদ্বিগ্ন চোখে চাইলেন ছেলের দিকে, কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেন, ঠিক তখন খুলে গেল সদর দরজা। ভেতরে ঢুকল বিল। কিন্তু ও যেন বিল নয়। বিলের ভূত। বিষণ্ন, নীরব। 'কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস শেলবার্ন। 'কি হয়েছে, বিল?'

কাঁদতে শুরু করল বিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে চলল তার গল্প।

বিল স্কুলের মিটিং শেষে তার বন্ধু চার্লি সিলভার ম্যানকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু ব্যস্ত রাস্তা ব্রুক স্ট্রীট কর্নারের মোড় পার হবার সময় একটা দ্রুতগামী গাড়ি চার্লিকে চাপা দিয়ে চলে যায়।

এবার তারস্বরে কান্না শুরু করে দিল বিল, বেড়ে গেল ফোঁপানি। মা জড়িয়ে ধরলেন ওকে। সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কেঁদে ফেলল হ্যালও। তবে এটা তার স্বস্তির কান্না।

চার্লির মৃত্যু গভীর দাগ কেটে গেল বিলের মনে। সে রীতিমত দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করল। চার্লির হন্তারক ড্রাইভার ধরা পড়ল। লোকটা বেহেড মাতাল হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। তবে কাস্টডিতে নেয়ার কিছুদিন পরেই হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেল সে।

হ্যাল এদিকে বানরটার কথা প্রায় ভুলেই বসেছিল। কিংবা বলা যায় গোটা ব্যাপারটা সে ধরে নিয়েছিল স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন হিসেবে। কিন্তু বানরের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না সে তার মা'র মৃত্যুর কারণে।

একদিন বিকেলে হ্যাল স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে তার মা মরে গেছে। আর বানরটা আবার ফিরে গেছে শেলফে, ঢোল বাজার অপেক্ষায়, মুখে সেই ভয়ংকর মুচকি হাসি।

হ্যাল হাত বাড়িয়ে তুলে নিল বানরটাকে। ওটা মোচড় খেল মুঠোর মধ্যে। যেন জ্যান্ত। গুঙিয়ে উঠল হ্যাল। আঙুল ঢুকিয়ে দিল বানরের চোখের মধ্যে। তারপর দেয়ালে ওটাকে বারবার আছাড় মারল। শেষে বাথরুমে ঢুকে হড় হড় করে বমি করে দিল হ্যাল।

জানা যায়, সেদিন বিকেলে মিসেস শেলবার্ন মারা গিয়েছিলেন মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে যাবার কারণে। ওয়াটার কুলারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি হাতে এক গ্লাস পানি নিয়ে। হঠাৎ ঝাঁকি খায় তাঁর শরীর, যেন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। হাঁটু ভেঙে পড়ে যান মিসেস শেলবার্ন। হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায় গ্লাস। ডাক্তার বলেছেন গ্লাসের পানি মিসেস শেলবার্নের গা ভিজিয়ে দেয়ার আগেই তিনি মারা গেছেন।

দুটো রাত ভয়াবহ কেটেছে দুই ভাইয়ের। ওই দুই রাত ওদের সাথে ছিলেন প্রতিবেশী মিসেস স্টাবি। দুইদিন পরে ইডা চাচী এসে ওদেরকে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে।

মা'র মৃত্যু দৃশ্য দুঃস্বপ্নের মত অনেকদিন তাড়া করে ফিরেছে হ্যালকে। বড় ভাই বিল সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছে ছোট ভাইকে। কিন্তু হ্যাল সবসময় অপরাধ

বোধে ভুগেছে। মা'র মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী বলে মনে হত তাঁর। সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পরে বানরটাকে লাথি মারা উচিত হয়নি। বানরটা তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

কাল রাতে নানা কথা ভাবতে গিয়ে ঘুমাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল হ্যালের। আজ ঘুম ভেঙে দেখে প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। পেটি পা আড়াআড়ি ভাবে মুড়ে আপেল খাচ্ছে আর টিভিতে গেম শো দেখছে।

বিছানা থেকে নামল হ্যাল। মাথাটা দপদপ করছে।

'তোর মা কোথায়, পেটি?' জিজ্ঞেস করল সে।

পেটি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'ভাইয়াকে নিয়ে শপিং-এ গেছে। আমাকেও যেতে বলেছিল। আমি রাজি হইনি। আচ্ছা, বাবা, তুমি কি ঘুমের মধ্যে সব সময় কথা বলো?'

কৌতুকের দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকাল হ্যাল। 'নাতো। কেন রে?'

'তুমি আজ ঘুমের মধ্যে সারাক্ষণ কি যেন বিড় বিড় করছিলে। আমার ভয় লাগছিল।'

'আর ভয় পেতে হবে না। আমি এখন ঠিক আছি।' হাসল হ্যাল। জবাবে পেটিও হাসল। ছেলেটার জন্যে মায়া লাগল হ্যালের। পেটিকে ও ডেনিশের চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসে এতে কোনই সন্দেহ নেই। ডেনিশটা এরকম বেয়াদব ছিল না। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসার পরে ছেলেটা কেমন বদলে গেল।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল হ্যাল। বানরটা। বসে আছে জানালার গরাদে। হ্যালের মনে হলো ওর হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেছে, তারপর যেন ঘোড়ার মত লাফাতে শুরু করল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল হ্যালের, হঠাৎ বেড়ে গেল মাথা ব্যথাটা।

সুটকেস থেকে ওটা বেরিয়ে এসেছে, বসেছে জানালার ধারে। মিটিমিটি হাসছে ওর দিকে চেয়ে। যেন বলছে ভেবেছ আমার কবল থেকে মুক্তি পাবে? আগেও এরকম ভেবেছিলে, তাই না? হ্যাঁ, মনে মনে বলে হ্যাল, তাই ভেবেছিলাম।

'পেটি, বানরটিকে কি তুই সুটকেস খুলে বের করেছিস?' জিজ্ঞেস করল হ্যাল। জবাবটা কি হবে জানাই ছিল তার। কারণ সুটকেসের তালা নিজের হাতে বন্ধ করে চাবি ওভারকোটের পকেটে রেখেছিল হ্যাল।

পেটি বানরটার দিকে তাকাল, অস্বস্তি ফুটল চেহারায়। 'না', বলল ও। 'মা ওখানে রেখেছে।'

'মা রেখেছে?'

'হ্যাঁ। তোমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে। মা তখন হাসছিল।'

'আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে? বলছিস কি তুই?'

'তুমি বানরটাকে সাথে নিয়ে ঘুমিয়েছিলে। আমি দাঁত মাজছিলাম। ভাইয়া ওটাকে দেখে ফেলে। সে-ও হাসছিল। বলছিল তোমাকে নাকি টেডিবিয়ার শিশুর মত লাগছে।'

বানরটার দিকে তাকাল হ্যাল। ওর গলা এমন শুকিয়ে গেছে, ঢোক গিলতেও পারছে না। বানরটাকে নিয়ে সে বিছানায় গেছে? ওটা তার সঙ্গে ছিল? ওই নোংরা

জিনিসটা! ওহ্ ঈশ্বর!

ঘুরল হ্যাল, দ্রুত পা বাড়াল ক্লজিটের দিকে। সুটকেস যথাস্থানে আছে। এবং তালা মারা।

টিভি বন্ধ করে পেটি এসে দাঁড়াল বাপের পেছনে। খুব আস্তে বলল, 'বাবা, বানরটাকে আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমারও,' সায় দিল হ্যাল।

পেটি বাবার চোখে চোখ রাখল। বোঝার চেষ্টা করল বাবা ঠাট্টা করছে কিনা। নাহ্, সে সিরিয়াস। বাবাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল পেটি। হ্যাল টের পেল তার ছেলে কাঁপছে থরথর করে।

পেটি বাবার কানে কানে কথা বলতে শুরু করল। যেন ভয় পাচ্ছে বানরটা শুনে ফেলবে তার কথা। গলার স্বর নীচু। 'তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে, বানরটাকে মনে হচ্ছিল সব সময় চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। যেখানেই যাও, অনুসরণ করে চলেছে। পাশের ঘরে গেলে মনে হবে ওটাও দেয়াল ফুঁড়ে ঢুকছে। ওটার উপস্থিতি যেন টের পাচ্ছিলাম আমি…মনে হচ্ছিল ওটা আমাকে কোন কিছুর জন্য চাইছে।'

শিউরে উঠল পেটি। হ্যাল শক্ত করে ধরে রইল ওকে।

পেটি বলে চলল, 'বানরটাকে নষ্ট খেলনা বলে আমার মনে হয় না। মনে হচ্ছিল ওটা আমাকে বলছে, আমাকে জাগিয়ে তোলো, পেটি। আমরা এক সাথে খেলব। তোমার বাবা আমাকে কোনদিন জাগিয়ে তুলবে না। তুমি আমাকে জাগিয়ে তোলো, জাগিয়ে তোলো'… বলতে বলতে কেঁদে ফেলল পেটি। 'পুতুলটা ভাল নয়। আমি ঠিক বুঝতে পারছি, বাবা। ওটাকে ফেলে দেয়া যায় না? বাবা, প্লীজ?'

বানরটা মুচকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে নির্নিমেষ তাকিয়েই রয়েছে হ্যালের দিকে। ওটার পেতলের ঢোলে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ঝকমক করছে। 'তোর মা এবং ভাইয়া কখন ফিরবে, পেটি?' জিজ্ঞেস করল হ্যাল।

'বলেছে একটার মধ্যে,' লাল চোখ জামার হাতায় মুছল পেটি। কেঁদে ফেলে বিব্রত। তবে বানরটার দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না।

'আমি ভয়ের চোটে টিভি অন করি,' বলল পেটি। 'জোরে সাউন্ড দিই।'

'ঠিক আছে, পেটি।'

'আমার মনে হচ্ছিল বানরটাকে জাগিয়ে তুললে তুমি ঘুমের মধ্যে মরে যাবে,' বলল পেটি। 'খুব অদ্ভুত চিন্তা, না, বাবা?' গলার স্বর আবার কাঁপছে ওর।

কিভাবে মৃত্যু ঘটবে আমার? ভাবছে হ্যাল। হার্ট-অ্যাটাক? নাকি আমার মা'র মত মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে? বানরটাকে দূর করে দিতেই হবে। ভাবল হ্যাল। কিন্তু ওটার হাত থেকে কি আদৌ রক্ষা মিলবে?

বানরটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে হ্যালের দিকে। যে রাতে ইডা চাচী মারা গেলেন সে রাতে কি বানরটা জেগে উঠেছিল? ভাবছে হ্যাল। তিনি কি মৃত্যুর আগে ঢোলের শব্দ শুনে গেছেন?

'তোর চিন্তাটা অদ্ভুত না রে, বাবা,' ছেলেকে আস্তে আস্তে বলল হ্যাল। 'নে। ফ্লাইট ব্যাগটা গুছিয়ে রেডি হ।'

পেটি উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল বাবার দিকে। 'কোথায় যাবে?'

'চল, একটু ঘুরে আসি।' বলল হ্যাল। 'তবে আগে ব্যাগে পার্ক থেকে বড় বড় কয়েক টুকরো পাথর নিয়ে নিবি। কেন, বুঝতে পেরেছিস?'

জ্বলজ্বল করে উঠল পেটির চেহারা। 'বুঝতে পেরেছি, বাবা।'

ঘড়ি দেখল হ্যাল। সোয়া বারোটা। 'তাড়াতাড়ি কর। তোর মা আসার আগে চলে আসতে হবে।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'উইল চাচা এবং ইডা চাচীর বাড়িতে,' বলল হ্যাল।

হ্যাল বাথরুমে ঢুকল। জানালা দিয়ে তাকাল রাস্তায়। পেটিকে দেখা যাচ্ছে। শার্ট-জ্যাকেট গায়ে, কাঁধের ফ্লাইট ব্যাগের ডেলটা লেখাটাও পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। পার্কের দিকে এগোচ্ছে পেটি।

পার্ক থেকে প্রমাণ সাইজের গোটা তিনেক পাথর জোগাড় করল। তারপর রাস্তা পার হতে শুরু করল। মোটেলের বাথরুম থেকে ওকে এখনও লক্ষ করছে হ্যাল। মোটেলের কোণ ঘেঁষে হঠাৎ একটা গাড়ি বেরিয়ে এল তীব্র স্পীডে। পেটি ঠিক ওই মুহূর্তে পার্ক থেকে রাস্তায় নেমেছে, এগোচ্ছে মোটেলের দিকে। এক সেকেন্ডের জন্যে গাড়ি চাপা পড়ল না পেটি। দৌড়ে পার হয়ে গেল রাস্তা। ওর পাশ দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়ি।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রাস্তার দৃশ্যটা দেখছিল হ্যাল। পেটিকে নিরাপদে রাস্তা পার হতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এরই মধ্যে ঘেমে নেয়ে গেছে সে।

পেটি এল হাঁপাতে হাঁপাতে। মুখ গোলাপী। 'বাবা, তিনটা বড় বড় পাথর পেয়েছি। আমি–' হঠাৎ থেমে গেল ও। 'বাবা তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ,' কপালের ঘাম মুছল হ্যাল। 'ব্যাগটা নিয়ে আয়।'

ব্যাগ নিয়ে এল পেটি। খুলল। ভেতরে বড়সড় তিনটা পাথর। বানরটাকে ধরে ব্যাগের মধ্যে ছুঁড়ে মারল হ্যাল। টিং করে শব্দ হলো। ঢোল বাড়ি খেয়েছে পাথরে। ব্যাগটা কাঁধে ফেলল হ্যাল। ছেলেকে বলল, 'চল্ বাপ।'

'যাব কি করে?' বলল পেটি। 'মা গাড়ি নিয়ে গেছে।'

'একটা ব্যবস্থা হবেই,' বলে ছেলের চুল নেড়ে দিল হ্যাল আদর করে।

ডেস্ক ক্লার্ককে নিজের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাল হ্যাল। কুড়ি ডলার দিল। ক্লার্ক হ্যালকে নিজের লঝঝড়ে এ এমসি গ্রেমলিন গাড়িটা দিল চালাতে। রুট ৩০২ ধরে ওরা কাসকোর দিকে এগোল। হ্যাল কথা বলতে শুরু করল ছেলের সঙ্গে। প্রথমে আস্তে, তারপর দ্রুত হয়ে উঠল ভঙ্গিটা। বলল হ্যালের বাবা অর্থাৎ পেটির ঠাকুরদা বানরটাকে বাইরের কোন দেশ থেকে সম্ভবত কিনে এনেছিলেন ছেলেদের উপহার দিতে। তবে খেলনাটার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না। এ রকম চাবি দেয়া খেলনা বানর লাখ লাখ আছে সারা বিশ্বের দোকানে। কিছু তৈরি হয় হংকং-এ, কিছু তাইওয়ানে, কিছু কোরিয়ায়। হ্যালের বাবার বানরটা ছিল হংকং-এর। এ বানরটাকে নিয়ে শৈশব থেকে দুঃস্বপ্নের শুরু হ্যালের। ওটার মধ্যে অশুভ, ভয়ংকর কিছু একটা আছে।

তবে পেটিকে ভয় পাইয়ে দিতে চায় না বলে অনেক কিছু চেপে গেল হ্যাল। অবশ্য পেটি বাপকে বানরের ব্যাপারে কোন প্রশ্নও করল না। হয়তো বাবার গল্পের সাথে নিজের কল্পনা মিলিয়ে সে সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে।

মা মারা যাবার পরে ইডা চাচী মায়ের মত আগলে রেখেছিলেন হ্যাল আর বিলকে। কানেকটিকাট থেকে ওরা যেবার মেইনে চলে এল, বাড়ির অনেক হাবিজাবি জিনিস ফেলে দিয়েছিলেন ইডা চাচী। ট্রাক বোঝাই করে সে সব আবর্জনা নিয়ে গেছে এক ইটালিয়ান লোক। ওই ট্রাকে অশুভ বানরটাকেও পাচার করে দিয়েছিল হ্যাল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল ওটাকে আর দেখতে হবে না ভেবে।

এই ঘটনার মাস তিনেক পরে হার্টফোর্ডের বাড়ির চিলেকোঠায় হ্যালকে ইডা চাচী পাঠান ক্রিসমাস ডেকোরেশনের কিছু বাক্সপেঁটরা নিয়ে আসতে। গায়ে ধুলোটুলো মেখে মহা উৎসাহে বাক্স নামাচ্ছিল হ্যাল, হঠাৎ একটা বাক্সের দিকে চোখ যেতে জমে যায় সে। ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল ওখানেই অজ্ঞান হয়ে যাবে। ওখানে, র‍্যালস্টন-পুরিনা কার্টনের এক কোণায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। দাঁত বের করে হাসছে, দু'হাতে ঢোল। যেন ওটা হ্যালকে বলছিল:

ভেবেছিলে আমার কাছ থেকে রেহাই পেয়ে যাবে, তাই না? আমার কাছ থেকে রেহাই পাওয়া অত সোজা না, হ্যাল। তোমাকে আমি পছন্দ করি, হ্যাল। আমরা পরস্পরের জন্য এ পৃথিবীতে এসেছি। যেমন সম্পর্ক থাকে পোষা বানরের সাথে তার প্রভুর। এখান থেকে দক্ষিণের কোথাও এক ইটালিয়ান ট্রাকঅলা চিৎ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। তার চোখ বেরিয়ে এসেছে কোটর ছেড়ে, দাঁতের পাটিও বের হয়ে আছে মুখ থেকে। লোকটা তার নাতির জন্য উপহার হিসেবে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে সে রেখেছিল তার শেভিং কিটসের মধ্যে। লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি। তাই ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোমার কাছে এসেছি, হ্যাল। আমি তোমার ক্রিস্টমাস উপহার, হ্যাল। হ্যাল, আমাকে জাগিয়ে তোলো। এবার কে মারা গেছে, হ্যাল? বিল? উইল চাচা? নাকি তুমি?

হ্যাল সভয়ে চলে এসেছে ওখান থেকে। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় আরেকটু হলে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যেত। চাচীকে বলেছে সে ক্রিসমাস ডেকোরেশনের বাক্স খুঁজে পায়নি। জীবনে ওই প্রথম চাচীকে মিথ্যা কথা বলে হ্যাল। চাচী তার কথা বিশ্বাস করেছেন কিনা জানে না হ্যাল। তবে ওই রাত থেকে আবার সে বানরটাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এক সময় সন্দেহ হতে থাকে তার বাবার অদৃশ্য হয়ে যাবার পেছনে বানরটার হাত আছে।

হ্যালদের বাড়ির পেছনে বোট হাউস। বোট হাউসটা নড়বড়ে, অনেক দিন আগের। হ্যাল ব্যাগটা ডান হাতে ধরে রেখেছে। তার গলা শুকিয়ে কাঠ, কানে অস্বাভাবিক একটা গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। ব্যাগটা খুব ভারী লাগছে হ্যালের।

'এখানে কি হবে, বাবা?' জিজ্ঞেস করল পেটি।

জবাব দিল না হ্যাল। ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, 'এটা ধরবি না।'

পকেট হাতড়ে চাবির গোছা বের করল হ্যাল। বিল দিয়েছে। গোছায়

অ্যাডহেসিভ টেপ লাগানো। তাতে লেখা বোট হাউস।

দিনটি পরিষ্কার, ঠাণ্ডা। বাতাস বইছে। আকাশ ঝকমকে নীল। লেকের পাড়ের গাছগুলোর ডাল এবং পাতা বাতাস পেয়ে নড়ছে। যেন কথা বলছে বাতাসের সঙ্গে।

তালা খুলে বোট হাউসে ঢুকল হ্যাল। স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে। উইল চাচার রো বোটটা আগের মতই পড়ে আছে। বৈঠা জোড়া ঝকঝকে। যেন গতকালই নৌকা বেয়েছেন চাচা। এই নৌকায় চড়ে সে বহুবার চাচার সাথে লেকে গিয়েছে মাছ ধরতে। তবে বিলকে নিয়ে এক সঙ্গে যাওয়া হয়নি। নৌকাটা ছোট। তিনজনের জায়গা হয় না। বিল চাচার সাথে আলাদাভাবে গেছে। র‍্যাম্প ধরে নৌকাটাকে টেনে আনল হ্যাল। ভাসিয়ে দিল ক্রিস্টাল লেকে। খুব গভীর লেক। একশো ফুটেরও বেশি। চাচা কখনও মাঝ লেকে যাননি মাছ ধরতে। লেকের নীলচে-কালো পানি এখন স্থির।

পেটি জানতে চাইল, 'আমাকে নেবে না, বাবা?'

হ্যাল বলল, 'আজ নয়। পরে।' বলে উঠে পড়ল সে নৌকায়।

ঠিক তখন তার রক্ত হিম করে দিয়ে বেজে উঠল ঢোল–ডিম ডিমা ডিম ডিম। ব্যাগের মধ্যে বসে ঢোল বাজাচ্ছে বানর। কাঁপতে কাঁপতে ব্যাগের চেইন খুলে ফেলল হ্যাল। বানরটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাসছে। ঢোল বাজানো বন্ধ হয়ে গেল। হাসি হাসি মুখটা যেন বলছে এবার কার পালা, হ্যাল? তোমার না পেটির?

'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত চাপল হ্যাল। 'দাঁড়া, তোর ব্যবস্থা করছি।'

ব্যাগের চেইন আবার বন্ধ করে ফেলল হ্যাল। তাকাল তীরের দিকে। পেটি দাঁড়িয়ে আছে তীরে। হাত নাড়ছে। হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিল হ্যাল।

সূর্য এখন মাথার ওপর। ঘাড়ে বিদ্ধ করছে সূর্যতাপ। ঘামতে শুরু করেছে হ্যাল। ফ্লাইট ব্যাগটার দিকে এক পলক তাকাল। মনে হলো···মনে হলো ব্যাগটা যেন ফুলে উঠেছে। ব্যাগ থেকে নজর ফিরিয়ে নিল হ্যাল। দ্রুত বাইতে শুরু করল বৈঠা।

বাতাসটা ঠাণ্ডা। শুকিয়ে ফেলল ওর ঘাম, শীতল হয়ে এল গা। কিছুক্ষণ আগেও লেকে ঢেউ ছিল না। এখন বাতাসের সাথে লেকে ঢেউ উঠতে শুরু করেছে। লেকের তীর থেকে পেটি চিৎকার করে কিছু একটা বলল তার বাপকে। কিন্তু বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজে শুনতে পেল না হ্যাল। কিছু একটা দেখতে ইশারা করছে পেটি। বুঝতে পারল না হ্যাল। আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। অথচ একটু আগেও ঝকমক করছিল আকাশ। লেকের ঢেউও বেড়ে গেছে বাতাসের বেগের সাথে। নৌকার গায়ে সাদা ফেনা নিয়ে ছুটে এসে ধাক্কা খাচ্ছে ঢেউ। দুলে দুলে উঠছে নৌকা।

পেটির দিকে তাকাল হ্যাল। আকাশের দিকে আঙুল তুলে কি যেন দেখাচ্ছে ছেলেটা। ওর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে হ্যাল। চিৎকার অস্পষ্ট শোনাচ্ছে।

আকাশ খুব দ্রুত ঢেকে যেতে শুরু করল কালো মেঘে। সেই সাথে বেড়ে চলল ঢেউয়ের আকার। বিশাল বিশাল ঢেউ ছুটে এল নৌকার দিকে। হ্যালের মনে হলো

ঢেউয়ের সাথে একটা ছায়া দেখতে পেয়েছে সে। খুব পরিচিত একটা ছায়া। ছুটে আসছে তার দিকে। অনেক কষ্টে গলা ঠেলে উঠে আসা চিৎকারটাকে গিলে ফেলল হ্যাল।

সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে মেঘের আড়ালে। কালো মেঘের প্রকাণ্ড ছায়া গ্রাস করল নৌকা। সাথে সাথে ব্যাগের ভেতর থেকে ভেসে এল ঢোলের শব্দ–ডিম ডিমা ডিম ডিম, এক ঘেয়ে বাজনাটা যেন বলে চলল: *এবার পেয়েছি তোমাকে, হ্যাল। লেকের গভীরতম অংশে চলে এসেছ তুমি। এবার তোমার পালা, তোমার পালা–*

বৈঠা জোড়া নৌকায় তুলে চট করে ফ্লাইট ব্যাগটা তুলে নিল হ্যাল। ঢোল বেজেই চলেছে। আওয়াজ আরও জোরাল।

'এখানে কুত্তার বাচ্চা!' চিৎকার করে উঠল হ্যাল। 'এখানেই তোর মরণ!'

ভারী পাথর বোঝাই ব্যাগটা পানিতে ছুঁড়ে ফেলল সে।

দ্রুত ডুবতে শুরু করল ব্যাগ। ডুবছে, হ্যাল দেখল ব্যাগের কোণা নড়ছে। তার মনে হলো অনন্তকাল ধরে সে ঢোলের বাজনা শুনছে। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো লেকের খলবলে কালো পানি যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। সে ওখানে দেখতে পেল অ্যামস বুলিগানের স্টুডবেকারকে, সে এই লেকে মাছ ধরতে এসে ডুবে মরেছে। এর গল্প উইল চাচা অনেক বলেছে হ্যালকে। হ্যাল ওর মাকেও দেখতে পেল পানির মধ্যে। কংকাল। দাঁত বের করে হাসছেন। উইল চাচা এবং ইডা চাচী মা'র পাশে, ঢেউয়ের তালে দোল খাচ্ছে। ব্যাগ পড়ছে, বুদ্বুদ উঠছে ওপরে। সেই সাথে শব্দ আসছে ডিম ডিমা ডিম ডিম।

পাগলের মত বৈঠা বাইতে শুরু করল হ্যাল। ঠিক সেই সময় পিস্তলের গুলির মত আওয়াজ হলো দুই পায়ের মাঝখানে। ফেটে গেছে তক্তা। ভাঙা তক্তার মাঝ দিয়ে হুড়হুড়িয়ে পানি ঢুকতে শুরু করল। নৌকাটা বহু পুরানো, কাঠ হয়তো পচে গেছিল, তাই ফাটল ধরেছে তক্তায়। কিন্তু নৌকা পানিতে নামানোর সময় কোন ফাটল বা ছিদ্র চোখে পড়েনি হ্যালের। হ্যাল নৌকা বাইতে লাগল।

হ্যাল মোটামুটি সাঁতার জানে। কিন্তু নৌকা ডুবে গেলে ফুঁসে ওঠা এই লেকে সাঁতার কেটে আদৌ লাভ হবে কিনা জানে না।

বিশ সেকেন্ড পাগলের মত বৈঠা বাইবার পরে আবার পিস্তলের গুলির আওয়াজ হলো। আবার দুটো তক্তা ফেটে গেছে। আরও পানি ঢুকতে শুরু করল। ভিজিয়ে দিল হ্যালের জুতো। ধাতব শব্দ হতে বুঝতে পারল পেরেক টেরেকগুলোও ছুটে যাচ্ছে নৌকার গা থেকে।

হঠাৎ পেছন থেকে হামলা করে বসল বাতাস। যেন ধাক্কা মেরে ওকে ফেলে দেবে লেকের মাঝখানে। ডুবিয়ে মারবে। ভয় পেল হ্যাল। তবে একই সাথে উল্লাস বোধও করছে। কারণ মূর্তিমান আতঙ্ক বানরটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। তার যা হবার হবে, কিন্তু শয়তানটা ডেনিশ বা পেটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না। দূর হয়েছে হারামজাদা। এতক্ষণে ক্রিস্টাল লেকের পাতালে পৌঁছে গেছে। দূর হয়েছে চিরদিনের জন্যে।

বৈঠা বাইছে হ্যাল। আবার কাঠ ফাটার শব্দ। নৌকায় তিন ইঞ্চি পানি জমে গেছে। হঠাৎ খুবই জোরে একটা শব্দ হলো। সাথে সাথে একটা সিট ভেঙে

দু'টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় হ্যাল। বৈঠা বেয়ে যেতে লাগল সে। তাকে তীরে পৌঁছুতেই হবে। মুখ হাঁ করে শ্বাস করছে। ঘামে ভেজা চুল বাতাসে উড়ছে।

এবার ঠিক নৌকার তলা থেকে কড়াৎ করে শব্দ হলো। আঁকাবাঁকা ফাটল সৃষ্টি হলো ওখানে। বেগে পানি ঢুকল নৌকায়। নিমিষে ডুবিয়ে দিল হ্যালের গোড়ালি। তারপর হাঁটুর নিচের অংশ। হ্যাল বৈঠা বাইছে তো বাইছেই। তবে গতি আগের চেয়ে মন্থর।

আরেকটা তক্তা আলগা হয়ে গেল। নৌকার ফাটল দ্রুত বেড়েই চলেছে। সেই সাথে হড়হড় করে ঢুকছে পানি। ইতিমধ্যে একটা বৈঠা হারিয়ে ফেলেছে হ্যাল। দাঁড়িয়ে পড়েছে ও। নৌকাটা প্রবলভাবে এপাশ-ওপাশ দুলছে। ধাক্কার চোটে সিটের মধ্যে ধপ করে পড়ে গেল হ্যাল।

একটু পরে বসার আসনটাও ভেঙে গেল। চিৎ হয়ে পানিতে পড়ে গেল হ্যাল। ঠাণ্ডা পানিতে শির শির করে উঠল গা। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করল। প্রার্থনা করল পেটি যেন না দেখে তার বাপ তার চোখের সামনে ডুবে মরছে।

এক মুহূর্ত পরে প্রচণ্ড আরেকটা ঢেউ দু'টুকরো করে ফেলল নৌকাটাকে। ছিটকে লেকে পড়ে গেল হ্যাল। প্রাণপণে তীর লক্ষ্য করে সাঁতার কাটতে শুরু করল। এত জোরে জীবনে সাঁতার কাটেনি হ্যাল। মিনিট খানেক পরে কোমর সমান পানিতে চলে এল সে। তীর থেকে মাত্র পাঁচ গজ দূরে।

পেটি ছুটে গেল বাবার কাছে। কাঁদছে, চিৎকার করছে, হাসছে। হ্যাল এগোল ছেলের দিকে। হঠাৎ একটা ঢেউ এসে ওকে চুবুনি দিয়ে গেল। চুবুনি খেল পেটিও। একমুহূর্ত পরে মিলন ঘটল বাপ-ছেলের। পরস্পরকে ধরে ফেলল ওরা।

বেদম হাঁপাচ্ছে হ্যাল, বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছে ছেলেকে। পেটিও হাঁপাচ্ছে।

'বাবা? ওটা সত্যি দূর হয়েছে? বানরটা?'

'হ্যাঁ। দূর হয়েছে।'

'নৌকাটাকে দেখলাম টুকরো হয়ে যেতে...ঠিক তোমার পাশে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল...।'

লেকের দিকে তাকাল হ্যাল। তক্তাগুলো ভাসছে পানিতে। আশ্চর্য, লেকের পানিতে ঢেউয়ের উন্মত্ততা থেমে গেছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল হ্যাল। আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সাদা মেঘ। কালো মেঘের চিহ্নও নেই কোথাও।

'তুমি মেঘ দেখেছিলে?' ফিসফিস করল পেটি। 'কি ভয়ানক কালো মেঘ। চোখের নিমিষে আকাশ ছেয়ে ফেলল। আমি তোমাকে ফিরে আসার জন্য কত ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু তুমি শুনলেই না'। কান্নায় গলা বুজে এল পেটির।

'এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, সোনা।' ওকে জড়িয়ে ধরিয়ে থাকল হ্যাল। 'আর ভয় নেই।'

'তোমার খুব সাহস, বাবা।' হ্যালের দিকে তাকাল পেটি।

'তাই?' মুচকি হাসল হ্যাল। 'যা, বোট হাউসে তোয়ালে আছে। গা মুছে নে।'

'আমরা ঘটনাটা মাকে বলব না, বাবা?'

হাসল হ্যাল। 'জানি না, বাপ। ও নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন চল।'

ছেলেকে নিয়ে বোট হাউসের দিকে পা বাড়াল হ্যাল।

ব্রিজটন নিউজ থেকে ২৪ অক্টোবর, ১৯৮০

মরা মাছ রহস্য

গত হপ্তায় কাসকোর ক্রিস্টাল লেকে হঠাৎ শতশত মাছ পেট ফুলে মরে ভেসে উঠতে দেখা যায়। প্রায় সব ধরনের মাছই মরে ভেসে উঠেছে। মৎস্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, হঠাৎ মাছ কেন মরে ভেসে উঠল সেটার কারণ তাদের অজানা। তবে কর্তৃপক্ষ জেলে এবং মহিলাদের নিষেধ করেছেন ক্রিস্টাল লেকের মাছ আপাতত না ধরতে। মরা মাছ রহস্য উদ্‌ঘাটনের তদন্ত চলছে…

[মূল: স্টিফেন কিং-এর 'দ্য মাঙ্কি']

মুখোশের আড়ালে

একাকীত্ব যেন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গিলতে আসে রবিনকে। ক্লাসমেটদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় ও। কিন্তু গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছেলেগুলো যেন কেমন! মিশতেই চায় না রবিনের সঙ্গে। ওকে বহিরাগতদের মত দেখে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। ওকে খেলতে ডাকে না, কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে না। একরকম একঘরেই করে রেখেছে ওরা রবিনকে।

কিন্তু রবিনের দোষ কী? রবিন তো নিজের কোন ক্রটি খুঁজে পায় না। ও সবার সাথে মিশতে চায়, বন্ধু হতে চায়। ক্লাসমেটরা দূরে দূরে সরে থাকলে ওর কী করার আছে? রবিন ভেবেছিল অন্তত আজকের দিনটা ওরা ওকে কাছে ডেকে নেবে। আজ বিশেষ একটি দিন। হ্যালোউইন ডে। আজ নানা ভূতুড়ে মুখোশ পরে মজা করবে রবিনের ক্লাসমেটরা–জনি, রিন্টু, লিটন, আবিদ, জেসি সবাই। ওদের আনন্দের ভাগীদার হতে চেয়েছিল রবিন। আগ্রহ নিয়ে জানতে চেয়েছিল দলটার সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কিনা। দেখি' বলে ওকে পাশ কাটিয়ে গেছে জনি। জেসি শুধু মুচকি হেসেছে। আবিদ তো মুখের ওপর না-ই বলে দিল। আর লিটন খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠেছে, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না তো!'

ভীষণ অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে রবিনকে। মন খারাপ করে বাড়ির রাস্তা ধরেছে। স্কুল থেকে খুব বেশি দূরে নয় বাসা। হেঁটেই যাওয়া যায়। ঢাকায় নতুন এসেছে রবিনরা। এর আগে খুলনা ছিল। ওর বাবা-মা সরকারী চাকুরে। দু'জনেই বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। তবে বাবা বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে পছন্দ করেন না। ফলে প্রায় প্রতি বছরই স্কুল বদলাতে হয় রবিনকে। ওর প্রথম প্রথম খারাপ লাগত। এখন লাগে না। বরং নতুন জায়গা, নতুন মানুষ দেখতে ভালই লাগে। বাবা-মা তেল, জল, উদ্ভিদ, প্রাণীদের স্যাম্পল ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন। বর্তমানে এ সবেরই কিছু একটা নিয়ে গবেষণা করছেন ওঁরা। তবে রবিন ঠিক জানে না। বাবা-মা'র কাজে ওর নাক গলানো কঠোরভাবে নিষেধ।

নতুন স্কুলের ছেলেমেয়েগুলো এত বাজে হবে জানত না রবিন। জানলে এ স্কুলে ভর্তি হত না। বাবা-মা ঢাকা থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেলেই ভাল। এরকম পচা সহপাঠীদের সঙ্গে বেশিদিন সহাবস্থান করতে পারবে না রবিন। রবিনের মুখ শুকনো দেখে মা জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে রে?' মা পেছনের ঘরে কাজ করছিলেন। হাতে মাটি লেগে আছে। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বললেন, 'তোর চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'আজ হ্যালোউইন ডে, মা,' গুঙিয়ে উঠল রবিন, ধপ করে বসে পড়ল একটা সোফায়। 'স্কুলের সবাই হ্যালোউইন ডে পালন করবে ঠিক করেছে। আমি ওদের সাথে যোগ দিতে চাইলাম। কেউ আমাকে নিল না। তাছাড়া হ্যালোউইন ডে-তে পরার মত কোন ড্রেসও আমার নেই।'

'হ্যালোউইন ডে-র মজা হয় রাতে,' সান্ত্বনার সুরে বললেন মা। 'হাতে ঢের সময় আছে। তোকে একটা ড্রেস বানিয়ে দেব'খন।'

রবিনের বাবা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, রাবারের গ্লাভ পরা হাতে একটা গাছ। 'হ্যালোউইন ডে তো পালন করে আমেরিকা-ইউরোপের ছেলেমেয়েরা। তোদের স্কুলেও এসব পালন করা হয় নাকি?'

'আমাদের স্কুলে হয় শুনেছি,' মুখ গোমড়া হয়ে আছে রবিনের। 'টিভিতে দেখেছি হ্যালোউইন নাইটে অনেক মজা হয়। নানা রকম ভূতুড়ে মুখোশ পরে সবাই···'

'তোর স্কুলের ছেলেমেয়েরা কে কী পরবে?' জিজ্ঞেস করলেন মা।

'ওরা বলল সবাই নাকি চুলে রঙ করাবে, তারপর মুখোশ পরবে, মুখে থাকবে বড় বড় দাঁত। তবে সবাই একই রকম সাজবে। আমি অন্যরকম সাজতে চাই।'

হঠাৎ হেসে উঠলেন বাবা। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' বললেন তিনি। 'তুই প্রতিদিন যেভাবে স্কুলে যাস, আজ রাতে সেভাবে যাস না কেন? স্বাভাবিক পোশাকে?'

'দারুণ বুদ্ধি,' বাবাকে তারিফ করলেন মা। 'সবাই ডাইনী বা ভূত সেজে আসবে। আর তুই যাবি স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে। বেশ মজা হবে।'

'মোটেই মজা হবে না,' গোমড়া মুখে আরও আঁধার ঘনাল রবিনের। 'ওরা ভাববে হ্যালোউইন ডে-তে পরার মত কোন ড্রেসই আমার নেই। আমি ফকির।'

'আরে, ওরা তো সবাই সেই পুরানো সাজেই সাজবে,' ওকে উৎসাহ দিতে চাইলেন বাবা। 'একমাত্র তুইই কোন ড্রেস পরবি না। তোর সাজটা হবে সবার থেকে আলাদা। দেখবি সবাই কেমন বেকুব বনে গেছে।'

মনে মনে কী যেন ভাবল রবিন। তারপর হাসি ফুটল ওর মুখে। 'কথাটা মন্দ বলোনি, বাবা। আমাকে সাধারণ পোশাকে দেখে ওরা বেকুব বনেও যেতে পারে। আর আমাকে দেখে বোকা না বনলে বুঝব ব্যাপারটা ওদের মাথাতেই ঢোকেনি।'

'এই তো ব্যাটা ছেলের মত কথা!' সাবাস দিলেন বাপ তার সন্তানকে। রবিন তক্ষুণি স্কুল ব্যাগ নিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে। মা এলেন পিছু পিছু। বললেন, 'শুনেছি, তোর সহপাঠীগুলো তেমন ভাল না। তাই একটু সাবধানে থাকিস। ওরা যদি তোকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও করে কিছু বলিস না যেন।'

'কিছু বলব না, মা,' মাকে আশ্বস্ত করে রবিন। দাঁড়ায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে। চুল আঁচড়াতে থাকে।

সন্ধ্যার পরপর বেরিয়ে পড়ল রবিন। এদিকটা এমনিতেই নির্জন, সন্ধ্যার পরে লোক চলাচল আরও কমে যায়। রাস্তার সোডিয়াম বাতির মরাটে আলোয় কেমন ভূতুড়ে লাগে চারপাশ। নির্জনতা যেন ছেঁকে ধরে রবিনকে। ভয় ভয় লাগে। ও দ্রুত পা চালায় স্কুলের দিকে। ওখানেই পালন করা হবে হ্যালোউইন নাইট।

বড় রাস্তার মোড়ের ধারে চলে এসেছে রবিন, এমন সময় দেখতে পেল দলটাকে। রাস্তার পাশের একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। পিশাচদের একটা দল। ভূত, প্রেত, ভ্যাম্পায়ার সবাই আছে সেই দলে। ওদের সঙ্গে যোগ

দেয়ার আশায় দ্রুত পা চালাল রবিন।

রবিনকে দেখে ফেলল ওরা। 'ওটা কেরে?' ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মুখোশ পরা একজনের ফ্যাঁসফেঁসে গলা শোনা গেল।

কঙ্কাল সাজা একজন রবিনের পাঁজরে গুঁতো দিল আঙুল দিয়ে। 'তোমাকে তো কেউ আসতে বলেনি।'

জিন্দালাশের মুখোশ পরা আরেকজন লম্বা নখ বাগিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রবিনের ওপর। 'বু!' বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল সে।

ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল রবিন, হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা ঝোপের ওপর। হা হা করে হেসে উঠল সবাই। তারপর হাঁটা দিল।

'কে রে ছেলেটা?' বড় রাস্তায় উঠে পড়েছে ওরা, একজনের গলা শুনতে পেল রবিন।

'স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছে,' জবাব দিল ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। 'রবিন না কি যেন নাম।'

হাঁচড়েপাঁচড়ে ঝোপ থেকে উঠে পড়ল রবিন। গা চুলকোচ্ছে। দু'এক জায়গায় ছড়েও গেছে। দুঃখে-অপমানে জল এসে গেছে চোখে। একবার চিন্তা করল বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু বাবা-মা ওর এই দশা দেখলে কষ্ট পাবেন ভেবে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। না, সিদ্ধান্ত নিল রবিন। সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র আমি নই। সে আবার হাঁটতে শুরু করল স্কুলের উদ্দেশে।

যাবার পথে একটা বাড়ির বাগানে একটা নেকড়ে মানব, দু'জন ফুটবল খেলোয়াড় আর এক এক-চোখা দানবকে লাফালাফি করতে দেখল রবিন। খুব মজা করছে ওরা। ওদের হাতের ব্যাগগুলো ফুলো ফুলো। বোঝা যায়, উপহারে ভর্তি। ওদেরকে ডাক দেবে রবিন, এমন সময় একজন চিনে ফেলল ওকে। হেঁকে বলল, 'ওই দ্যাখ রবিন।...কী ব্যাপার রবিন? তোমার হ্যালোউইন ড্রেস কোথায়?'

'ওর বোধহয় হ্যালোউইন ড্রেস কেনার পয়সা নেই,' মন্তব্য করল আরেকজন। শুনে অন্যরা হেসে উঠল হো হো করে। রবিনের লাগল খুব। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। মুখ নিচু করে চলে এল ওখান থেকে।

আবার হাঁটতে শুরু করেছে রবিন। ভাবছে লোকের বাড়িতে কড়া নেড়ে 'ঘাউ' করে চিৎকার করে তাদেরকে চমকে দিলে কেমন হয়? কিন্তু সবাই কি জানে আজ হ্যালোউইন ডে? দেখি না একবার চেষ্টা করে। ভাবল রবিন। সে একটা বাড়ির কলিংবেল টিপল। দরজা খুলে দিলেন এক বয়সী ভদ্রলোক। তিনি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন রবিনের দিকে। রবিন কিছু বলতে যাবার আগেই ভদ্রলোকের পেছন থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটা ছেলে। রাক্ষস সেজেছে সে। রবিনকে দেখে নখ বাঁকিয়ে 'হাউ মাউ খাউ' বলে উঠল। রবিন ওকে দেখে হাসল। ছেলেটা ভদ্রলোকের দিকে টলটলে দুই চোখ মেলে তাকিয়ে বলল, 'বাবা, ওকি জানে না আজ হ্যালোউইন ডে?'

'জানি তো,' হাসিমুখে বলল রবিন। 'আমি—'

'না। তুমি জানো না।' প্রতিবাদ করল বাচ্চা। 'তোমার হ্যালোউইন ড্রেস কই? তোমার মুখে মুখোশও নেই।'

'আহ্, এভাবে বলে না, রন্টি,' বললেন ভদ্রলোক। রবিনকে একটা ক্যান্ডি বার ধরিয়ে দিলেন, 'রন্টির কথায় কিছু মনে কোরো না, কেমন?' আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে রইল রবিন। শুনল বাচ্চাটা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, 'ওর মুখোশ নেই কেন, আব্বু?'

'মুখোশ কেনার পয়সা নেই বোধহয় ছেলেটার,' জবাব দিলেন রন্টির বাবা। 'আর সবাই তো তোমার মত হ্যালোউইন ডে বলে অস্থির হয়ে ওঠে না।'

আবার মন খারাপ হয়ে গেল রবিনের। ওর আসলে আজ বেরুনোই উচিত হয়নি। গুলশানের বড়লোকের ছেলেদের এসব মানায়। তারা সাড়ম্বরে হ্যালোউইন ডে পালন করে। তার মত মধ্যবিত্ত ছেলে হ্যালোউইন ডে পালন করার জন্য একেবারেই বেমানান। এ জন্যই জনিরা ওকে দলে নিতে চায়নি, এতক্ষণে বুঝতে পারছে রবিন। নাহ্, একদম বোকা বনে গেছে রবিন। আর কখনও সে এসব হ্যালোউইন ডে-ফে-তে অংশ নেবে না। স্কুল ব্যাগটার দিকে তাকাল রবিন। ওটা প্রায় খালি। শুনেছে হ্যালোউইন ডে-তে নানা জনে নানা উপহার দেয়। কিন্তু রবিন কোন উপহার পায়নি। বাবা-মাকে বড় মুখ করে বলে এসেছিল ব্যাগ ভর্তি উপহার নিয়ে বাড়ি ফিরবে। ওর খালি ব্যাগ দেখে বাবা-মা হয়তো কষ্টই পাবেন। ভাববেন, ছেলেটার সত্যি কোন বন্ধু নেই।

পকেট হাতড়ে পঞ্চাশটা টাকা পেল রবিন। এ দিয়ে কিছু চকলেট কিনবে সে। অন্তত বাবা-মাকে দেখানো যাবে চকলেট উপহার পেয়েছে।

গুলশান গোল চক্করের দিকে পা বাড়িয়েছে রবিন, এমন সময় কে যেন উঁচু গলায় ওর নাম ধরে ডাকল। 'এই যে, রবিন। হ্যালোউইন ডে-তে এমন দশা কেন তোমার?'

ঘুরল রবিন। অন্ধকার মোড় থেকে বেরিয়ে এল ওরা, খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে।

'আমি ওর রক্ত খাবোওওও!' বলল ড্রাকুলার মুখোশ পরা একজন।

একটা মেয়ে পাউডার মেখে মুখটাকে ফ্যাকাসে করে রেখেছে, চোখের নিচে কালো, মোটা দাগ। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। সে খিকখিক হাসল। 'আমি ড্রাকুলার বউ। তুমি কে হে? বখাটে?'

'বখাটেই বটে,' বলল এক জলদস্যু। তার এক চোখে কালো তাপ্পি, হাতে নকল বড়শি, কোমরের বেল্টে কার্ডবোর্ডের তরবারি গুঁজে রাখা। 'দেখি তো ওর ব্যাগে কী ধন সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে।' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল সে। খপ করে চেপে ধরল রবিনের ব্যাগ।

'আমাকে ছেড়ে দাও!' হিসিয়ে উঠল রবিন, টান মেরে ছাড়িয়ে নিল ব্যাগ।

'লংজন সিলভার যা চাইছে ভালয় ভালয় ওকে তা দিয়ে দাও,' বলল একটা ছেলে। তার মাথায় রাবারের ছোরা গাঁথা, সারামুখে নকল রক্ত। 'দিয়ে দাও বলছি। নইলে আমার মত দশা হবে তোমারও।'

দলটা বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে রবিনকে। হাসছে, তামাশা করছে ওকে নিয়ে। জলদস্যু লংজন সিলভার কার্ডবোর্ডের তরবারি দিয়ে খোঁচাতে শুরু করল রবিনকে।

ড্রাকুলা নকল দাঁত নিয়ে মুখ খিঁচাচ্ছে। রবিনের শরীর ঘামতে লাগল, অপমানে জ্বালা ধরে গেছে গায়ে। ছেলেগুলোকে চিনতে পেরেছে ও। জনি সেজেছে ড্রাকুলা, জেসি হয়েছে ড্রাকুলার বউ। আবিদ জলদস্যু আর লিটন মাথায় নকল ছুরি গেঁথে রেখেছে। এদেরকেই সকালে রবিন অনুরোধ করেছিল ওদের দলে নেয়ার জন্যে।

'তুমি এমন সাধারণ বেশে রাস্তায় বেরুলে কেন, বোকা?' হাসতে হাসতে বলল জনি।

জলদস্যু আবিদ রবিনের কাঁধে ধাক্কা দিল। 'ঘটনা কী, রবিন খোকা? তোমার কি কোন বন্ধু নেই?'

বুকের ভেতর ব্যথা হচ্ছে রবিনের। সত্যি তো ওর কোন বন্ধু নেই। ওদের দিকে একবার তাকাল সে। তারপর মুখ নিচু করল।

'কী ব্যাপার, জবাব দিচ্ছ না কেন?' বলল আবিদ।

'অ্যাই, চলে এসো তোমরা,' বলল জেসি, ওর চক সাদা মুখখানায় সহানুভূতির ছাপ। 'এভাবে ওকে আর অপমান কোরো না।'

'একটা মুখোশ কিনতে পারো না!' বিস্ময় প্রকাশ করল আবিদ। 'এতই ফকির তুমি।'

'ওর মা তার বখাটে ছেলের জন্য কোন ড্রেস বানিয়ে দিতে পারেনি,' কপালের ছুরিটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল, ওটা সামলাতে সামলাতে বলল লিটন।

'আমার মা ঠিকই ড্রেস বানিয়ে দিয়েছে,' গর্জে উঠল রবিন। 'তোমরা অন্ধ। তাই চোখে দেখতে পাও না।'

'আহ্-ওহ্,' বিদ্রূপ করল জনি। 'বেচারী রবিন পাগল হয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি কী সাজতে চেয়েছ?' আবিদ তরবারি দিয়ে আরেকটা খোঁচা দিল রবিনকে।

'এমন কিছু যা কেউ কখনও কল্পনাও করেনি,' বলল রবিন। 'আমার বাবার আইডিয়া ওটা।'

'আইডিয়াটা কী, শুনি?' জানতে চাইল আবিদ। 'তোমাকে তো সেই আগের মতই বোকা বোকা টাইপের লাগছে।'

'আইডিয়াটা হলো,' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রবিন। 'সাধারণ বেশে বেরিয়ে পড়া।'

'ফু!' হেসে উঠল জনি। 'সাধারণ বেশে বেরিয়ে পড়া। এটা একটা আইডিয়া হলো?'

'হেই,' বলল জেসি, 'তোমার মা না একটা ড্রেস বানিয়ে দিয়েছে বললে। ওটা পরে আসোনি কেন?'

'আমার মা–' বলতে গেল রবিন।

কথা শেষ করার আগেই ওর হাত থেকে জলদস্যু আবিদ ছিনিয়ে নিল ব্যাগটা।

'আমার ব্যাগ ফিরিয়ে দাও,' রেগে গেল রবিন। 'ফিরিয়ে দাও বলছি। নইলে কিন্তু–'

'নইলে কী?' মুখ ভেংচাল আবিদ। 'বাবা-মা'র কাছে গিয়ে নালিশ করবে?'

'হ্যাঁ, তাই করব,' ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। 'আমার বাবা-

মা'র অনেক ক্ষমতা। তাঁরা তোমার বারোটা বাজিয়ে দেবেন।'

'তাই নাকি?' হা হা করে হেসে উঠল আবিদ। 'কী রকম বারোটা বাজাবেন, শুনি?'

'সাবধান! সাবধান!' মুখ টুখ ভেংচে বিচিত্র একটা ভঙ্গি করল জনি। 'আমি খুউউব ভয় পাচ্ছি। রবিনের বাবা-মা কিন্তু খুব শক্তিশালী। তা কোথায় কাজ করেন তাঁরা?'

'শাক্কুরা গ্রহে।' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'শাক্কুরা গ্রহ? সেটা আবার কোথায়।' হেসে উঠল জেসি।

'গ্রহটার নাম শাক্কুরা নাকি শুক্র?' মুখ বাঁকাল জনি।

'গ্রহের নামও ঠিক মত বলতে পারো না। অথচ গপ্পো মারতে এসেছ।'

আগুন চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। এত রেগে গেছে যে কথা ফুটছে না মুখে।

জনি বলল, 'তা তোমার গ্রহের গল্প একটু বলো না শুনি। শুনে ধন্য হই আমরা। জ্ঞান বাড়ুক আমাদের।'

'তোমরা খুবই বোকা,' গনগনে গলায় বলল রবিন। 'তোমরা আসলে-'

'আমরা আসলে কী, অ্যাঁ?' বোকা বলায় রেগে গেছে জনি। ঘুসি মারল সে রবিনের বুকে। ঘুসি খেয়ে আবিদের গায়ে পড়ে গেল রবিন। আবিদ ওকে ধাক্কা মারল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রবিন। তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে।

'তোমার শাক্কুরা না ফাক্কুরা গ্রহের গল্প শোনালে না?' হাসি মুখে বলল জনি। 'তোমার বাবা-মা'র গল্প? কী করেন তাঁরা?'

'তাঁরা বিজ্ঞানী,' চিৎকার করে বলল রবিন। 'তাঁদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে দেখতে, পৃথিবী দখল করে নেয়া যায় কিনা। আমার বাবা-মা'র মত ভাল বাবা-মা গোটা ব্রহ্মাণ্ডে আর একটিও নেই। ওঁরা আমার জন্য সব কিছু করেন। আমার মা আমার জন্যে একটা মুখোশ বানিয়ে দিয়েছেন। সেই মুখোশ পরে আমি প্রতিদিন স্কুলে যাই। সেই মুখোশই আমি এখনও পরে আছি। এটা সাধারণ একটা ছেলের মুখোশ। তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো তাহলে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

হাসল জনি, 'তোমার মাথা আসলেই ঠিক নেই, খোকা। তুমি-'

গলা থেকে আর স্বর বেরুল না ওর। মুখ থেকে হাসি মুছে গেল বেমালুম, সেখানে ফুটে উঠল নির্জলা ভয় আর আতঙ্ক। রবিনকে দেখছে ও। রবিন মুখোশ খুলে ফেলছে-সাধারণ ছেলের মুখোশ।

চিৎকার করে উঠল জেসি।

আঁতকে উঠল লিটন।

মুখ হাঁ হয়ে গেল আবিদের।

সবাই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে রবিনের দিকে। রবিনের হাতে মানুষের মুখের মুখোশ...ওর আসল মুখটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সকলে। মুখটা মাছের আঁশের মত আঁশ দিয়ে ঢাকা, শ্বাপদের মত হলুদ চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। রাগে ফেটে পড়ছে।

রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল ওদের চারজনের সম্মিলিত ভয়ার্ত চিৎকারে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে ওরা ছুটল যে যার বাড়ির উদ্দেশে। আর ভয়ঙ্কর মুখটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওদের গমন পথের দিকে।

বাড়ি ফেরার পথে মানুষের মুখোশটা আবার পরে নিল রবিন। ঘরে ঢোকামাত্র বাবা-মা বুঝে ফেললেন কিছু একটা ঘটিয়ে এসেছে তাঁদের ছেলে।

'কোন সমস্যা?' জানতে চাইলেন বাবা।

'বিরাট সমস্যা, বাবা।' বলল রবিন।

মা ছেলের কাঁধে একটা হাত রাখলেন। 'কী হয়েছে বল তো, বাপ।'

চেয়ারে বসল রবিন। 'ছেলেগুলো এত খারাপ!' হাঁপাচ্ছে ও। 'আমার সাথে শুধু শুধু ইয়ার্কি মারছিল, ধাক্কা দিচ্ছিল। শেষে আমি আর সইতে না পেরে–'

'ওহ্, রবিন। না!' আঁতকে উঠলেন মা। 'তুই নিশ্চয়ই–'

'দুঃখিত, মা,' কেঁদে ফেলল রবিন। 'আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল।'

'ওরা তাহলে তোর পরিচয় জেনে গেছে?' গম্ভীর গলায় বললেন বাবা। 'আমাদের কথাও বলে দিয়েছিস?'

কাঁদতে কাঁদতে মাথা দোলাল রবিন।

'তাহলে আর কি,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মা। 'এখানকার পাততাড়ি আবার গোটাতে হবে।'

'সবকিছু গুবলেট করে ফেলেছি আমি,' অপরাধীর গলায় বলল রবিন। 'সব আমারই দোষ। আমি–'

হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ হলো বাসার সামনে। কথা শেষ করতে পারল না রবিন। দ্রুত জানালার সামনে গিয়ে পর্দা উঁচিয়ে দেখল।

'পুলিশ!' আর্তনাদ করে উঠল রবিন। 'ছেলেগুলো নিশ্চয়ই আমার কথা বলে দিয়েছে পুলিশকে।'

'শান্ত হও।' বললেন ওর বাবা। জানালার সামনে গিয়ে উঁকি দিলেন।

'ওরা এদিকেই আসছে!' কাঁপা গলায় বলল রবিন। 'দু'জন!'

রবিনের কাঁধের ওপর থেকে স্ত্রীর দিকে তাকালেন বাবা। 'প্রাণীদের স্যাম্পল কেমন জোগাড় হয়েছে।'

'মন্দ না,' জবাব দিলেন রবিনের মা। 'তবে মানুষ স্যাম্পল জোগাড় করতে পারলে আরও ভাল হয়।' দরজায় সজোরে কড়া নড়ে উঠল।

'বেশ।' বললেন রবিনের বাবা। 'শহর ছাড়ার আগে এক জোড়া মানুষ নিয়ে যাব আমরা শাক্কুরায় স্যাম্পল হিসেবে।'

'বুদ্ধি খারাপ না,' হাসলেন রবিনের মা।

রবিনের বাবা খুলে দিলেন দরজা। 'গুড ইভনিং, অফিসার।' বললেন তিনি। 'কোন সমস্যা?'

'একটা অদ্ভুত ফোন পেয়ে এসেছি আমরা,' বলতে লাগল মোটা পুলিশ অফিসার। 'এখানে একটা ছেলে থাকে। সে নাকি ভিনগ্রহের দানব।'

'আমার ধারণা, এটা হ্যালোউইন নাইটের কোন ঠাট্টা,' বলল অপরজন। 'তবু

আমাদের একবার চেক করে দেখতে হবে।'

'অবশ্যই,' খুশি খুশি গলায় বললেন রবিনের বাবা। 'ভেতরে আসুন আপনারা, অনুগ্রহ করে চলে আসুন।'

পুলিশ দু'জন ভেতরে পা বাড়াল। তারা জানে না তাদের ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে!

[ডন উলফসনের 'দ্য ফ্রাইট মাস্ক' অবলম্বনে]

ঘুড়ি

মঙ্গলবার বড়দিন বলে আমি ঘুমাতে গেলাম দেরীতে, 'বাটাভিয়া মেডিকেল জার্নাল'-এর জন্য একটি লেখা তৈরি করলাম দুপুর পর্যন্ত, তারপর গেলাম জাহাজঘাট। সিঙ্গাপুরে যাওয়ার জন্য জাহাজের টিকেট কাটতে। সামারিন্ডায় কম দিন তো কাটালাম না। পুরো ছয় বছর। এখন এই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি চিরতরে। অবশ্য এজন্য আমি মনে মনে খুশি।

কাজটাজ সেরে ফিরে এলাম বাড়িতে। বাঁধাছাঁদা শুরু করলাম। দুপুর দুটোর দিকে হঠাৎ কেন জানি একটা অদ্ভুত অস্থিরতা গ্রাস করল আমাকে। ঘড়িতে ঢংঢং করে দুটো বাজার শব্দ হলো, শব্দটা থেমে যেতেই ভয়ের শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাড়া বেয়ে।

হঠাৎ এই ভয় এবং অস্থিরতার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না আমি। আধিভৌতিক কোনও ব্যাপারেও আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি অহেতুক আমার ভেতরে এ ধরনের কোনও অনুভূতি কাজ করছে না। মনে হলো খুব শিগ্‌গিরই ভয়ঙ্কর কোনও ঘটনার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি আমি।

ঘণ্টাখানেক পর কর্লিনের কাছ থেকে একটি অদ্ভুত চিঠি পেলাম আমি। চিঠিটি নিয়ে এল এক ক্যান্টোনিজ ছোকরা। চিঠিতে লেখা:

প্রিয় ডাক্তার ভ্যান রুলার:

আপনি এলিসকে শেষ বার যখন দেখে গেলেন, বললেন জ্বর হয়েছে। সেই জ্বর এখন আরও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। সামারিন্ডা ছেড়ে যাওয়ার আগে অনুগ্রহ করে একটিবার যদি আমার বাড়িতে পদধূলি দেন, চিরকৃতজ্ঞ থাকব আমি।

আর একটি ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আসার পথে জঙ্গলের ওপর যদি কোনও ঘুড়ি উড়তে দেখেন, মনের ভুলেও ওটাকে মাটিতে নামানোর চেষ্টা করবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত
এডওয়ার্ড কর্লিন।

বারদুই চিঠিটি পড়লাম আমি। কর্লিনের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশি দিনের নয়। বছরখানেক আগে সে ব্রিটিশ নর্থ বোর্নিও থেকে এখানে আসে। ওখানে সে জঙ্গল রক্ষক হিসেবে কাজ করত। তার আগমনের কয়েকদিন পর অন্য আরেকটি স্টীমারে আসে তার স্ত্রী এলিস এবং কন্যা ফে।

কর্লিন সম্পর্কে লোকে নানা কথা বলে। গুজব আছে, জঙ্গল রক্ষকের চাকরি করার সময় ডায়াক আদিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সে তাদের সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। তার এই নিষ্ঠুরতার কারণে ব্রিটিশ সরকার তাকে চাকরিচ্যুত করে।

সামারিন্ডায় আসার কিছুদিনের মধ্যে কর্লিন মাহাকাস নদী থেকে কিছু দূরে,

একটি পুরানো রেস্ট হাউসে আস্তানা গাড়ে। পরে ওটাকেই সে নিজের বাড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। তার স্ত্রী এবং কন্যা তখন থেকে বাধ্য হয় জঙ্গলের ওই অনাত্মীয় পরিবেশে প্রায় একঘরে অবস্থায় জীবনযাপনে।

ক্যান্টোনিজ ছেলেটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আমার ইচ্ছে করল সরাসরি বলি যে যাব না। সত্যি বলতে কি কর্লিনকে আমি খুব একটা পছন্দ করি না। কিন্তু চিঠিতে ঘুড়ির ব্যাপারটা আমাকে আগ্রহী করে তুলল। তাই ছোকরাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাংচো, তোদের গ্রামের ডায়াকরা কি ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব শুরু করেছে?'

মাথা নাড়ল সে।

'তাহলে কি মালয়রা ওড়াচ্ছে?'

'ওখানে কোনও মালয় নেই। মাত্র একটি ডায়াক গ্রাম আছে। আপনি যাবেন?'

আমি একটু ইতস্তত করলাম। তারপর বললাম, 'হ্যাঁ, যাব। তোর মাঝিমাল্লাকে সাম্পান নিয়ে রেডি থাকতে বল। আমি আধঘণ্টার মধ্যে জেটিতে আসছি।'

আমি এমনিতে সাম্পানে চড়ে কোথাও গেলে খড়ে ছাওয়া কেবিনের ছায়ায় বসে পাইপ খেতে খেতে যাই। কিন্তু আজ টেনশনের জন্যই বোধহয় সূর্যের প্রখর তাপ অগ্রাহ্য করে গলুইতে বসে তীরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম।

ঘণ্টা দুই কেটে গেল কোনও ঘটনা ছাড়াই। তারপর, কর্লিনের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেছি, নদীর শেষ মোড় ঘোরার সময় কাংচো আঙুল তুলে আকাশ দেখাল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'দেখছেন? ঘুড়ি, বড় ঘুড়ি।'

নদীর বুকে বসে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ঘুড়িটিকে। তবে অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। ঘুড়িটি বেশ বড়, দুটুকরো বাঁশ আর লাল রাইস পেপার দিয়ে সুন্দর করে ওটাকে তৈরি করা হয়েছে, লেজটা লম্বা, রূপকথার ড্রাগনের কথা মনে করিয়ে দিল।

হঠাৎই জিনিসটা চোখে ধরা পড়ল আমার। যে সুতোতে বেঁধে ঘুড়িটি উড়ছে, ওটা গ্রামবাসীদের তৈরি পাটের দড়ি কিংবা সুতো নয়, তার। তামার তার! সূর্যের আলোতে সোনার মত ঝকমক করে উঠল তারটি। ক্রমশ নিচু হতে হতে একসময় জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'তীরে, কাংচো,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'জলদি তীরে ভেড়াও সাম্পান।'

কয়েক মিনিট পর ঘন জঙ্গল আর পোকামাকড় অগ্রাহ্য করে ছুটতে শুরু করলাম আমি সামনের দিকে। একটি বড় পালাপাক গাছের মাথায় আটকে আছে তারটি।

কাছে পিঠে কোনও মানুষজন চোখে পড়ল না আমার। অবাক হলাম ভেবে তাহলে ঘুড়িটি কে ওড়াচ্ছিল? ঘুড়িটি কোনও আদিবাসীর তৈরি, কিন্তু ওই তামার তারের সঙ্গে কোনও শ্বেতাঙ্গের সম্পর্ক আছে, ধারণা করলাম আমি।

চিন্তান্বিত মুখে ফিরে চললাম আবার সাম্পানে। মিনিট দশেক পরে কর্লিনের জেটিতে মাঝিরা সাম্পান বাঁধল। কাংচো আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল কর্লিনের বাড়িতে।

কর্লিন দরজায় দাঁড়িয়েছিল। আমার সাথে হাত মিলিয়ে ঢুকল ভেতর ঘরে।

'আপনি এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি, ডাক্তার,' বলল সে। 'আপনার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে চিন্তায় মরে যাচ্ছিলাম আসবেন কি আসবেন না ভেবে। এলিস পেছনের ঘরে আছে। আমার মেয়ে ফে তার সেবা করছে।'

'রোগীর অবস্থা এখন কেমন?' জানতে চাইলাম আমি।

'ভাল না,' বলল কর্লিন। 'কুইনাইন খাওয়াচ্ছি ওকে যেভাবে আপনি বলেছেন। কিন্তু জ্বরের জন্য সে এত অসুস্থ হয়ে পড়েনি। আচ্ছা ডাক্তার, আসার সময় কোনও ঘুড়ি চোখে পড়েছে আপনার?'

আমি লোকটার দিকে কড়া চোখে তাকালাম। কর্লিনের মুখটা বাজপাখির মত, চোখদুটো শুয়োরের চোখের মত কুঁতকুঁতে। ওর মুখে, হাতে পোকামাকড়ের অসংখ্য কামড়ের দাগ। এসব গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। ওর চেহারায় প্রচণ্ড অস্থির একটা ভাব। আমার কঠিন দৃষ্টি দেখে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারচে' আপনি বরং আমার স্ত্রীকে একবার দেখুন।' পেছনের একটি ঘরে নিয়ে গেল সে আমাকে।

ঘরটি ছোট। একটি মাত্র বিছানা ঘরে। জানালার শাটার অর্ধেক নামানো। অসুস্থ মানুষের গায়ের গন্ধ প্রকটভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরটিতে। কর্লিনের স্ত্রী মরার মত পড়ে আছে বিছানায়। তার পাশের চেয়ারে বসে আছে তার মেয়ে, ফে।

আমি মহিলার হাতের নাড়ি পরীক্ষা করতে লাগলাম, তাপমাত্রা দেখলাম। হৃৎস্পন্দন দ্রুত। কিন্তু থার্মোমিটারে দেখলাম স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে।

কর্লিন হঠাৎ এসে ঢুকল ভেতরে, আমাকে টেনে নিয়ে গেল জানালার কাছে। আঙুল তুলল আকাশের দিকে। 'দেখুন!' ভাঙা গলায় বলল সে। 'দেখতে পাচ্ছেন?'

দেখলাম। সেই ঘুড়িটি। আগের মত উঁচুতে আকাশে উড়ছে, কিন্তু বাতাস কাছিয়ে আনছে ওটাকে দ্রুত। লাল রাইস পেপার নীল আকাশের বুকে ক্ষতচিহ্নের মত দগদগে হয়ে ফুটে আছে।

'দেখলাম,' বললাম আমি। 'একটা ঘুড়ি। কিন্তু তাতে কি…?'

কর্লিন দ্রুত বাধা দিল, 'ঘুড়িটা দেখতে থাকুন ভ্যান রুলার। কথা বলবেন না, প্লীজ।'

আমি আবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইলাম। এবার বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল।

'ঘুড়িটা দেখতে দেখতে ওর নাড়ি পরীক্ষা করে দেখুন,' কর্কশ গলায় বলল কর্লিন। কাঁপা হাতে একটি সিগারেট ধরাল সে, হেলান দিয়ে দাঁড়াল দেয়ালের গায়ে।

আমি অনেকক্ষণ ধরে এলিসের নাড়ি পরীক্ষা করলাম, ঘুড়িটির দিকে চোখ রেখে। ড্রাগনের মত লেজ বাতাসে উড়ছে পতপত করে, নামতে নামতে ঘুড়িটি মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় এসে দাঁড়াল।

এলিসের ভয়ানক শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। হাঁপানি রোগীর মত শ্বাস টানতে শুরু করল সে। নাড়ির গতি ভয়ানক ক্ষীণ হয়ে এল।

আমি তাড়াতাড়ি একটি ক্যাপসুল খাইয়ে দিলাম এলিসকে। ধীরে ধীরে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল। বাইরে চেয়ে দেখি ঘুড়িটি ওপরে উঠতে শুরু করেছে, তাড়া

খাওয়া পাখির মত ওটা দিক বদলে চলে গেল।

সেন্ট্রাল রুমে এসে ঢুকলাম আমি। এক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে কর্লিনের মুখোমুখি বসলাম।

'কর্লিন,' কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'বোর্নিওতে আমি ছয় বছর ধরে আছি। অনেক অদ্ভুত এবং কঠিন রোগের চিকিৎসা করেছি। কিন্তু এমন ঘটনা আমার জীবনে এই প্রথম। এটা-এটা-গুড লর্ড, এ অসম্ভব!'

'তাহলে আমি মিথ্যে বলিনি, বলেন?' বলল কর্লিন। 'আপনি দেখেছেন?'

'আমি দেখেছি,' বললাম আমি। 'আর ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। আপনার স্ত্রীর শারীরিক সুস্থতা কোনও অদ্ভুত এবং অশুভভাবে ওই ঘুড়ির ওড়াউড়ির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঘুড়িটি যখন ওপরে উঠতে থাকে, তখন তার নাড়ির গতিও থাকে স্বাভাবিক।

কিন্তু যেই মুহূর্তে জিনিসটা মাটির দিকে নেমে আসতে শুরু করে। তার হৃৎস্পন্দন ধীর হয়ে আসে, মৃত্যু চলে আসে নিকটে। এই ব্যাপারটার শুরু কবে থেকে?'

'গতকাল দুপুর থেকে,' বলল কর্লিন। 'এলিস এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে বিছানায় শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমেই আমার মনে আসে ওই শয়তান ঘুড়িটাকে টেনে নামানোর, আমি কাজটা করতে গিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিলাম ওকে। ওই গাছে উঠে ওটাকে আস্তে আস্তে টেনে নামাতে শুরু করেছি, এই সময় ফে রিভলভারে গুলি ছুঁড়ে জানাল ওর মায়ের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। গাছ থেকে নেমে পড়ি আমি তৎক্ষণাৎ।

কর্লিন আমার দিকে ঝুঁকল। 'খোদার কসম, ডাক্তার। এ কিসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমরা?'

আমি জবাব না দিয়ে পাশের আরেকটি কামরার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভেতরে দেখলাম অনেকগুলো শেলফ, দেয়ালে থরে থরে সাজানো অদ্ভুত কিছু জিনিস।

'আপনার কালেকশন আমাকে দেখতে দিন,' বললাম, 'হয়তো এ থেকে কোনও ক্লু খুঁজে পাবো।'

কর্লিন তার কালেকশনের জন্য এই এলাকায় বেশ পরিচিত। বহু বছর ধরে সে এই কালেকশনের পেছনে লেগে আছে। সে মাথা ঘুরিয়ে ডাকল, 'কাংচো, এদিকে আয় শিগগির।'

ক্যান্টোনিজ ছেলেটি দৌড়ে এল কর্লিনের গলা শুনে, দ্রুত দরজা খুলল।

'কয়েকদিন আগে এক চোর ঢুকেছিল আমার ঘরে,' বলল কর্লিন। 'আমার জিনিসপত্র চুরি করতে চেয়েছিল হারামজাদা। আমি গুলিও করেছিলাম ব্যাটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মিস হয়েছে গুলি।'

কর্লিনের সংগ্রহের বেশিরভাগ জিনিস বোর্নিও থেকে সংগ্রহ করা। বেশকিছু জিনিস যেমন জাগ, সিলেবস। এসব চীন থেকে আনা। আমার চোখে পড়ল পরাং ব্রো পাইপ এবং কিছু মৃন্ময়পাত্র। তবে চোখ আটকে গেল কোণার দিকে একটি শেলফের ওপর। টকটকে লাল রঙের বিশাল একখণ্ড সিল্কের কাপড় রাখা ওখানে।

'সিল্কের এই কাপড় খণ্ড খাঁটি তিব্বতী কাজ,' আমার আগ্রহ লক্ষ করে বলল কর্লিন। 'এনেছি উত্তর ভারতের নিষিদ্ধ মন্দির পো উয়ান কোয়ান থেকে। যখন জিনিসটা আমার চোখে পড়ে তখন ওটা দিয়ে অগ্নিদেবতার পূজা করা হচ্ছিল।'

'আ-সত্যি বলতে কি, আমি লোভ সামলাতে পারিনি। বাইরের দেয়াল বেয়ে, খোলা এক জানালা দিয়ে ঢুকে কাপড়টা নিয়ে আসি আমি। মন্দিরের পুরোহিতরা তখন সবাই ঘুমাচ্ছিল।'

'আপনি ওটা চুরি করেছেন?' চিৎকার করে উঠলাম আমি। মাথা ঝাঁকাল কর্লিন। 'যারা এসব দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করে তাদের প্রয়োজন পড়লে এরকম এক আধটু শঠতার আশ্রয় নিতেই হয়। এতে অন্যায়ের কিছু নেই। তিব্বতীদের কাছে এই কাপড়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সন্ন্যাসীরা এটাকে অগ্নি দেবতার বস্ত্র বলে উল্লেখ করছিল। তাদের বিশ্বাস যারা এই বস্ত্রের অবমাননা করবে তাদের ওপর সপ্তনরক ভেঙে পড়বে।'

বস্ত্রখণ্ডটির সকল সৌন্দর্য নিহিত এর মাঝখানে, ড্রাগনের ছবি আঁকা ডিজাইনটির মধ্যে। আমি ঠিক নিশ্চিত নই, তবে জানি সকল পৈশাচিক পূজা অর্চনা এই ড্রাগনের নামেই করা হয়। এশিয়ার সবচে অজ্ঞাত ধর্মগুলোর মধ্যে এটিও একটি। ধর্মটি প্রেতপূজার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং···

আমি কাছে এসে কাপড়টি পরীক্ষা করে দেখলাম। ডানদিকের নিচের অংশটি ছেঁড়া লক্ষ করলাম।

'যে চোরটা ওটা হাতাবার চেষ্টা করেছিল সে এই কাজ করেছে,' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল কর্লিন। তবে কাপড়টা নিয়ে যাওয়ার আগেই আমি এসে উপস্থিত হই। সে ওইটুকু ছিঁড়ে অন্ধকারে পালিয়ে যায়–কি হয়েছে, ফে?'

কর্লিনের মেয়ে এসে ঢুকেছে ঘরে। তার মুখ কাগজের মত সাদা।

'তাড়াতাড়ি, ডাক্তার,' কেঁদে উঠল সে, 'আমার মা···'

বিদ্যুৎবেগে আমি এলিসের ঘরে ঢুকলাম। তার পাশে বসেই বুঝতে পারলাম সমস্ত ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে সে। মারা গেছে এলিস কর্নিল।

স্পন্দনহীন কব্জিটি হাতে ধরে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। ঘুড়িটি ধীরে ধীরে নেমে আসছে নিচে। গাছের মাথায় আছড়ে পড়ল ওটা, পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘন জঙ্গলে।

সামারিন্ডা ত্যাগ করার জন্য যেভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, এলিস কর্লিনের অস্বাভাবিক মৃত্যু আমার সেই ব্যস্ততার আগুনে জল ঢেলে দিল। ডেথ সার্টিফিকেট যদিও লিখলাম অতিরিক্ত ম্যালেরিয়া জ্বর এলিসের মৃত্যুর কারণ, কিন্তু আমি জানি কারণটা আরও রহস্যময়, আরও গভীরে প্রোথিত।

ঘুড়িটিকে সংগ্রহ করেছি আমি। কর্লিনের বাড়ির কাছে ডায়াক অধিবাসীরা তামাকের বদলে ওটাকে দিয়ে গেছে আমায়। জিনিসটা বাঁশ আর রাইস পেপার দিয়ে তৈরি, যেমন ধারণা করেছিলাম আমি। কিন্তু ওপরের অবশিষ্টাংশে ছোট এক টুকরো লাল সিল্ক কাপড় সিরিশ দিয়ে জোড়া লাগানো।

গন্ধ শুঁকলাম। কর্লিনের সেই অগ্নি দেবতার পূজার বেদির কাপড়ের গন্ধ!

হপ্তাখানেক পর কর্লিন এল আমার বাড়িতে। বারান্দায় মুখোমুখি বসলাম দু'জনে। কর্লিনকে ভয়ানক উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে।

'ভ্যান রুলার,' বলল সে। 'আবার আরেকটা ঘুড়ি।'

'কি?' চিৎকার করে উঠলাম।

মাথা ঝাঁকাল কর্লিন। 'অবিকল আগেরটার মত। একই সাইজ, একই রং, একই রকমের তার, দিন দুই ধরে দেখতে পাচ্ছি ওটাকে। তবে মনে হয় রাতের বেলা ওটা অদৃশ্য হয়ে যায়। আমার মেয়ে ফে…'

'ওকেও ধরেছে?' ভয়ে কেঁপে উঠলাম আমি।

কর্লিন হাত মুঠি করল। 'এলিস যেভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেভাবে নয়। মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ফে। কোনও দুষ্ট আত্মা ওকে ক্রমশ গ্রাস করে চলেছে।'

এবার নিজে থেকেই বললাম, 'ফে-কে দেখতে যাব আমি।' কর্লিনকে অপছন্দ করলেও ঘটনাটা আমাকে যেন সম্মোহিত করে তুলছিল। কর্লিনকে জানালাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি সাম্পানে চড়তে যাচ্ছি।

রাতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার কারণে আকাশের মুখ কালো। কাংচোকে নিয়ে সাম্পানে চড়ে বসলাম আমি। ও সাম্পানের পেছনে বসে ডায়াক মাঝিদের নির্দেশ দিতে লাগল।

গতবারের ঘুড়িটি যে জায়গায় দেখেছিলাম ঠিক একই স্থানে এই ঘুড়িটিকেও দেখলাম। নদীঘাটে সাম্পান ভেড়ার আগ পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম ঘুড়িটির দিকে। কিন্তু কোনও মন্তব্য করলাম না।

কিছুক্ষণ পর ফে কর্লিনের সঙ্গে দেখা করলাম আমি। ঘরের মাঝখানে একটি চেয়ারে পাথরের মূর্তি হয়ে বসে আছে মেয়েটি। চোখ দুটো সামনের দিকে স্থির। একটি মুখোশ যেন পরে আছে সে, ঠোঁট দুটো রক্ত শূন্য।

মিনিট পাঁচেক ওর সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু ফে কোনও কথা বলল না। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল, গলা চিরে বেরিয়ে এল সুতীব্র আর্তনাদ। পরমুহূর্তে মরা মানুষের মত ধপাস করে পড়ে গেল মেঝের ওপর। আমি ওকে পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলাম বটে, কিন্তু ভয়ে আমার বুক ইতোমধ্যে ধড়ফড় শুরু করে দিয়েছে।

ঘুড়িটি আবার তার কাজ শুরু করে দিয়েছে!

কিন্তু এবার আর ব্যাপারটাকে সহজে ছেড়ে দেব না প্রতিজ্ঞা করলাম। মেয়েটির শারীরিক সামর্থ্য ওই ঘুড়ির ওঠা নামার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্য। ঘুড়িটিকে টেনে নামানো যাবে না, তাহলে মেয়েটি মারা যাবে, ওকে মাঝ-আকাশে ধ্বংস করতে হবে।

ওষুধের বাক্সটা নিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরুলাম আমি। জঙ্গলের মধ্যে থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলাম নদীর ঘাটে। চড়ে বসলাম সাম্পানে। তীর লক্ষ্য করে বৈঠা বাইতে শুরু করলাম সর্বশক্তি দিয়ে।

আকাশে ঝড়ো মেঘ জমেছে, ঝড়ের পূর্বাভাস। তামার তারটিকে অনুসরণ করে আমি তীরে চলে এলাম, ঢুকলাম জঙ্গলে।

তারটি এখনও সেই পালাপাক গাছের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি ওষুধের বাক্স খুলে কাজে লেগে গেলাম।

প্রথমেই বের করলাম পাইরোক্সিলিন, স্প্রে করে দিলাম সামনে। ইথার এবং অ্যালকোহলের সঙ্গে চল্লিশ গ্রাম পাইরোক্সিলিন মেশালে তৈরি হয় কলোডিয়ন, ছোটখাট ক্ষত সারাবার মহৌষধ। আসলে পাইরোক্সিলিন গানকটন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বাক্স থেকে একটি ব্রাশ টিউবও বের করলাম। ওটার দুটো মুখেই বারুদের ক্যাপ পরানো। ক্যাপ দুটো খুলে ওগুলোর মধ্যে গানকটন ঢোকালাম। পকেট থেকে একটা বড় কাগজের টুকরো বের করলাম, তারপর ঘড়ির চেইনটি খুললাম।

বাচ্চাদের ঘুড়ির লেজেতে বেঁধে খবর পাঠাতে দেখেছেন? আমিও তাই করতে যাচ্ছি। তবে পার্থক্য হলো আমার 'খবর' হচ্ছে বিস্ফোরক গানকটন।

আকাশে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠলেই হলো, সামান্য ছোঁয়াও যদি এই পাইরোক্সিলিনে লাগে, সঙ্গে সঙ্গে মাঝ আকাশে ধ্বংস হয়ে যাবে ওই ঘুড়ি। আমি তামার তারটিকে গাছের সঙ্গে ভাল করে বাঁধলাম, তারপর মালমশলা জড়ানো কাগজটিকে ওটার সঙ্গে বেঁধে দিলাম।

কাজ করতে করতে কাছিয়ে এল ঝড়। ঘুড়িটি জঙ্গলের ঢেউ খেলানো গাছগুলোর ওপর উড়তে শুরু করল।

আমি তারটিকে খুলে দিলাম। তারের সঙ্গে বাঁধা কাগজের টুকরোটি এক মুহূর্তের জন্য নট নড়ন চড়ন হয়ে থাকল, তারপর মৃদু গুঞ্জন তুলে তারের সঙ্গে ওটা উঠতে লাগল ওপরের দিকে। আমি আর দেরী করলাম না। ফিরে চললাম সাম্পানের উদ্দেশে। বাইতে শুরু করলাম বৈঠা।

বাড়ি ফিরে দেখি ফে কর্লিনের কালেকশন রুমের কটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ঘরের শেষ মাথার জানালার কাছে উঁকি মেরে দাঁড়িয়ে আছে ক্যান্টোনিজ ছোকরা কাংচো।

আমি ফে-র কব্জি চেপে ধরে বসে থাকলাম। কর্লিন ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল। কাংচোকে দেখেও না দেখার ভান করল।

ঘরের কোণে, কাঠের বাক্সে রাখা তিব্বতী সেই সিল্ক কাপড় খণ্ডকে দেখলাম অনেকখানি বেরিয়ে আছে বাইরে। লাল রঙটাকে আরও উজ্জ্বল এবং তীব্র লাগছে।

ঝড় বোধহয় এসেই গেল। পুবাকাশ থেকে ছুটে এল বিশাল এক টুকরো কালো মেঘ, ধেয়ে গেল জঙ্গলের দিকে। পরক্ষণে সাপের জিভের মত ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ ঠিক ঘুড়িটির কাছে। প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল থরথর করে।

পাঁচ সেকেন্ড পর আকাশে জ্বলে উঠল আগুনের বিশাল এক চাবুক, খোলা জানালার ওপরে। চাবুকটা আঘাত হানল ড্রাগন লেজটাকে, তামার তারটি সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল দাউদাউ করে, সাপের মত পাক খেতে লাগল। পরমুহূর্তে ঘুড়িটি নেই হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

কটে শুয়ে থাকা মেয়েটির সারা শরীর নাড়া খেল প্রবলবেগে। মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল। নাড়ি কাঁপতে লাগল থরথর করে। তারপর ধীরে ধীরে বিট

স্বাভাবিক হয়ে এল, আমি স্বস্তিসূচক চিৎকার দিলাম।

সাফল্যের উল্লাসের স্বাদ অনুভব করার আগেই কাংচো-র গগনভেদী চিৎকারে আঁতকে উঠলাম আমি। ছেলেটা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে রক্তলাল সিল্কের কাপড়ের টুকরোটির দিকে।

স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম কাপড়টি থেকে ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে, পরক্ষণে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল ওটাতে।

গুঙিয়ে উঠল কর্লিন। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, যেন নড়তে ভুলে গেছে। কাঠের বাক্সটির মুখ খুলে গেল কারও অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে, সাপের মত জটা মেরে এঁকেবেঁকে বেরুতে শুরু করল জ্বলন্ত সিল্কের টুকরো। তারপর বাতাসে যেন পাখা মেলল ওটা, ভাসতে থাকল ঘরের মধ্যে।

কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে জ্বলন্ত এবং জ্যান্ত কাপড়ের টুকরোটি ছুটে গেল কর্লিনের দিকে। পালাতে চেষ্টা করল কর্লিন, কিন্তু ওর পা যেন গেঁথে থাকল মেঝের সঙ্গে, ভীত এবং হতভম্ব হয়ে সম্মোহিতের মত চেয়ে রইল সে ছুটে আসা মৃত্যু দূতের দিকে। আতঙ্কিত আমি দেখলাম জ্বলন্ত সিল্ক টুকরো সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল কর্লিনকে। ওকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতে চাইলাম সামনে। কিন্তু অদৃশ্য কোন শক্তি এক পাও এগুতে দিল না আমাকে নিজের জায়গা থেকে।

ভয়ঙ্কর চিৎকার করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল কর্লিন। ধোঁয়ার বিশাল এক পর্দা ঘিরে ফেলল ওকে। মাংস পোড়ার তীব্র গন্ধ ভেসে এল নাকে।

এই সময় আমি নড়ে উঠলাম, দৌড় দিলাম সামনের দিকে। দুই হাত দিয়ে কাপড়ের টুকরোটিকে ছুটিয়ে আনতে চাইলাম কর্লিনের শরীর থেকে। কিন্তু ওটা যেন জোঁকের মত সেঁটে থাকল তার শিকারের গায়ে। একটা কম্বল চোখে পড়ল আমার অদূরে, ওটা দিয়ে আগুন নেভানোর প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু লাভ হলো না কোনও, বরং শিখা আরও লকলক করে উঠল।

শেষ মরণ চিৎকারটা দিয়ে স্থির হয়ে গেল কর্লিন। উপুড় হয়ে পড়ে থাকল।

জানুয়ারির ২৯ তারিখ সামারিন্ডা ত্যাগ করল ফে। আমি এক হপ্তা পর যাত্রা শুরু করলাম সিঙ্গাপুর অভিমুখে। কিন্তু কাংচো-র টিকিটির দেখাও পেলাম না কোথাও।

এডওয়ার্ড কর্লিনের মৃত্যুর জন্য ক্যান্টোনিজ এই ছোকরা যে দায়ী তা আমি ডাচ কর্তৃপক্ষকে বলতে পারতাম। অথবা এই ঘটনার ওপর একটি তদন্ত করার দাবিও জানাতে পারতাম। কিন্তু এগুলো করে 'কলোনিয়াল কোর্ট অভ ল' যে কথা জানতে পারত তা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব বলেই মনে হত।

পুরো ব্যাপারটাকে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। যেমন, আমি কর্লিনের বাড়িতে গ্যাসোলিনের একটি ক্যান আবিষ্কার করেছিলাম। তাছাড়াও ওই বাড়িতে আমি খুঁজে পেয়েছি একগোছা তার, তার গোছা কালেকশন রুমে ছিল। সম্ভবত বাঁশের কার্টেনের সাপোর্টিং লাইন হিসেবে ওগুলোর ব্যবহার করা হত। এবং এই তার থেকে সৃষ্ট আগুন ওই সিল্কের কাপড়ে আগুন লাগার কারণ হিসেবে বলা যায়। আর কাংচো-র ব্যাপারে যে কথাটি আমি জেনেছি তা হচ্ছে সে আদৌ ক্যান্টোনিজ নয়, সে আসলে সেই নিষিদ্ধ মন্দির পো ইয়ান কুয়ান, যেখান থেকে

কর্লিন অগ্নি দেবতার বস্ত্র চুরি করেছিল, সেখানকার এক প্রাক্তন সন্ন্যাসী, একজন তিব্বতী।

কিন্তু তারপরও সেই ভৌতিক ঘুড়ি, কর্লিনের স্ত্রীর মৃত্যু এবং তার কন্যার জীবনে সেটার অদ্ভুত প্রভাব, এসব প্রশ্নের জবাব আমি খুঁজে পাইনি। শুধু জ্বরের কারণে এলিস মারা গেছে কিংবা ফে অসুস্থ হয়েছে, এই কথা আমি বিশ্বাস করি না।

[মূল: কার্ল জ্যাকবি'র 'দ্য কাইট']

মার্থার সাথে সাপার

আজ শুক্রবার। এস্টেলের সাথে তার অভিসারের রাত। এস্টেল তার রক্ষিতা। প্রতি শুক্রবার পল মার্থাকে কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে রাতটা এস্টেলের বাড়িতে কাটিয়ে আসে। মার্থা স্ত্রী হিসেবে খুব ভাল। কখনও পলকে আলতুফালতু প্রশ্ন করে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে না। মার্থা খুব গোছানো স্বভাবের মেয়ে। বাড়িটাকে সবসময় ঝকঝকে, তকতকে করে রাখে। ব্যবসার স্বার্থে পলকে প্রায়ই বাড়িতে পার্টি দিতে হয়। মার্থা কখনও 'না' বলে না। পলের মনে পড়ে না মার্থা তার সাথে কখনও ঝগড়া করেছে কিনা। পলকে খুব বিশ্বাস করে মার্থা। কখনও অন্য পুরুষের সাথে গায়ে পড়ে কথা বলতে যায় না। বিছানাতেও মন্দ নয় সে। রাগ কি জিনিস জানা নেই মার্থার। আর তার রান্নার হাত? উফ্, রান্নার ব্যাপারে মার্থা একটা প্রতিভা বটে! একবার যে মার্থার হাতের রান্না খেয়েছে জীবনে সে সেই স্বাদের কথা ভুলতে পারবে না।

মার্থাকে নিয়ে পল সুখী। এতই সুখী যে তার বন্ধুরা তাদের সুখকে ঈর্ষা করে। তাহলে পলের রক্ষিতার কাছে যাবার দরকারটা কি? আসলে মার্থা বড় চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে, সাত চড়ে রা করে না, আর তার মধ্যে রসবোধের বড্ড অভাব। কদাচিৎ তাকে হাসতে দেখেছে পল, তাও কসরৎ করে ওকে হাসাতে হয়েছে। আর এ ব্যাপারটাই পলের একদম ভাল লাগে না, সহ্যও হয় না।

এস্টেল সম্পূর্ণ মার্থার বিপরীত। মার্থার মাঝে অনুপস্থিত দোষের সবগুলোই তার মধ্যে বিরাজমান। এস্টেল অমনোযোগী, চট করে রেগে ওঠে, সারাক্ষণ বকবক করতেই থাকে, বেপরোয়া স্বভাবের, সুদর্শন পুরুষ দেখলেই গলে যায়। তবে সে যথেষ্ট হাসিখুশি, তার সাহচর্যে জীবনের আনন্দময়, মজার দিকটা খুঁজে পাওয়া যায়। আর শয্যাসঙ্গিনী হিসেবেও সে মার্থার চেয়ে যথেষ্ট উদ্দীপক। সন্ধ্যাগুলো তাদের কেটে যায় আনন্দ স্ফূর্তিতে, বয়ে যায় মদের বন্যা, আর বিছানায় ওঠে প্রবল ঝড়। সাপারে স্যান্ডউইচের বেশি কিছু থাকে না, তা-ও যেমন তেমন করে বানানো, কিন্তু মার্থার সুস্বাদু রান্না খেয়ে অভ্যস্ত পল এস্টেলের অখাদ্য রান্নাকে ক্ষমা সুন্দর চোখেই দেখে থাকে।

এস্টেলের মত রগচটা, আগুনের গোলাকে বিয়ে করার কথা কল্পনাও করতে পারে না পল, কিন্তু টানা ছ'টা দিন মার্থার নিরানন্দ সাহচর্য তাকে এত ক্লান্ত করে তোলে যে সপ্তাহের ওই বিশেষ দিনটির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে সে।

আজ শুক্রবার। মার্থাকে পল বলে এসেছে তার ব্যবসায়ী মক্কেলদের সাথে জরুরী কাজ আছে, বাড়িতে ফিরতে পারবে কিনা সন্দেহ। তারপর যথারীতি চলে এসেছে প্রণয়ীর অ্যাপার্টমেন্টে।

দরজার বেল বাজাল পল। সাধারণত বেল বাজানোর পরপরই দরজা খুলে দেয় এস্টেল, সেঁধিয়ে যায় পলের বাড়িয়ে দেয়া বাহুডোরের মাঝে। এ কাজটা মার্থা

জীবনেও করবে না, জানে পল। অবশ্য এ নিয়ে তার আর আফসোসও নেই। আর এস্টেলের কাছে আসা মানেই ভালবাসার সাগরে মন্থন। এস্টেল যখন ওকে জড়িয়ে ধরে, গা থেকে ভেসে আসে তারই প্রেজেন্ট করা দামী সেন্টের গন্ধ, সুবাসটা পাগল করে তোলে পলকে। তারপর কলহাস্যে ভেঙে পড়ে দু'জনে, চলে উজ্জ্বল ঝাড়বাতির নিচে মিউজিকের তালে উদ্দাম নৃত্য, মাঝে মাঝে মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে শরীরটাকে আরও গরম করে নেয়—আহ্, এরই নাম জীবন!

কলিংবেল টিপে বরাবরের মত সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিল পল। কিন্তু দরজার আড়ালে দ্রুত পায়ের শব্দ না শুনে কপালে ভাঁজ পড়ল ওর। তাহলে কি এস্টেল শুনতে পায়নি বেলের আওয়াজ? আবার বেল টিপে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

ঘড়ির দিকে তাকাল পল। ও কি নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে এসেছে নাকি দেরী করে ফেলেছে? না, কাঁটায় কাঁটায় আটটা বাজে। সাধারণত এ সময়েই সে আসে। তৃতীয়বারের মত বেল বাজাল পল। এস্টেলের কোন সাড়া নেই।

ঝুঁকে, লেটার-বক্সের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল পল। ছোট্ট হলঘরটা অন্ধকার এবং খালি। লিভিংরুমের দরজা বন্ধ। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, অন্তত আলো জ্বেলে থাকার কথা, আর ওই দরজাটাও সব সময় খোলা থাকে। আজ বন্ধ কেন? গান-বাজনারও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ পল এলেই এস্টেল চালু করে দেয় রেকর্ড প্লেয়ার।

অবাক হলো পল, রাগও হলো খুব। এস্টেল নিশ্চয়ই বাইরে গেছে! আজ তার আসার দিন আর আজকেই সে কোন্ সাহসে বেরুল? যাওয়াটা এতই যদি জরুরী, অফিসে তাকে অন্তত ফোন করে জানাতে পারত। আজ সারাদিন পল অফিসেই ছিল।

হতাশায় এবং রাগে ফুলতে ফুলতে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল পল। গাড়িতে ওঠার আগে একবার মুখ তুলে চাইল এস্টেলের বাড়ির জানালার দিকে। জানালা অন্ধকার, পর্দা তোলা। এস্টেল কোথায় যেতে পারে ভেবে পেল না পল।

বাড়ি ফিরবে, ঠিক করল ও। এ ছাড়া করার আছেটাই বা কি। মার্থা তাকে অসময়ে ফিরতে দেখে অবাক না-ও হতে পারে। তার প্রকৃতিই তো এমন। কোন কিছুতেই অবাক হয় না। পলের খুব খিদে পেয়েছে। রাগের চোটে অনেকের খুব খিদে পেয়ে যায়। মার্থা সুস্বাদু কিছু খাবার নিশ্চয়ই তাকে খাওয়াতে পারবে। কারণ মার্থার কিচেনে সব সময়ই কোন না কোন আইটেম রান্না করা থাকে।

বিরসবদনে নিজের বাড়ি ঢুকল পল, হলস্ট্যান্ডে রেখে দিল ওভারকোট এবং হ্যাট, লক্ষ করল মার্থার কোটটাও ওখানে ঝুলছে, বেডরুমে ওয়ার্ডরোবের বদলে কোটটা এখানে কেন এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাল না সে, সোজা চলে এল লিভিংরুমে।

আগুনের পাশে, বড় ইজি-চেয়ারটাতে শরীর মুচড়ে বসে আছে মার্থা, বই পড়ছে। কাজ না থাকলে এ কাজটাই সবসময় করে সে। বই পড়ার নেশা তার সাংঘাতিক। আর সিরিয়াস সব বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বেশি। তবে একটা বিষয়ের সাথে বেশিদিন সেঁটে থাকে না। হয়তো এ মাসে তাকে দেখা গেল জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে পড়ে থাকতে, সামনের মাসে হয়তো ডুবে যাবে বোটানির জগতে, পরের মাসে

অঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকবে কিংবা ব্যালের ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে। তবে যে বইই পড়ুক না কেন, খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে মার্থা। ইদানীং তাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের নেশায় পেয়ে বসেছে। ডাক্তার, ড্রাগস, অ্যানাটমি, সার্জারী ইত্যাদি বিষয়ের ওপর যত বই সে পাচ্ছে পাবলিক লাইব্রেরীতে, সব বাড়িতে নিয়ে আসছে। সেদিন পল হাসতে হাসতে মার্থাকে বলছিল, 'আমাদের হাউজ ফিজিশিয়ানের আর কি দরকার, বাজি ধরতে পারি, তুমি ওনার চেয়ে অনেক বেশি জেনে ফেলেছ এ ক'দিনে।' হালকা এই রসিকতায় কিন্তু হাসেনি মার্থা। কোন রসিকতায় সে হাসে না।

তবে পলকে অবাক করে দিয়ে আজ হাসল মার্থা। ওর ধারণাই সত্যি হলো। ওকে অসময়ে ফিরতে দেখে মোটেও অবাক হয়নি মার্থা। হাসি দিয়ে শুধু বুঝিয়ে দিল পলকে দেখে সে খুশি হয়েছে।

'হ্যালো, ডিয়ার,' বলল মার্থা। 'তোমার বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেলড্ নাকি?'

'হ্যাঁ। বিকেলে ফোন করে বলল আজ ওরা বসতে পারবে না।'

'ভালই হলো। সারাদিন অফিস করার পরে তোমাকে আবার রাত জেগে কাজ করতে হবে না। বসো তুমি। আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি।'

'দুঃখিত,' বলল পল। 'তোমাকে জানানো উচিত ছিল রাতে আমি বাড়ি ফিরছি।'

'দুঃখিত হবার কিছু নেই। ফ্রিজে সবসময়ই কিছু না কিছু খাবার থাকেই। লিভার আর বেকনের সাথে সুস্বাদু কিডনি চলবে?'

'চলবে মানে দৌড়াবে।' খুশি হয়ে উঠল পল। 'তুমি সত্যি চমৎকার একটা মেয়ে।' একই সাথে বিবেকের দংশন অনুভব করল সে। বউটাকে শুধু শুধু ঠকাচ্ছে সে। আজ মার্থাকে দেখতেও সুন্দর লাগছে। সেজেছে বোধহয়।

'তোমাকে বেশ সুন্দর লাগছে। ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল পল।

'আজ দিনটা বেশ ভাল গেছে আমার। কেন?'

'না, মানে, এত হাসিখুশি আগে দেখিনি তো!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মার্থা। 'আমি আজ বেশ সুখেই আছি।'

এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহটা খোঁচা দিল পলকে, মার্থার গোপন নাগর-টাগর নেই তো? পরক্ষণে চিন্তাটা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল মাথা থেকে। মার্থা এমন কাজ করতেই পারে না। করলে শুক্রবার রাতটাকেই ব্যবহার করত সে, যে সময়টাতে সে বাইরে থাকে। কিন্তু মার্থা এতই বিশ্বস্ত যে স্বামীর অনুপস্থিতির অন্যায় কোন সুযোগ নেয়নি, শুধু বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থেকেছে। ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন!

'আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ এই ড্রিংকটাতে চুমুক দিতে থাকো।' শেরীর একটা গ্লাস ওর হাতে ধরিয়ে দিল মার্থা। অতিথির জন্য এই একটা অ্যালকোহলই ওরা বাড়িতে রাখে। স্বামীকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল স্ত্রী।

শেরীর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অন্যান্য শুক্রবারের সাথে আজকের দিনটার পার্থক্য মেলাতে চেষ্টা করছিল পল। প্রায় ন'টা বাজে। এতক্ষণে সে আর এস্টেল কয়েকটা ডাবল জিন মেরে দিয়ে ফায়ার প্লেসের সামনের মেঝেতে পাতা ফারের

কম্বলের ওপর শুয়ে শরীরের বন্দনায় মেতে উঠত, রেকর্ড প্লেয়ারে বাজত জ্যাজ মিউজিক–যে ধরনের মিউজিক মার্থার একেবারেই অপছন্দ। সে ঠাণ্ডা গান পছন্দ করে। তার সমস্ত অনুভূতিই ঠাণ্ডা আর ভোঁতা।

মার্থা যে মোটা বইটা এতক্ষণ পড়ছিল, ওটা উল্টেপাল্টে দেখল পল। চিকিৎসা শাস্ত্র। পাতা ওল্টাতে গিয়ে নগ্ন নারীদেহের আঁকা ছবি চোখে পড়ল। ছবিটা দেখে তেমন মজা পেল না সে। মেয়েদের শরীর-বৃত্তান্ত। এঁকে দেখানো হয়েছে নানা ইন্টারন্যাল অর্গান, মেডিকেলের ছাত্রদের খুব উপকারে আসবে এই নিখুঁত বর্ণনা। মেয়েরা নিশ্চয়ই নিজেদের ন্যাংটো শরীরের অ্যানাটমি দেখে মজা পাবে না। সে মুখ বিকৃত করে বন্ধ করল বইটা, ছুঁড়ে দিল চেয়ারের ওপর। তারপর জ্যাকেটের পকেট থেকে পেপার ব্যাক থ্রিলার বের করে তাতে মনোনিবেশ করল।

বইটার প্রচ্ছদে স্বর্ণকেশী, উদ্ভিন্নযৌবনা এক সুন্দরীর ছবি। তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কিছুই নেই। মেয়েটার ফিগার অবিকল এস্টেলের মত, তবে এস্টেলের চুল অত লম্বা নয়। এস্টেল আজ ওকে ধোঁকা দিয়েছে মনে পড়তেই তিড়বিড় করে জ্বলে উঠল ভেতরটা। শুক্রবার রাত তার আনন্দের রাত। আর আজ কিনা তাকে এভাবে গোবেচারা হয়ে বাড়িতে বসে থাকতে হচ্ছে!

মন থেকে বিরক্তি আর রাগ দুটোই উধাও হয়ে গেল মার্থাকে খাবার নিয়ে আসতে দেখে। খুশি হয়ে উঠল পল। লিভার, কিডনি, বেকন···প্রতিটি আইটেমই দারুণ রেঁধেছে মার্থা। পেটে খিদে ছিল, প্লেট চেটেপুটে খেল সে। শেষে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল, 'দারুণ হয়েছে রান্না!'

'হবেই তো। আজ বিশেষভাবে রেঁধেছি যে,' বলল মার্থা।

'তুমি খুব ভাল মেয়ে। আর তোমার ওপর খুব সহজে আস্থা রাখা যায়,' আদুরে গলায় বলল পল।

'আস্থা আসলে রাখা যায় তোমার ওপরে,' বলল মার্থা।

'মানে?'

'এই যে তোমাকে যা দিই সব চেটেপুটে খেয়ে নাও।'

'খাব না কেন? তোমার রান্নার হাত এত ভাল!'

'এ কারণেই তোমাকে বোকা বানানো আমার জন্য সহজ হয়েছে।'

ঠাট্টা নাকি? মার্থা ঠাট্টা কি জিনিস জানেই না। ঠাট্টা করে ওকে কোনদিন হাসতে দেখেনি পল। তাই সে বুঝতে পারল না মন্তব্যটা কিভাবে নেবে।

'আমাকে বোকা বানিয়েছ মানে?' অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। 'তুমি আবার মানুষকে বোকা বানাতে জানো নাকি?'

'জানব না কেন? আমি খুশি যে রান্নাটা তুমি উপভোগ করেছ। তোমার জন্য এটাই আমার শেষ রান্না, ডিয়ার। আর কোনদিন তোমাকে রেঁধে খাওয়াব না। ব্যাপারটা খুব মিস করব আমি। অথচ রান্নার শখ আমার কত!'

'মার্থা, আবোল-তাবোল কি বলছ? শেষ রান্না–'

'হ্যাঁ। আমি আজ চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছ?'

'হুঁ। তবে ঠিক কখন যাব এখনই বলতে পারছি না। ব্যাপারটা নির্ভর করবে

পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপরে। কেমন লাগছে তোমার?'

ভয় লাগছে পলের। বুঝতে পারছে না এসব কি হচ্ছে। বুকের ভেতরে ধুপধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। তৃপ্তি নিয়ে খাওয়া খাবারগুলো পেটের ভেতর হঠাৎ যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে, মোচড় দিচ্ছে পেট।

'কেমন লাগছে?' আবার প্রশ্ন করল মার্থা।

'কি কেমন লাগছে?'

'খাবারের কথা বলছিলাম। কোন সমস্যা হচ্ছে না তো?'

'কেন হবে? তুমি তো বরাবরই ভাল রান্না করো। মার্থা, তোমার হয়েছেটা কি বলো তো? ইয়ার্কি করছ?'

'আমি কখনও ইয়ার্কি করি না।' গম্ভীর হলো মার্থা। 'আজ বিকেলে এস্টেলের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।'

আঘাতটা এত দ্রুত এসে লাগল, রীতিমত অসুস্থ বোধ করল পল। তবে কোন মন্তব্য করল না।

হাসল মার্থা।

বিড়বিড় করল পল: 'ওর খোঁজ পেলে কি করে?'

'হঠাৎ বলতে পারো। তোমার ট্রাউজারের পকেটে ওর একটা চিঠি পেয়ে যাই আমি, লন্ড্রিতে দিতে যাচ্ছিলাম কাপড়টা। তবে এটা কয়েক মাস আগের ঘটনা। কি করব বা করা উচিত সে সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় লেগেছে আমার।'

'এ জন্যেই আজ ওকে বাসায় পাইনি।' হতবুদ্ধি দেখাল পলকে। 'তুমি নিশ্চয়ই বিকেলে ওর বাসায় গিয়েছ, বলেছ আমাদের ব্যাপারটা আর অজানা নেই তোমার কাছে—'

'ঠিক ধরেছ,' বলল মার্থা। 'এখন কেমন বোধ করছ?'

'কেমন বোধ করছি মানে?'

'মানে—সাপারটা খাওয়ার পরে হজমে কোন গোলমাল—'

'বমি বমি লাগছে আমার,' স্বীকার করল পল।

'বেচারা পেট! ওর আর দোষ কি!'

'তুমি আমার খাবারে বিষ-টিষ মেশাওনি তো?' ফিসফিস করল পল, কপালে এবং হাতে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'সেটা নির্ভর করে বিষ বলতে তুমি কি বোঝো তার ওপর।'

'কি বুঝি মানে!' আর্তনাদ করে উঠল পল। 'তুমি আমার খাবারে তাহলে সত্যি বিষ মিশিয়েছ!'

'না,' বলল মার্থা, হাসছে।

'সত্যি বলছ?'

হাসিটা মুছে গেল মুখ থেকে। 'তোমাকে আমি কখনও মিথ্যা কথা বলিনি, পল। কোনদিন নয়। কিন্তু তুমি আমার সাথে অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছ। তোমার সঙ্গে আমার ফারাকটা এখানেই। আমি কখনও মিথ্যা বলি না। আজও তোমার কাছে কিছু লুকাব না। আমি একটা প্ল্যান করেছিলাম, সেটার বিশদ বর্ণনা অত্যন্ত আনন্দের সাথেই তোমাকে দেব।'

'ঠিক আছে, বলো।'

এমন সময় বেজে উঠল কলিংবেল। লাফিয়ে উঠল পল। মার্থা বসে রইল চুপচাপ।

'দেখো তো কে এসেছে,' বলল সে। 'যে-ই হোক তাকে ভেতরে নিয়ে এসো। বাইরে খুব ঠাণ্ডা।'

পল দরজা খুলতে গেল।

দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়। 'মি. পল ফেরো?' জিজ্ঞেস করল লম্বা জন।

'জ্বী।'

'আপনার সাথে কথা আছে আমাদের। ভেতরে আসতে পারি?'

ঘরে ঢুকল ওরা। লম্বা পুলিশ অফিসার পলের সাথে লিভিংরুমে ঢুকে পড়ল। অন্যজন দাঁড়িয়ে রইল সদর দরজায়।

'উনিই কি মিসেস ফেরো!' বলল লম্বু।

'জ্বী। আমার স্ত্রী,' জবাব দিল পল। 'কিন্তু আপনারা–'

'মি. ফেরো, আজ কি আপনি ১৪, এক্সেল কোর্টে মিস এস্টেল মন্টজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন?'

'গিয়েছিলাম। কিন্তু ওর সাথে দেখা হয়নি। বাইরে গেছে।'

'তখন কটা বাজে?'

'দেখুন, আপনার প্রশ্নের মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না আমি।'

'যা জানতে চেয়েছি তার জবাব দিন দয়া করে।'

'আটটার সময় ওর বাসায় যাই আমি। কলিংবেল টিপলেও কোন সাড়া পাইনি। এস্টেল বোধহয় বাড়িতে ছিল না।'

'মিসেস ফেরো, আপনার স্বামী আজ কখন বাড়ি ফিরেছেন?'

'ন'টার অল্প আগে।'

'এস্টেলের কিছু হয়নি তো?' উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল পল।

'জ্বী,' জবাব দিল পুলিশ অফিসার। 'মারা গেছেন তিনি।'

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল পল, আরও অসুস্থ বোধ করল। 'মারা গেছে? এস্টেল? কিভাবে?'

'সে ব্যাপারটাই আপনার কাছে জানতে চাইছি। ওর লাশের পাশে, বেড-সাইড টেবিলের ওপর আপনার নাম-ঠিকানা লেখা এই কাগজের টুকরোটা পেয়েছি আমরা।'

কাগজে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পলের নাম আর ঠিকানা লেখা। হাতের লেখাটা মার্থার। পল স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে চাইল। খুব মিষ্টি করে হাসল মার্থা।

'ওকে যদি আমিই খুন করতাম,' বলল পল, 'নিশ্চয়ই নিজের নাম-ঠিকানা লিখে রেখে আসতাম না–'

'সেটা অবশ্য আমরাও ভেবেছি।' বলল পুলিশ অফিসার।

'ওর খোঁজ পেলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল পল।

'রাত আটটার আগে একটা উড়ো কল পাই আমরা। এক মহিলা ফোন

করেছিল। বলল ওই ফ্ল্যাটে যেন চলে যাই, কারণ ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মারা গেছে। খবরটা ভুয়াও হতে পারত, কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করে দেখব ঠিক করি। বেল বাজিয়েছি কয়েকবার, কারও সাড়া পাইনি। শেষে হল পোর্টারের কাছ থেকে পাস-কি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ি। এস্টেল মনটজয় গলা কাটা অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে ছিলেন বিছানায়, এ ছাড়া আরও–

থেমে গেল অফিসার, ঘুরল মার্থার দিকে, ও রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে।

'কোথায় যাচ্ছেন, মিসেস ফেরো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'একটা জিনিস দেখাব আপনাকে,' বলল মার্থা।

মার্থার পেছন পেছন রান্নাঘরে গেল অফিসার, পলও গেল। মার্থা টান মেরে একটা ড্রয়ার খুলল, ভেতরে অনেকগুলো কিচেন নাইফ। সবচে' ধারাল নাইফটা অফিসারের হাতে দিল সে।

'আমিই আপনাদের ফোন করেছি,' বলল মার্থা, 'এ জিনিসটা দিয়ে ওই মেয়েটাকে হত্যা করেছি। আমার লুকোবার কিছু নেই। আপনি এখন আমাকে স্বচ্ছন্দে জেল-হাজতে পুরে দিতে পারেন। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। সুন্দরী এস্টেলের কি দশা আমি করেছি তা আমার স্বামীকে বলার দরকার নেই। আমিই ওকে বলছি।'

পলের দিকে ঘুরল মার্থা।

'এস্টেলের সাথে আমি নিজেই যোগাযোগ করি,' শুরু করল সে। 'নিজের পরিচয় দিই ওকে, ও তারপর আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়। আমরা তোমাকে নিয়ে গল্প করেছি, এমন গল্প যা ছেলেদের শোনা বারণ, শুধু মেয়েরাই এরকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। খুব জমে উঠেছিল আমাদের আড্ডা। কথায় কথায় ওকে জানাই আমি খুব ভাল রান্না করতে পারি। যে কোন জিনিস সুস্বাদে পরিণত করতে আমার জুড়ি নেই। কথা বলতে বলতে আমি অফিসারের হাতের ওই কিচেন নাইফটা হ্যান্ডব্যাগ খুলে বের করি, এস্টেল কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর গলায় ধারাল ব্লেড চালিয়ে দিই। ডাক্তারী বই পড়ে আগেই জেনে নিয়েছিলাম কোথায় ছুরি চালালে দ্রুত মারা যায় মানুষ। গরু জবাই করার মত রক্ত ঝরছিল এস্টেলের কাটা গলা দিয়ে। তবে অত রক্ত দেখেও আমার বমি-টমি আসেনি। আমি এরপর ওকে টেনে ওর বেডরুমে নিয়ে যাই, শুইয়ে দিই বিছানায়। তারপর একটা কাগজে তোমার নাম-ঠিকানা লিখে ফেলি। কাগজটা নিজেই দেখেছ। এ ধরনের কেসে পুলিশকে কারও না কারও সাহায্য করতেই হয়। তারপর এস্টেলের গা থেকে জামা-কাপড় খুলে বিছানার পাশে একটা চেয়ারে রেখে দিই। তারপর কেটে নিই ওর কিডনি জোড়া।'

'ব্যস, ব্যস, ম্যাডাম। অনেক হয়েছে। এবার আসুন আপনি,' বলল পুলিশ অফিসার, চোখে নির্জলা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে, সে মার্থার কনুই চেপে ধরে তাকে নিয়ে হলঘরের দিকে এগোল।

লিভিংরুমের সামনে দিয়ে যাবার সময় এক ঝটকায় পুলিশ অফিসারের শক্ত মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল মার্থা, ইজি চেয়ারের ওপর রাখা মোটা মেডিকেলের বইটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল:

'এস্টেলকে কাটা ছেঁড়া করার সময় আমি অ্যানাটমির সাহায্য নিয়েছি, ডিয়ার। অত্যন্ত দক্ষ হাতে কাজটা করেছি আমি। আমার প্রথম অপারেশন! যদি ওই সময় আমাকে দেখতে অভিভূত না হয়ে পারতে না। চমৎকার ভাবে ওর কিডনি দুটো বিচ্ছিন্ন করেছি ওর শরীর থেকে–'

'ও যা বলছে তা সত্যি?' জিজ্ঞেস করল পল।

'জ্বী,' ছোট্ট করে জবাব দিল অফিসার।

পল ঘুরে দাঁড়াল মার্থার দিকে। 'তুমি ওর–'

'কিডনি দুটো কেটেছি, ডিয়ার। হ্যাঁ।' হেসে উঠল মার্থা। পরিতৃপ্তি এবং আনন্দের হাসি। কলকণ্ঠে সে হাসতেই লাগল। ওকে এভাবে কখনও হাসতে দেখেনি পল। সে হাসতেই লাগল–হাসতেই লাগল–হাসতে হাসতে বলল মার্থা, 'ওটা ছিল আমার জীবনের সবচে' সুখের এবং রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। আমি ওর কিডনি কেটে নিয়েছি। আর সে জিনিসই তৃপ্তি নিয়ে খেয়েছ তুমি! সাপারে!'

[মূলঃ রোজমেরী টিম্পারলি'র 'সাপার উইথ মার্থা']

প্রেতাত্মার প্রতিশোধ

এডিথ তার স্বামী আর্থার নোয়াকসের স্বভাব চরিত্র খুব ভালই জানত। জানত তার মৃত্যুর পরপরই সে পরস্ত্রীর দিকে ঝুঁকে পড়বে। কারণ বিয়ের পর থেকেই সে দেখে এসেছে আর্থার পরস্ত্রীর প্রতি ভীষণ দুর্বল। হিংসায় ছটফট করত এডিথ। কিন্তু শত চেষ্টা করেও স্বামীকে ওই লাইন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি সে। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সুখ নামের শুক পাখিটির সন্ধান পায়নি সে। এজন্য আর্থারকেই মনে প্রাণে দায়ী করে এসেছে এডিথ। তাই ওর মৃত্যুশয্যায় শেষবারের মত স্বামীকে সতর্ক করে দিয়েছিল—তার মৃত্যুর পর আর্থার যদি কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে তবে এডিথ তাকে ছাড়বে না। সারা জীবনে যা করতে পারেনি মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে এসে সে তাই করবে। আর্থার কোনও মেয়ের দিকে যদি ফিরেও তাকায়, জীবন নরক করে তুলবে এডিথ। যে আগুনে এতদিন দগ্ধ হতে হয়েছে তাকে, সেই আগুনেই পুড়িয়ে মারবে ওকে।

আর্থার নোয়াকসের মুখ দেখে মনে হয়নি স্ত্রীর হুমকিতে তার কোনও ভাবান্তর ঘটেছে। মৃত্যু পথযাত্রী স্ত্রীর শেষ কথা সে প্রলাপ বলেই ধরে নিয়েছিল। এবং স্ত্রী বিয়োগের অল্প ক'দিনের মধ্যেই দেখা গেল পরস্ত্রীদের পেছনে ঘুরঘুর শুরু করে দিয়েছে। এডিথের মৃত্যুতে আসলে সে মনে মনে উল্লসিতই হয়েছে। কারণ এখন সে মুক্ত ভ্রমরের মত ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতে পারবে। বাধা দেয়ার কেউ নেই। কেউ তাকে আর জ্বালাতন করতে আসবে না। চাই কি আবার বিয়ে করেও ফেলতে পারে। অবশ্য এখনই ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীতে মেয়ের অভাব নেই। আপাতত কিছুদিন সে মৌজ করে নেবে।

নিউহার্স্টের খুদে শহর সাসেক্স টাউনে জামাকাপড়, কসমেটিকস থেকে শুরু করে চুলের কাঁটা কিংবা ফিতের জন্য সব মেয়েকেই একটা দোকানে আসতে হয়। কারণ সবেধন নীলমণি দোকান আছেই এই একটা। আর এটার মালিক হচ্ছে আর্থার নোয়াকস। সাসেক্স টাউনের সুন্দরী মহিলারা এই দোকানেই কেনাকাটা করতে আসেন। আর্থারের মনে সাধ জাগে এদের কারও সাথে প্রেম করতে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে দেখতে হ্যান্ডসাম হলেও বিপত্নীক আর্থারের সঙ্গে কোনও কুমারী সম্পর্ক গড়তে ভয় পায়। কারণ সাসেক্স টাউন খুবই ছোট শহর। এখানে প্রেমের মত একটা ব্যাপার কিছুতেই গোপন থাকবে না। আর বিপত্নীক কোনও পুরুষের সাথে মাখামাখির কথা একবার কেউ জানতে পারলে ব্যাপারটা খুব দ্রুত মুখরোচক সংবাদে পরিণত হবে, সন্দেহ নেই। কুমারীদের সাথে প্রেম প্রেম খেলার কোনও চান্স নেই দেখে আর্থার নোয়াকস সিদ্ধান্ত নিল সে সুন্দরী কোনও বিধবাকেই প্রেম নিবেদন করবে। এদিকে ঝুঁকি কম। ঠিকমত টোপ ফেলতে পারলে মাছ বড়শি গিলতে বাধ্য। তক্কে তক্কে ছিল সে। একদিন সুযোগ মিলেও গেল।

আর্থারের দোকানে ফিতে আর লেস কিনতে প্রায়ই আসে মিস ম্যাবেল।

ম্যাবেল বিধবা। স্বামী গত হয়েছে অনেকদিন। সুন্দরী, তন্বী। লাবণ্যে মুখখানা ঢলঢল, ওকে প্রথম দেখার পরেই আর্থারের বুকে, যাকে বলে প্রেমের তুফান ছুটেছিল। একদিন সে সাহস করে দুরুদুরু বক্ষে ম্যাবেলকে প্রস্তাবটা দিয়েই ফেলল, বলল ম্যাবেলকে খুব পছন্দ তার, বান্ধবী হিসেবে তাকেই কামনা করে। এহেন প্রস্তাবে ম্যাবেলকে দৃশ্যত বিরক্তিতে সামান্য ভুরু ভঙ্গী করতে দেখা গেলেও তার গভীর নীল চোখের ঝিকিমিকিতে বোঝা গেল প্রস্তাবটা একেবারে ফেলে দিচ্ছে না সে, বিবেচনায় রাখছে। আর্থারের বান্ধবী হতে খুব একটা আপত্তি নেই তার। কিন্তু মুখে বলল, 'দেখুন, মি. নোয়াকস, আপনার স্ত্রী মারা গেছেন বেশি দিনও হয়নি। এরই মধ্যে অন্য কোনও মহিলাকে বান্ধবী হিসেবে প্রত্যাশাটা কি বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?' এডিথের কথা বলতেই আর্থার সামান্য কেঁপে উঠল। তবে পরক্ষণে সামলে নিল নিজেকে। কারণ ম্যাবেলের সাগর নীল দুই চোখের প্রশ্রয়কে চিনে নিতে ভুল হয়নি তার। কথা বলার রাজা সে। মেয়েদেরকে পটাতে পারে খুব সহজে। গলায় পুরো এক বোতল মধু ঢেলে সে এবার আবেগমথিত কণ্ঠে বলতে শুরু করল, 'মাই ডিয়ার ইয়াং লেডী, আপনাকে প্রথম যেদিন দেখি সেদিনই আমার বুকে ঢেউ উঠেছে। প্রচণ্ড ভাললাগায় প্লাবিত হয়েছিল অন্তর। আবেগের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম আপনার প্রেমে পড়ে গেছি আমি। অনেক চেষ্টা করেছি তীব্র এই আবেগকে সংযত করতে। পারিনি। মানেনি হৃদয়। মনে হয়েছে আমার হৃদয়ের কথাগুলো আপনাকে বলতে না পারলে বুক ফেটে মরে যাব। আপনি যদি আমাকে বান্ধবী হিসেবে একটুক্ষণ সঙ্গ দেন, আপনার পাশে একটু হাঁটার সুযোগ দেন, নিজেকে ধন্য মনে করব আমি। যদি আপনার আপত্তি থাকে প্রকাশ্যে গল্প করতে, তাহলে কি আমরা শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে মিলিত হতে পারি না, যেখানে কেউ আমাদের দেখবে না? আমার অব্যক্ত কথাগুলো বলতে পেরে হালকা বোধ করছি, মিস ম্যাবেল। সবই তো শুনলেন আপনি, এরপরেও কি এই ভালবাসার কাঙাল মানুষটিকে আপনার মধুর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করবেন?' কথাগুলো বলে নিজেই চমৎকৃত হলো আর্থার। সাগ্রহে চেয়ে রইল ম্যাবেলের দিকে। ম্যাবেল চুপ করে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। ডান পা হালকাভাবে মেঝেতে ঘষছে। ইতস্তত একটা ভঙ্গী। যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কি বলবে। আর্থার দেখল ওর মসৃণ গাল ধীরে ধীরে রাঙা হয়ে উঠছে। লাজুক এক টুকরো হাসি ফুটে উঠছে মুখে। হার্টবিট বেড়ে গেল আর্থারের। তবে কি সে সফল হতে চলেছে?

চোখ তুলল ম্যাবেল। ভীরু লাজ সেই চোখে। 'কেউ আমাদের দেখবে না এমন কোথায় আমরা দেখা করতে পারি?' লজ্জা লজ্জা ভাব করে জানতে চাইল সে, যেন পরপুরুষের আহ্বানে এভাবে দ্রুত সাড়া দেয়া প্রগলভতারই পরিচয়।

জয়ের উল্লাস অনুভব করল আর্থার। ইচ্ছে করল একপাক ট্যুইস্ট নাচে। জায়গাটা তার আগে থেকেই চেনা ছিল। কারণ এর আগেও সে ওখানে গিয়েছে। ম্যাবেলকে জায়গাটার রোমান্টিক বর্ণনা দিয়ে জানাল ওখানে কেউ তাদের বিরক্ত করতে আসবে না। এখন ম্যাবেল সাহস করে এলেই হয়। ম্যাবেল মৃদু গলায় বলল, সন্ধেয় সে আর্থারের সঙ্গে ওখানে দেখা করবে।

শহর থেকে দূরে, ছোট নদীটার ওপরের সেতুটাই হচ্ছে প্রেমিক প্রেমিকাদের

অন্তরঙ্গ আলাপনের একমাত্র গোপনীয় স্থান। চমৎকার জায়গাই বেছে নিয়েছে আর্থার। এখানে সত্যি কেউ ওদের বিরক্ত করতে আসবে না। সন্ধ্যায় আগেভাগে নির্ধারিত স্থানে গিয়ে নতুন প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে। ম্যাবেল বুদ্ধিমতী মেয়ে। তাই বেশিক্ষণ তার অপেক্ষায় চাতকের মত হাঁ করে থাকতে হলো না আর্থারকে। দেখল ভীরু পদক্ষেপে সে ব্রিজের ওপর দিয়ে আসছে। আনন্দের ষোলো কলা পূর্ণ হলো আর্থারের। খুশিতে সবক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ম্যাবেল এল। আর্থারের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল। তারপরের ঘটনা সহজেই অনুমেয়। সেই দীর্ঘ কামকলার কাহিনী বয়ান করে পাঠককুলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

এভাবে দিনের পর দিন চলতে লাগল অভিসার। নির্ধারিত সময়ে ম্যাবেল আসে ওখানে। তারপর দুজনে ঘাসের বুকে শুয়ে শুয়ে ভালবাসার গল্প বলে, প্রেম করে। এমনি করে দিব্যি হেসে খেলে কেটে যাচ্ছিল দিন। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় একটু ছন্দপতন হলো। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে, অথচ ম্যাবেলের এখনও দেখা নেই। আর্থার প্রথমে ভাবল কোনও কাজে হয়তো সে আটকা পড়ে গেছে, তাই আসতে দেরী হচ্ছে। কিন্তু দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা গেল, অথচ ম্যাবেলের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। এবার খুব চিন্তায় পড়ে গেল আর্থার। মেয়েটার হলো কি? আসছে না কেন এখনও? নাকি ওকে অপেক্ষায় রেখে মজা পাচ্ছে সে? হয়তো আজ আর আসবেই না! বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে আর্থার যখন ঠিক করে ফেলেছে চলে যাবে, এমন সময় ম্যাবেলকে দেখতে পেল সে। ব্রিজের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে।

'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি তোমাকে,' এরকম ভেবে আর্থার একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষা করতে লাগল ম্যাবেল ওদের প্রেমকুঞ্জে এসে দাঁড়ালেই ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে চমকে দেবে। ম্যাবেল সোজা হেঁটে এসে ওদের ভাল-বাসাবাসির জায়গাটায় দাঁড়াল, আর্থারের দিকে পেছন ফিরে আছে সে। হঠাৎ আর্থার বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। ম্যাবেলকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ওর সরু কোমর জড়িয়ে ধরল সে দুহাতের বেড়িতে।

সাথে সাথে ভয়ানক নাড়া খেল আর্থার। মনে হলো বরফের মত ঠাণ্ডা, অস্তিত্বহীন একটা জিনিসকে সে জড়িয়ে ধরেছে। ম্যাবেল এই সময় মুখ ঘোরাতে শুরু করল। ভয় কাকে বলে টের পেল আর্থার। তীব্র আতঙ্কে শরীর কেঁপে উঠল। এ কাকে দেখছে সে? এ তো ম্যাবেল নয়, ম্যাবেলের সেই চাঁদের মত ঢলঢল মুখখানা কোথায়? খড়ির মত সাদা মুখ, নিষ্প্রাণ কোটরাগত চোখে বিকৃত ভঙ্গী নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে তারই মৃতা স্ত্রী এডিথ। ঘৃণা আর ভয়ে আর্তনাদ করে ছিটকে সরে গেল আর্থার।

বীভৎস মূর্তিটা ওর দিকে সাদা হাড়ের একটা আঙুল তুলল, যেন অমঙ্গলের সঙ্কেত দিচ্ছে। পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে আর্থারের মনে পড়ল মৃত্যুশয্যায় এডিথ ওকে কি হুমকি দিয়েছিল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব্রিজ লক্ষ্য করে ছুটল সে। এক দৌড়ে ব্রিজ পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল। হঠাৎ দেখল ম্যাবেল এগিয়ে আসছে ওর দিকে। কিন্তু একি সত্যিই ম্যাবেল নাকি ম্যাবেলের পোশাকে সেই প্রেতিনী? ভয়ে আর উত্তেজনায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল আর্থার। ম্যাবেল

একেবারে কাছে আসার পর নিশ্চিন্ত হলো, না, এ তার প্রেমিকাই।

'খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছিলে, তাই না, সোনা?' কোমল দুই বাহু দিয়ে আর্থারের ঘাড় জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল ম্যাবেল।

স্বস্তির বিরাট এক নিঃশ্বাস ফেলল আর্থার। ম্যাবেলের উষ্ণ হাতের স্পর্শ, গা থেকে ভেসে আসা সেই পরিচিত পারফিউমের গন্ধে যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু কাঁপা হাতে আস্তে করে ম্যাবেলের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল সে।

'কি হয়েছে, আর্থার? কাঁপছ কেন? দেরী হওয়ার জন্য খুব রেগে গেছ বুঝি? নাকি তোমাকে কেউ ভয় টয় দেখিয়েছে?' আর্থার নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। ম্যাবেলকে কড়া এক ধমক লাগাবে ভেবেছিল। চিন্তাটা বাদ দিয়ে যথাসম্ভব শান্ত গলায় জানতে চাইল এত দেরী হলো কেন ওর।

'দেরী হওয়ার জন্য আমি খুবই দুঃখিত, ডার্লিং।' বলল ম্যাবেল, 'আমার শাশুড়ী হঠাৎ করেই বিকালে এসে হাজির। এ জন্যই সময়মত আসতে পারিনি। থাকগে, ওসব কথা। এখন চলো তো আমাদের সেই প্রেমকুঞ্জে। আমি এখুনি তোমার মন ভাল করে দিচ্ছি।' এত মদির ভঙ্গীতে আমন্ত্রণ জানাল সে, অন্যসময় হলে এই সুরেলা কণ্ঠের আহ্বানে এতক্ষণে রক্তে বান ডাকত আর্থারের। কিন্তু এখন, এই রাতে, সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটায় আবার ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই শিউরে উঠল আর্থার। ম্যাবেলকে বলল, 'তারচেয়ে চলো মিউজিক হলে ঘুরে আসি।' আসলে এই মুহূর্তে সে মানুষের সরব সঙ্গ কামনা করছে একান্তভাবে। সেই সাথে কিছু মদ পেটে দিতে না পারলে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। মদ খেয়ে আজ রাতের ভয়াবহ ঘটনাটা ভুলে থাকতে চায় ও।

কিন্তু লোকে লোকারণ্য মিউজিক হলের মত জায়গায় যেতে কিছুতেই রাজি নয় ম্যাবেল। আর্থার তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে না দেখে খুব অভিমান হলো ওর। বলল আর্থার আসলে তাকে আর আগের মত ভালবাসে না। আর্থার বলল ম্যাবেল অযথাই তাকে ভুল বুঝছে। আসলে সে তাকেই ভালবাসে। কিন্তু ম্যাবেলের সেই একই গোঁ। কিছুতেই যাবে না মিউজিক হলে। খুব অভিমানী কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার যদি একান্তই ইচ্ছে হয় তাহলে তুমি একাই ওখানে যাও, আর্থার নোয়াকস। অনেক মেয়ে পাবে সেখানে। কিন্তু আমাকে আর পাবে না। কারণ আমার প্রতি যে তোমার আর কোনও আকর্ষণ নেই সেটা আমি খুব ভাল করেই বুঝতে পারছি।'

আর্থারের শরীর এখনও কাঁপছে। ম্যাবেলের অভিমান ওকে স্পর্শও করল না। সে ভাবল মেয়েরা রাগের মাথায় এমন অনেক কথাই বলে। পরে আবার সোহাগ করলে ভুলে যায়। আর ম্যাবেল যাই বলুক না কেন একটা ব্যাপার ঠিক যে এই জীবনে আর ওই ব্রিজের নিচে প্রেম করার জন্য আসবে না সে। ম্যাবেলকে আরেকবার অনুরোধ করতে যেতেই, 'তুমি আমার সাথে আর কথা বোলো না,' বলে ম্যাবেল রেগে মেগে একাই বাড়ির পথ ধরল। আর্থার 'আর কি করা' ভঙ্গীতে শ্রাগ করে হাঁটতে শুরু করল মিউজিক হলের দিকে।

কয়েক পেগ হুইস্কি পেটে পড়তেই এবং স্টেজে সুন্দরী, হাসিখুশি নায়িকার

সুমধুর কণ্ঠ আর শরীরের হিল্লোল দেখতে দেখতে আর্থার একটু আগের ঘটনা দ্রুত ভুলে যেতে লাগল। ওর মনে হতে লাগল ব্যাপারটা আসলে কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। মরে গিয়ে আবার ওভাবে কেউ হাজির হতে পারে নাকি?

আর্থার প্রায় নিশ্চিত ছিল পরদিন ম্যাবেল আবার তার সাথে দেখা করতে দোকানে আসবে। ম্যাবেল এল। কিন্তু একা নয়। তার সাথে আরেক লোক। আর্থারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল সে। যেন চেনেই না। ম্যাবেলের এই আচরণে আর্থার মনে মনে খুব রেগে গেল। ঠিক আছে, এভাবে যদি তুমি ডাঁট মারো আমিও ডাঁট দেখাতে জানি। ভাবল সে। সিদ্ধান্ত নিল শিগ্গিরই অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এমন কেউ যে ম্যাবেলের মত ঢাকঢাক গুড়গুড় স্বভাবের নয়।

ম্যাবেলের পর আর্থার যে রমণীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল তার নাম এলিস। অসাধারণ রূপবতী তাকে বলা যাবে না, কিন্তু অসুন্দরীও সে নয়। তার সবচে' বড় সম্পদ তন্বী দেহখানা আর ভালবাসায় ভরাট অকৃত্রিম হৃদয়। এলিসের স্বামী নেভীর ক্যাপ্টেন। বছরের বেশিরভাগ সময়ই তাকে বাইরে বাইরে থাকতে হয়। ফলে এলিসের সাথে আর্থারের সম্পর্ক দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। অবশেষে এলিস ওকে একদিন বাসায় আসার দাওয়াতও দিল। আর্থার সানন্দে গ্রহণ করল সেই আমন্ত্রণ। উল্লসিত মনে নির্দিষ্ট দিনটিতে হাজির হলো এলিসের বাড়িতে। আজ যে ওকে একান্ত করে পাবে সে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

এলিস আর্থারের জন্য খুব যত্ন করে ভাল ভাল সব খাবার তৈরি করেছে। তরল পানীয় হিসেবে রেখেছে জিন আর বীয়ার। এমনকি চমৎকার সিগারও জোগাড় করেছে। সিগারটা সম্ভবত ওর স্বামীর, ভাবল আর্থার। এলিস যত্ন করে আগুন ধরিয়ে দিল সিগারে। বড় একটা টান দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল আর্থার। মুখে মৃদু হাসি। যা যা আশা করেছে সব ঠিক সেভাবে ঘটছে দেখে তৃপ্তিবোধ করছে সে। এলিস ওর পাশেই বসা। আস্তে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে এলিসের দিকে। মৃদু আদর করতে করতে চুমু খেল। উঠে দাঁড়াল এলিস।

'তোমার সিগারটা শেষ করো, আর্থার। এই ফাঁকে আমি পোশাকটা বদলে ফেলি।' মোহিনী কণ্ঠে বলল এলিস, চোখ দুটো চকচক করছে। স্পষ্ট আমন্ত্রণ সেখানে। 'আমি যখন ডাকব, চলে এসো ওপরে।'

'তা আর বলতে, সোনামণি,' গদগদ কণ্ঠে বলল আর্থার।

'তবে বেশি দেরী কোরো না কিন্তু। বেশিক্ষণ অপেক্ষা সইতে পারব না আমি।' গালে টোল ফেলে নিতম্বে ঢেউ তুলে চলে গেল এলিস।

মিনিট দুই পর, এলিস আবার ফিরে এল। নতুন পোশাক পরনে। এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল! অবাক হলো আর্থার। কিন্তু অতশত ভাবার সময় কোথায় তার? সে তাড়াহুড়ো করে জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল কার্পেটের ওপর। কার্পেট পুড়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই, ও এখন প্রেমময় আলিঙ্গনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আর উত্তেজিত ছিল বলেই খেয়াল করেনি মুখ নিচু করে ভেতরে ঢুকেছে এলিস। এলিস রুমে ঢোকার সাথে সাথে একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেছে ভেতরে। হাত বাড়াল আর্থার। মুখ তুলল এলিস। আতঙ্কে জমে গেল সে। এলিস কোথায়–তার সামনে দাঁড়ানো এটা এডিথের ভূত। সাদা, মরা মুখটা বিকৃত ভঙ্গীতে

তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এডিথ আরও কাছে এগিয়ে এল, হাড্ডিসার বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওর ঘাড়। ঠাণ্ডা বরফের তীব্র ছ্যাঁকা খেল আর্থার। এডিথের প্রাণহীন চোখ দুটো যেন ওকে ঠাট্টা করছে। রক্তশূন্য ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পচা মাংসের বিকট গন্ধ বেরিয়ে এল।

এই সময় ওপর থেকে এলিসের নরম কণ্ঠ ভেসে এল, 'এখন তুমি ওপরে আসতে পারো, আর্থার ডার্লিং।' সাথে সাথে সামনের বিকট মূর্তিটা হাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু আর্থারের মনে হলো এখনও যেন হাড্ডিসার হাত দুটো তার ঘাড় জড়িয়ে আছে, কবর থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা আর পচা গন্ধটা সিগারের মিষ্টি গন্ধ ছাপিয়ে এখনও যেন নাকে এসে লাগছে।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল আর্থার। হলওয়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটল সে। মনেই পড়ল না দোতলায় তরবারির মত ধারাল শরীর নিয়ে একজন তীব্র কামনায় তার জন্য অপেক্ষা করছে। দরজায় ধাক্কাধাক্কির শব্দ শুনে এলিস নিচে এসে অবাক হয়ে দেখল দরজা খোলার জন্য পাগলের মত টানাটানি করছে আর্থার। ধড়াস করে পাল্লা দুটো খুলে যেতেই একলাফে সে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। এমন জোরে দৌড়াল যেন নরকের সব ক'টা পিশাচ একযোগে তাড়া করেছে ওকে।

এলিসের সঙ্গে আর্থারের সম্পর্ক ওখানেই শেষ। বলাবাহুল্য, পরবর্তী একটা সপ্তাহ আর্থার ঘর থেকেই বেরুল না। প্রতিটি সন্ধ্যা মদ খেয়ে ভুলে থাকতে চাইল ভৌতিক স্মৃতিটাকে। দিন দিন মেজাজ খিটখিটে হয়ে উঠল। খদ্দেরদের সাথেও এমন খারাপ ব্যবহার শুরু করল যে, তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বলাবলি শুরু করল শহরে যদি কসমেটিকসের আরেকটা দোকান থাকত তাহলে তারা ভুলেও আর্থার নোয়াকসের দোকানে পা দিত না। খুব দ্রুত খদ্দেরের সংখ্যা কমতে লাগল। কিন্তু সেদিকে আর্থারের কোনও হুঁশ নেই। সে সারাদিন বাড়িতে পড়ে থাকে আর মদ খায়। কিন্তু যেদিন তার চীফ অ্যাসিস্ট্যান্ট জানাল ব্যবসা প্রায় লাটে ওঠার জোগাড়, আর্থারের চৈতন্যোদয় হলো। বুঝল কিছু একটা করা দরকার। নইলে এভাবে চলতে থাকলে নিজেই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত নিল ব্যবসা বিক্রি করে দিয়ে লন্ডন চলে যাবে। ওখানে নিশ্চয়ই এডিথের প্রেতাত্মা তাকে তাড়া করবে না। লন্ডনে সে আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করবে। বড়দিনের সময় আর্থার ওর ব্যবসাপাতি সব বিক্রি করে লন্ডন চলে এল। চেয়ারিং ক্রস স্টেশনের কাছে ছোট একটা হোটেলে উঠল কিছুদিনের জন্য। বড়দিন এখানে কোনও ঝামেলা ছাড়াই গেল। কারণ হোটেলে যে সব মহিলা ছিল এদের কারও বয়সই চল্লিশের নিচে নয়। আর আর্থার তাদের প্রতি কোনও আগ্রহও অনুভব করেনি। দিনগুলো ওর কাটল রুমে বসে মদ গিলে।

ক্রিসমাসের ছুটি শেষ হওয়ার পর ব্যবসা শুরু করার জন্য চেষ্টা শুরু করল আর্থার। ও চাইছিল নিউহার্স্টে যে ব্যবসা করত এখানেও ওরকম কিছু একটা করত। অনেক চেষ্টার পর সুযোগ মিলল। গ্রীন উইচ এলাকায় ব্যবসা ফেঁদে বসল আর্থার। ব্যবসা শুরু করতে পাই পয়সা পর্যন্ত ব্যয় হয়ে গেল। কিন্তু ভাগ্যটা ওর ভালই। দেখতে দেখতে এখানেও জমে উঠল ব্যবসা। পয়সাপাতি ভালই পেতে শুরু করল সে। ধীরে ধীরে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল ওর।

দোকানের কাজে সাহায্য করার জন্য দুটি মেয়েকে সহকারী হিসেবে রেখেছিল

আর্থার। এদের মধ্যে একজন, মেরী থম্পসনের প্রতি সে দুর্বলতা অনুভব করতে লাগল। রক্তের উন্মাদনা কি আর সহজে ঝিমিয়ে পড়ে? আর আর্থার নোয়াকসের মত পরস্ত্রী লোভী নারীসঙ্গ কামনায় ব্যাকুল লোক যে তার সুন্দরী সহকারিণীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে এ তো খুবই স্বাভাবিক। মেরী তার বাপ মায়ের সাথেই থাকে। কিন্তু আর্থারের দোকানে কাজ করতে হচ্ছে যুদ্ধে আহত পঙ্গু বাপের সংসার চালানোর জন্য।

আর্থার খুব শিগ্‌গিরই আবিষ্কার করল নাট্যকলা সম্বন্ধে তার তন্বী সহকারিণীর দারুণ দুর্বলতা রয়েছে। এই সুযোগটা কাজে লাগাল সে। তার বন্ধু মহল, যারা নাট্যচর্চা করে, তাদের ওখানে নিয়ে যেতে শুরু করল সে মেরীকে। নাট্যচর্চার ওপর বই কিনে দিল ওকে, পড়ে শোনাল। এমনকি নিজে প্রমোটরের ভূমিকাও পালন করতে লাগল। মেরীকে সে অভিনয় করার জন্য পোশাক-আশাক কিনে দিতে দ্বিধা করল না। মেরী স্বভাবতই তার চাকরিদাতার প্রতি হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা অনুভব করল। দেখতে দেখতে ওদের মধ্যে বন্ধুত্বের চেয়েও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠল। তরুণী মেরী বুঝতে পারল বিপত্নীক এই লোকটিকে কখন জানি সে অজান্তে ভালবেসে ফেলেছে। আর আর্থার মেরীর স্নিগ্ধ সাহচর্যে মদ খাওয়া ছেড়ে দিল আস্তে আস্তে। আবার জীবনটা আগের মত উপভোগ্য হয়ে উঠল তার কাছে।

এক রাতে আর্থারদের নাট্যদল 'লাল গোলায় খুন' নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে। দৃশ্যটা এরকম–মারিয়া নামের মেয়েটিকে তার প্রেমিক খুন করার জন্য লাল গোলায় নিয়ে এসেছে। আজকের রিহার্সালেও আগের মতই প্রমোটরের দায়িত্ব পালন করছে আর্থার। বিশাল হলরুমের গা ছমছমে পরিবেশের জন্য, নাকি দৃশ্যটার ভয়ঙ্করত্বের জন্য, ঠিক বলতে পারবে না আর্থার, কিন্তু উইংসের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রমোট করতে করতে এক সেকেন্ডের জন্য বই থেকে মুখ তুলে স্টেজের ম্লান আলোর দিকে তাকাতেই শরীর শিরশির করে উঠল তার। মনে হলো স্টেজে ওর মৃতা স্ত্রী সেই পৈশাচিক মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাথে সাথে ওর হাত কাঁপতে লাগল। কাঁপুনিটা এতই তীব্র যে বইটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। মেরী পাশেই দাঁড়ানো ছিল। তাড়াতাড়ি বইটা হাতে তুলে নিল সে।

ভয়ে ভয়ে আর্থার মেরীর দিকে ফিরল। এটা কি সত্যিই মেরী নাকি তার রূপ ধরে স্বয়ং এডিথ আবার এখানে এসেছে ওকে ভয় দেখাতে?

'কি হয়েছে, আর্থার? তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?' মেরী ফিসফিস করে বলল, 'মনে হচ্ছে যেন ঠাণ্ডায় জমে গেছ।'

আর্থার মেরীর প্রসারিত হাতটা চেপে ধরল দুহাতে। উষ্ণ, নরম হাত। এই হাত কোনও অশরীরীর হতে পারে না। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল এই ভেবে, নিশ্চয়ই চোখে ভ্রম দেখেছে। পা দুটো কাঁপছিল ওর। কাঁপুনি বন্ধ করার চেষ্টা করতে করতে মেরীকে বলল, সে ঠিকই আছে, চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু মন যে কিছুতেই মানে না। মৃতা স্ত্রীর আত্মা এই লন্ডনেও তাকে ধাওয়া করে এসেছে এই চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারল না আর্থার।

রিহার্সাল শেষ হয়ে গেল। মেরী জিদ ধরল আর্থারের সাথে সেও তার বাড়ি

যাবে তাকে পৌছে দিতে। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল এই অবস্থায় তার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন।

'তোমার এখন দুধ আর হুইস্কির একটা গরম ড্রিঙ্ক দরকার,' মেরী বলল ওকে, 'এবং আমি তোমার সাথে গিয়ে দেখতে চাই বিছানায় যাওয়ার আগে তুমি ওটা ঠিকঠিক খেয়েছ।'

অন্য সময় হলে আর্থার সহাস্যে মেরীর এই প্রস্তাবে রাজি হত। কিন্তু পরিস্থিতি এখন ভিন্ন। বরং আর্থার এখন মেরীকে কাটাতে পারলেই বাঁচে।

'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, গরম দুধ এবং হুইস্কি দুটোই খাব। তোমাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না, মেরী ডিয়ার। বলেছ এতেই আমি খুশি।'

কিন্তু মেরী ওকে একা ছাড়ল না। সঙ্গে এল। দরজা খুলে যখন মেরীকে ভেতরে যেতে বলছে, আর্থার চকিতে একবার ভীত দৃষ্টিতে পেছন ফিরে তাকাল। দোতলায় উঠে এল ওরা। হাফ-ল্যান্ডিংয়ে টিমটিমে বাতি জ্বলছে। আর্থার বান্ধবীকে নিয়ে ওর লিভিংরুমে ঢুকল। দ্রুত হাতে টেবিল ল্যাম্প এবং ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা বাতি দুটো জ্বেলে দিল। তড়িঘড়ি করে গ্যাসের চুলোয় আগুন ধরিয়ে দুধের পাত্রটা একটানে বের করল শেলফ থেকে। ওটাতে খানিকটা দুধ ঢেলে বসিয়ে দিল চুলোর ওপর।

মেরী ওর ব্যস্ততা দেখে মনে মনে হাসছিল। কাজ করতে আর্থার এতই ব্যস্ত যে ওকে চুমু খেতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। অথচ এটা অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কারণ এর আগে ওরা যখনই একত্রিত হয়েছে, আর্থার সবার আগে চুম্বন পর্বটি সেরে নিতে ভোলেনি।

'আমি কিন্তু তোমার মত ঠাণ্ডা বাধাইনি, ডার্লিং।' মদালসা কণ্ঠে বলতে বলতে মেরী আর্থারের হাত দুটো টেনে নিয়ে নিজের কোমরে রাখল। মুখ উঁচু করল। ফাঁক হয়ে গেছে কমলা কোয়ার মত অধর। চুম্বনের প্রত্যাশায় অধীর। আর্থারের এই আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে উপায় কি? দুজোড়া ঠোঁট মিলেমিশে এক হয়ে গেল, হয়েই থাকল। হঠাৎ দুধ উপচে পড়ার শব্দ শুনে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে ফিরে এল আর্থার। তাড়াতাড়ি বিচ্ছিন্ন হলো মেরীর কোমল আলিঙ্গন থেকে। কাপড় দিয়ে চুলোর গায়ে উপচে পড়া দুধ মুছছে, এমন সময় শুনল নিচের দরজায় ধড়াম ধড়াম শব্দ হচ্ছে। মেরীও শব্দটা শুনল। 'নিচে গিয়ে দরজাটা ভাল করে লাগিয়ে এসো, ডার্লিং, তুমি নিশ্চয়ই ওটা লাগাতে ভুলে গেছ।' বলল সে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল আর্থার। হঠাৎ অনুভব করল ঘরের ভেতরে যেন একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে গেছে। সেই হাওয়া ওর শরীরটাকেও নাড়া দিয়ে গেল। ওর খুব ভাল করেই মনে আছে ওরা যখন ভেতরে ঢুকেছে তখন দরজাটা বন্ধ করেই এসেছে। কিন্তু মেরীকে মুখ ফুটে বলতে পারল না বাইরের অন্ধকারে যেতে সে ভয় পাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে কারণ সে ভাল করেই জানে নিচে গেলে কাকে দেখতে পাবে। যা থাকে কপালে, কিন্তু প্রেমিকার কাছে কাপুরুষ সাজব না ভেবে দৌড়ে নিচে নেমে এল আর্থার। দরজা বন্ধই আছে। কাঁপা হাতে হুড়কো লাগিয়ে দিল সে এবার। আর তখুনি সেই বিকট পচা গন্ধটা নাকে ভেসে এল। যেন কবর থেকে উঠে এসেছে। প্রচণ্ড ভয়ে কেঁপে উঠল আর্থার, ঘুরল। জানে কাকে দেখতে পাবে। দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর পথ রোধ

করে। সবুজ একটা আলো ঠিকরে আসছে তার অন্ধকার চোখের গর্ত থেকে। গালের মাংস পচে খসে পড়েছে। মুখের অর্ধেকটা নেই, বেরিয়ে পড়েছে চোয়াল, বীভৎস ভঙ্গীতে হাসছে সে। হাড্ডিসার হাত দুটো দিয়ে সে আর্থারের গলা জড়িয়ে ধরল। বাধ্য করল তার চোখহীন অন্ধকার গর্তের দিকে তাকাতে। যেন অভিশাপ দিচ্ছে। তীব্র আতঙ্কে শরীর অবশ হয়ে এল আর্থারের।

হঠাৎ মেরী ওপর থেকে ওর নাম ধরে ডাকল। পৈশাচিক মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল সাথে সাথে। ভয়ানক আতঙ্কে স্তব্ধ আর্থার টলতে টলতে উঠে এল ওপরে। মেরী ওর চেহারা দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। আর্থারের মুখ কাগজের মত সাদা। শরীর কাঁপছে থরথর করে।

আর্থার স্পষ্ট বুঝতে পারছে এডিথের প্রেতাত্মার কবল থেকে মুক্তির একটাই পথ–এই মুহূর্তে মেরীর সান্নিধ্য ত্যাগ করা। কিন্তু মেরী ওকে ছাড়তেই চাইছে না। বরং ওকে যত্ন করে আগুনের সামনে বসাল, গরম দুধ আর হুইস্কি খাইয়ে দিল মমতাভরে। আর্থার ঢক ঢক করে পানীয় দুটো গিলল। মেরী বোতলে গরম পানি ভরতে ভরতে বলল, 'আসলে খুব বেশি ঠাণ্ডা লেগেই তোমার এই অবস্থা হয়েছে, আর্থার ডিয়ার। কাল তোমার সারাদিন বিশ্রাম নেয়া উচিত। দোকানের কাজকাম আমরা দুজনেই দিব্যি চালিয়ে নিতে পারব। আমি তোমাকে কালকেও দেখতে আসব।'

মেরীর কথা শুনে আর্থারের টেনশন বাড়ল আরেক দফা। এডিথ এই ব্যাপারটাকে মেনে নেবে না কিছুতেই। মেরীকে যদি সে ত্যাগ না করে সেই পিশাচিনী ফিরে আসবে আবার। মেরীর সাথে সম্পর্ক চুকিয়েই ফেলতে হবে ওকে। এছাড়া কোনও পথ নেই। কিন্তু নিজেকে এত ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগল যে মেরীকে চলে যাওয়ার কথা বলার শক্তিও পেল না।

মেরী অনেকক্ষণ বকবক করে অবশেষে বিদায় হলো। আর্থার বিছানায় শুয়ে চেষ্টা করল ঘুমাতে। কিন্তু দুঃস্বপ্ন তাড়া করল ওকে ঘুমের মধ্যে। স্বপ্নে দেখল ওর মৃতা স্ত্রী আবার ফিরে এসেছে সেই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা আর পৈশাচিক রূপ নিয়ে। তার হাড্ডিসার হাতদুটো বুকে রেখে চাপ দিচ্ছে, ক্রমশ বাড়ছে সেই চাপ। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আর্থারের। চেষ্টা করছে ঘুম থেকে জেগে উঠতে। কিন্তু পারছে না। সেই ভয়ঙ্কর হাতের দানবীয় চাপ আরও বেড়ে চলছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আর্থারের। তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল সে। তারপরই ঘুম ভেঙে গেল।

পরদিন দোকানে ঢুকেই মেরীকে সোজা জবাব দিয়ে দিল আর্থার। 'তোমার ওই নাট্যচর্চার ব্যাপারটা আমাকে খুব বিরক্ত করে তুলেছে, মেরী। আমি এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি চাই। চাই আরও স্বাধীনতা। আমার এখন পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গ দরকার। তোমার সঙ্গ আমার কাছে ইদানীং স্রেফ ন্যাকামি মনে হচ্ছে। আমি এখন থেকে বন্ধুদের সাথে মদ খেয়ে মাতাল হব, গল্পগুজবে মেতে উঠব। তোমার সাথে নাটক করে এই ক্ষুদ্র জীবনটাকে আর একঘেয়ে করে তুলতে চাই না। জীবনটা আমি ইচ্ছেমত উপভোগ করব। তোমার যদি এখন ইচ্ছে হয় আমার দোকানে থাকতে পারো। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক এখন থেকে শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য কিছু নয়।' আর্থার এক নিঃশ্বাসে গড়গড় করে

কথাগুলো বলে গেল। অপমানে, দুঃখে মেরীর চোখে জল এল। দৃশ্যটা দেখে আর্থারের নিজের কাছেই খুব খারাপ লাগল। কিন্তু এছাড়া ওর আর কিইবা করার ছিল? মেরীর সাথে এভাবে খারাপ ব্যবহার না করলে সে তাকে ত্যাগ করবে না, বাধ্য হয়ে এই কর্কশ পথটা বেছে নিতে হয়েছে ওকে। কারণ এখন এডিথের পালা। এডিথ জিততে শুরু করেছে। মৃত্যুর আগের সেই হুমকি এভাবে সে কাজে লাগাবে স্বপ্নেও ভাবেনি আর্থার। এই বিভীষিকা থেকে বুঝি এ জীবনে রক্ষা পাবে না সে।

মেরীর সাথে খারাপ ব্যবহার করার পর থেকে বিবেকের দংশনে জ্বলছে আর্থার। কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না। মেরী এদিকে তার ব্যবহারে ভয়ানক মর্মাহত হয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ওর জায়গায় গিলবার্ট নামে এক লোক এসেছে। কিন্তু মেরীর শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়। বসের মন জয় করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো সে। আর আর্থার মেরীকে ভুলে থাকার জন্যই যেন আবার মদ খেতে শুরু করল। ব্যবসা সম্পর্কে দারুণ উদাসীন হয়ে উঠল। আবার আগের মত ব্যবসার বারোটা বাজতে শুরু করল। কিন্তু আর্থারের সেদিকে কোনও নজর নেই। এডিথের ভূত এখন আর তাকে তাড়া করে ফেরে না বটে, কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান আর অনিয়মিত খাওয়া দাওয়ার ফলে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করল দ্রুত।

এক রোববার সকালে ঘুম ভাঙার পর আর্থারের ফেলে আসা সাসেক্স টাউনের জন্য মন খুব কেমন করতে লাগল। কতদিন সে নিজের বাড়িতে যায় না। খুব ব্যাকুল হয়ে উঠল সে বাড়ি যাওয়ার জন্য। সিদ্ধান্ত নিল আজকেই যাবে।

সন্ধ্যার সময় পৌঁছুল সে বাড়িতে। অত্যন্ত রোগা আর্থারকে চিনতে পারছিল না কেউ। বুকের মধ্যে দারুণ ব্যথা চেপে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল সে। ঘুরতে ঘুরতে চার্চে কখন চলে এসেছে নিজেও জানে না।

একটি মাত্র আলো মিটমিট করে জ্বলছে ভেতরে। একটি মেয়ে বসা ওখানে। সে ঘুরল। আর্থার তাকে দেখে চমকে উঠল। এ যে এডিথ! কিন্তু এ সেই তরুণী এডিথ, যার সাথে আর্থারের বিশ বছর আগে এই জায়গাতেই প্রথম দেখা হয়েছিল। এডিথ ওকে দেখে মধুর হাসল। হাতছানি দিয়ে ডাকল। কি যে হলো আর্থারের, মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেল এডিথের দিকে। এডিথ হাঁটতে শুরু করল হালকা পায়ে। সম্মোহিতের মত তাকে অনুসরণ করে চলল আর্থার।

হাঁটতে হাঁটতে ভেজা একটা কবরের পাশে এসে দাঁড়াল এডিথ। হাত তুলে আহ্বান করল আর্থারকে। তীব্র তৃষ্ণা বুকে নিয়ে সেই আহ্বানে সাড়া দিল আর্থার। শিশু যেন মায়ের কোলে আশ্রয় নিচ্ছে এইভাবে সে সেঁধিয়ে গেল এডিথের বুকের ভেতর। এডিথ কোমল বাহু দিয়ে ওকে পেঁচিয়ে ধরল। এবং তখুনি ওর চেহারার পরিবর্তন শুরু হলো। আস্তে আস্তে তরুণী এডিথের লাবণ্য মুছে গিয়ে চেহারাটা বীভৎস হয়ে উঠল। সেই আগের পৈশাচিক চেহারায় রূপান্তরিত হলো এডিথ। আপেল রাঙা গালের মাংস খসে গিয়ে সাদা হাড় বেরিয়ে পড়ল, মায়াবী চোখ দুটো গলে গিয়ে মণিহীন দুটো গর্ত ধক ধক করে উঠল। মুখ থেকে বমি ওঠা পচা গন্ধটা ভকভক করে বেরিয়ে আসছে। আর্থারের হৃৎপিণ্ড খাঁচার সাথে বাড়ি খেতে শুরু করল। মনে হচ্ছে ওর গলা যেন চেপে বসছে, শ্বাস নিতে পারছে না। প্রাণপণে মনে করতে চাইল এটাও একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু এটা কোনও দুঃস্বপ্ন নয়। আর্থার স্পষ্ট

অনুভব করছে মুখের ওপর বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। হাড্ডিসার হাতদুটো যেন অজগরের মরণ পাক। শ্বাসরোধ করে ফেলছে ওর। দুনিয়া আঁধার হয়ে আসছে দ্রুত। টের পাচ্ছে এডিথ ওকে নিয়ে কবরের মধ্যে ঢুকছে…মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আর্থার আবছাভাবে দেখতে পেল এডিথ মাংসহীন মাড়ি বের করে হাসছে। বিজয়ের উৎকট উল্লাস সেই হাসিতে। অবশেষে জয়ী হতে চলেছে এডিথের প্রেতাত্মা। প্রতিশোধ নিচ্ছে সে। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ।

[মূল: ভিডা ডেরী'র 'ডেথ টেকস ভেনজেন্স']

চোখ

ওয়াহিদ হাসিব আর দশটা সাধারণ ছেলের মত নয়। তার মাথাটা বিরাট, শরীরটা ছোট এবং একটা পা খোঁড়া। কথা বলে সে জড়িয়ে, আধো গলায়, উচ্চারণ অস্পষ্ট। বিশ্রী চেহারার মতই তার ব্যবহার বাজে। সাংঘাতিক বদরাগী, নিষ্ঠুর, অন্যদের নির্যাতন করে মজা পায়। তাকে কেউ ভালবাসে না।

ওয়াহিদ হাসিবের বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেছেন তার সাথে মানিয়ে চলতে, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছেন না। ডাক্তার ওকে সাভারে, প্রতিবন্ধীদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু রাজি হননি হাসিবের বাবা-মা। একমাত্র সন্তান, হোক সে অ্যাবনরমাল, তাকে চোখের আড়াল করলে ওঁরা বাঁচবেন কি নিয়ে? আর হাসিব খুবই ছোট। সে-ও তার বাবা-মাকে ছাড়া থাকতে পারবে না।

ওয়াহিদ হাসিবের সাথে পাড়ার ছেলেরা মেশে না। ভীতু ছেলেগুলো ভয়ে দশ হাত দূরে সরে থাকে সব সময়। তবে দুষ্টুগুলো দূর থেকে ওকে ভেংচি কাটে। তখন বীভৎস চেহারাটাকে আরও বিকট করে চিৎকার করতে থাকে হাসিব। হাতের কাছে যা পায় তাই ছুঁড়ে মারে। দুষ্টু ছেলেগুলোর সাথে দৌড়ে পারবে না বলে নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকে। দুষ্টু ছেলেগুলো এতে আরও মজা পায়। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তারা হাসিবকে আরও ভেংচাতে থাকে। অবস্থা যখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেল, হাসিবের বাবা-মা বাড়ি বদল করে শহরতলির এক নির্জন প্রান্তে চলে এলেন। এখানে মাত্র একজন প্রতিবেশী পেলেন তাঁরা। এক বুড়ি, যার ছেলে বিদেশে থাকে। বুড়ির সময় কাটে নিজের পোষা বিড়ালটাকে নিয়ে। আর কাঁথা সেলাই করে।

নতুন বাড়িতে এসে হাসিবের নতুন একটা শখের কথা জানা গেল। সে সেলাই-ফোঁড়াইর দিকে ঝুঁকে পড়ল। হতে পারে বুড়িকে প্রায় সারাদিন কাঁথা সেলাই (বুড়ির ঘরে নাতনী আসবে) করতে দেখে এই শিল্প-কর্মটির প্রতি তার আকর্ষণ জন্মেছে। তবে বুড়িও হাসিবকে পছন্দ করে না। বুড়ির চোখে হাসিব বদ্ধ পাগল। আর পাগলরা কখন কি করে বসে তার ঠিক আছে? অবশ্য হাসিব বুড়ির বাড়িতে কখনও যায়নি, তার বাবা-মা-ই যেতে দেয়নি। হাসিবের বাইরে যাবার প্রয়োজনও হয় না। মা তাকে নানা রঙের পুঁতি কিনে দিয়েছিলেন। দেখা গেল সেই পুঁতি দিয়ে মহা উৎসাহে মালা বানাতে বসে গেছে হাসিব। মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অপরিণত হলেও হাসিবের হাতের কাজ চমৎকার। সে সুঁই-সুতো দিয়ে দারুণ মালা আর ব্রেসলেট তৈরি করতে লাগল আর এগুলো গলায় এবং হাতে পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে দেখল নিজেকে। বোঝাই যায় কাজটাতে সে অপরিসীম আনন্দ খুঁজে পেয়েছে।

হাসিবের উদ্ভট আনন্দের আরেকটি উৎস হলো মশা বা মাছি ধরে তাদের পাখা ছিঁড়ে ফেলা এবং সুযোগ পেলেই বুড়ির বিড়ালটার লেজে আগুন দেয়া। মাঝে মাঝে, অকারণে মনে খুব স্ফূর্তি থাকলে হাসিব তার মাকে নিজের তৈরি পুঁতির মালা

উপহার দেয়। মিসেস হাসান যতক্ষণ ছেলের সামনে থাকেন, মালা এবং ব্রেসলেট পরে থাকতে বাধ্য হন। না পরলে ভয়ঙ্কর রেগে যায় হাসিব, মনে হয় ফিট হয়ে যাবে।

এমন অস্বাভাবিক সন্তান নিয়ে জীবন যাপন, যত দিন যাচ্ছিল, সত্যি কঠিন হয়ে উঠছিল হাসান দম্পতির জন্য।

যতক্ষণ নিজের কাজের মাঝে ডুবে থাকে হাসিব, বিশ্বসংসার ভুলে যায় সে। কাজ বলতে মালা তৈরি ছাড়া বাড়ির লাগোয়া ছোট্ট বাগানে ফড়িং আর চড়ুইয়ের পেছনে ছোটাছুটি। এদের ধরতে পারলেই সে ডানা ভেঙে দেয়, পাখা ছিঁড়ে ফেলে, মুচড়ে দেয় ঘাড়। তখন চোখ চকচক করতে থাকে হাসিবের।

ওয়াহিদ হাসিবের নবম জন্মদিনে, রাতে ভূরিভোজের সময় তার পাতে তুলে দেয়া হলো রুই মাছের আস্ত একটা মুড়ো। এতদিন তাকে মাছের টুকরো দেয়া হয়েছে, কাঁটা বেছে দিয়েছেন মা। এবার রুইয়ের মাথাটা ওর প্লেটে তুলে দিয়ে মিসেস হাসান সস্নেহে বললেন, 'খাও, বাবা। পুরোটাই তোমার। দেখি কেমন কাঁটা বাছতে পারো।' হাসিবের বাবাও ওকে উৎসাহ দিলেন।

জীবনে এই প্রথম এত বড় একটা মাছের মাথা খাচ্ছে হাসিব। সে ধীরেসুস্থে কাঁটা বাছতে শুরু করল। মুড়োটা পুরো খেতে পারল না। পারার কথাও নয়, এঁটো ছড়িয়ে সে পুরো টেবিলটাকে নোংরা করে দিল। শত হলেও আজ ওর জন্মদিন। তাই বাবা-মা দৃশ্যটা দেখেও না দেখার ভান করলেন। পায়েস খাওয়ার সময় সারা মুখ ভরিয়ে ফেলল সে। তবু কিছু বললেন না ওঁরা। জানেন, কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। প্লেট, গ্লাস ভেঙে কিছু রাখবে না হাসিব। তাই ও যখন খাওয়া শেষ করে বেসিনে গেল মুখ ধুতে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে টেবিল পরিষ্কারে লেগে গেলেন মিসেস হাসান। মি. হাসান ঢুকলেন ড্রইংরুমে, টিভি দেখবেন।

একটু পরে খাবার ঘরে আবার এল হাসিব। তখনও টেবিল পুরোপুরি পরিষ্কার করে উঠতে পারেননি মিসেস হাসান। হাসিব অস্থির, চঞ্চল চোখে কি যেন খুঁজল এঁটো কাঁটার মধ্যে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলে মিসেস হাসান ঘরে গেলেন ফোন ধরতে। কথা বলা শেষ করে এসে দেখলেন চলে গেছে হাসিব।

সে রাতে ঘুমুতে যাবার আগে হাসিব তার মাকে আরেকটা পুঁতির মালা উপহার দিল। মিসেস হাসান হাসিমুখে মালাটা পরলেন। কিন্তু আঁশটে একটা গন্ধ পেতে মালাটার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন। রুই মাছের ম্লান বিবর্ণ চোখ দিয়ে এবার মালা গেঁথেছে হাসিব। মিসেস হাসানের গা গুলিয়ে উঠল, পেট ঠেলে বমি এল। অনেক কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক রাখলেন। কারণ তাঁর ছেলে মহা উৎসাহে 'থুন্দল (সুন্দর) চোখ! থুন্দল চোখ!' বলে চেঁচাতে শুরু করেছে। এখন মালা খুলতে গেলে হাসিব রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। হাসিব লাফাতে লাফাতে বলতে লাগল, 'তোমাকে খুব থুন্দল লাগছে, মা! খুব থুন্দল মালা, না?'

'হ্যাঁ, বাবা,' নাক চেপে বললেন মিসেস হাসান। 'তোমাকে ধন্যবাদ।'

পরবর্তী দুটো দিন তিনি মালাটা গলায় পরে থাকতে বাধ্য হলেন। মাছের চোখ দুটো পচেগলে যাবার পরে মুক্ত হলেন।

ওই ঘটনার পর থেকে চোখ দেখার নেশায় পেয়ে বসল হাসিবকে। সে

আয়নার সামনে স্থির হয়ে দেখে নিজের চোখ; বাবা-মা'র চোখের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করে বাগানের পাখিদের চোখ, প্রতিবেশীর বিড়ালটার চোখ, মাঠে চরে বেড়ানো গরুর চোখ; নতুন কাউকে দেখলে তার চোখের দিকেও নির্নিমেষ চেয়ে থাকে সে। মা তাকে শহরের দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে শো-কেসে রাখা প্লাস্টিকের মাছের চোখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল হাসিব। ফেরার পথে গুনগুন করতে লাগল, 'থুন্দল চোখ, থুন্দল চোখ।'

যত বড় হলো হাসিব, তার ক্রোধ এবং রাগের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেল। বাবা-মা ভয় পেয়ে গেলেন। আবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন ওকে। এখন রেগে গেলে আক্ষরিক অর্থেই দানব হয়ে ওঠে হাসিব। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার শরীরের অপুষ্টতা দূর না হলেও, পা-টা এখনও খুঁড়িয়ে চললেও, সে যখন রেগে ওঠে, হাসিবের বাবাও ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তাঁরা সবসময় আতঙ্কে থাকেন হাসিব কখন মস্ত কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে।

যেবার ১৬-তে পা দিল হাসিব, তার সীমাহীন অত্যাচার নিয়ে ডাক্তারের কাছে আবার অভিযোগ করলেন হাসান দম্পতি। তাঁরা বললেন, 'হাসিব এখন আর আমাদেরকেও সহ্য করতে পারছে না। জানি না কেন।'

ডাক্তার বললেন, 'আপনাদের আগেই বলেছিলাম হাসিবকে সাভারে পাঠিয়ে দিতে। শুনলেন না। টঙ্গিতে অ্যাবনরমালদের জন্য একটা প্রাইভেট হাসপাতাল খুলেছে আমার এক বন্ধু। ইচ্ছে করলে ওকে ওখানেও পাঠিয়ে দিতে পারেন। ওখানে হাসিবের মত আরও ছেলে আছে। সুচিকিৎসাই হবে আপনাদের সন্তানের।'

হাসিবের বাবা-মা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, মন্তব্য করলেন না কোন। শেষে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন টঙ্গির হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন তাঁরা হাসিবকে। না হলে অবস্থা আরও কত খারাপের দিকে মোড় নেবে বলা যায় না।

কিন্তু হাসিবকে কথাটা বলার পরে সে রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। ডজনখানেক কাপ-পিরিচ ভেঙে, মাকে খামচে মুখ থেকে রক্ত বের করে দেয়ার পরে একটু শান্ত হলো। মিসেস হাসান আঁচল দিয়ে রক্ত মুছে অনেক চেষ্টায় কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখলেন। বললেন, 'ওখানে তুমি অনেক খেলার সাথী পাবে। সবাই তোমার বয়সী।'

মি. হাসান উৎসাহ দিলেন, 'ওটা আসলে একধরনের স্কুল, হাসিব। আর সবাইকেই একটা সময় স্কুলে যেতে হয় জানাই আছে তোমার।'

হাসিব স্থির চোখে বাবা-মা-র দিকে তাকিয়ে থাকল। চুপচাপ কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর প্রশ্ন করল, 'ওলা (ওরা) আমাকে মালা বানাতে ডেবে (দেবে)?'

'অবশ্যই দেবে।' একসাথে বলে উঠলেন হাসান দম্পতি।

'কতগুলো ছেলে ওলা?' জিজ্ঞেস করল হাসিব।

'এই ধরো, চৌত্রিশ জন,' জবাব দিলেন মিসেস হাসান।

'সবাল (সবার) চোখ আসে (আছে)?' জানতে চাইল হাসিব।

'অবশ্যই আছে।'

এবার হাসি ফুটল হাসিবের মুখে। ওর হাসিমুখ দেখে মি. এবং মিসেস হাসানও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

হাসিবকে টঙ্গির মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হলো। টানা দু'বছর সে ওখানেই থাকল। এর মাঝে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার কথা শোনা গেল না। হাসিবের অনুপস্থিতিতে, হাসান দম্পতি অনুভব করলেন, তাঁরা নিজেদেরকে অনেকটা ভারমুক্ত ভাবতে পারছেন। এমন ভাবনা অবশ্য তাঁদের মাঝে খানিকটা অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলল। কিন্তু, বছর দুই পরে, হপ্তাখানেকের ছুটি পেয়ে হাসিব বাড়ি ফিরছে জেনে, বুক ঢিবঢিব শুরু হয়ে গেল মিসেস হাসানের। অজানা আশঙ্কায় সিঁটিয়ে থাকলেন তিনি। তাঁকে সিডেটিভ পর্যন্ত খেতে হলো। আর মি. হাসানের সিগারেটের নেশাটা হঠাৎ বেড়ে গেল।

ছুটি পেয়ে হাসিব বাড়ি ফিরল নতুন নীল সুট আর সবুজ স্যাটিনের টাই পরে। প্রকাণ্ড মাথার এলোমেলো চুলগুলো এখন সুবিন্যস্তভাবে আঁচড়ানো। তার উচ্চারণেরও আগের চেয়ে উন্নতি হয়েছে। সে বাড়ি এসেই রুই মাছের মুড়ো খেতে চাইল। বাবা-মাকে দেখে এবং নিজের পুরানো বাড়িতে ফিরে আসতে পেরে তাকে বেশ খুশি লাগছে।

হাসিবের ঘরটা মা আগেই ঝেড়েপুঁছে রেখেছিলেন। তবে পুঁতির মালা এবং ব্রেসলেটগুলো সরাতে সাহস পাননি। হাসিব সবগুলো মালা গলায় জড়িয়ে খেতে বসল। মাকে এবার আর একটাও মালা দিল না।

খাওয়ার সময় প্রায় কথাই বলল না হাসিব। বাবা-মা অবাকই হলেন ডাইনিং টেবিল থেকে হাসিবকে সোজা ঘুমাতে যেতে দেখে। কোন কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আছে হাসিব, ভাবলেন ওঁরা। তবে ছেলেকে ঘাঁটাতে সাহস করলেন না।

সেই রাতে, সবাই ঘুমে অচেতন, এমন সময় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল হাসিব। ঢুকল রান্নাঘরে। মাংস কাটার ধারাল চাপাতিটা নিয়ে মা-বাবার ঘরে ঢুকল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চাপাতির কোপে নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেলেন দু'জনেই। রক্তমাখা অস্ত্রটা নিয়ে প্রতিবেশী বুড়ির বাড়িতে হামলা চালাল হাসিব এরপর। এককোপে বুড়ির কল্লা নামিয়ে দিল। বুড়ির বিড়ালটারও একই দশা করল সে।

পরদিন সকালে পুলিশ এসে দেখল হাসিব তার ঘরের মেঝেতে বসে আছে শান্ত ভঙ্গিতে, মালা গাঁথছে তিনজন মৃত মানুষ আর বিড়ালটার চোখ দিয়ে।

[বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে]

বানরের মগজ

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাংলো থেকে বের হতেই গায়ে আগুনের হল্কা অনুভব করল রিচার্ড ক্লার্ক। সকাল এখন, কিন্তু মাত্র একশো গজের মত রাস্তা হেঁটেছে সে, সুতি শার্টটা ঘামে ভিজে সেঁটে গেল পিঠের সাথে। কপাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরছে, ভুরু ভিজিয়ে চোখে ঢুকছে। চোখ মিটমিট করছে ও, ডান হাতের চেটো দিয়ে একটু পর পর ভুরু থেকে মুছে ফেলছে ঘাম। বন্দরের দিকে মুখ তুলে চাইল ক্লার্ক। সিঙ্গাপুর জেটিতে ডজনখানেক সমুদ্রগামী জাহাজ নোঙর করা, নারকেলের শুকনো শাঁস আর রাবার লোডের অপেক্ষায় আছে। কাজটা শেষ হলে আবার বেরিয়ে পড়বে খোলা সাগরে।

এখানে আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন নেই। জানুয়ারি চলছে অথচ গরমটা জুন বা সেপ্টেম্বর মাসের মতই। মাসের পর মাস, দিনে বা রাতে তাপমাত্রা সব সময় নব্বুই ডিগ্রি ফারেনহাইটে স্থির হয়ে থাকছে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব বেশি। এমনকি মৌসুমী বৃষ্টিতেও গা পোড়ানো গরম কমছে না।

তবে রিচার্ড ক্লার্ক এ ধরনের আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে অনেক আগেই। গত ছ'বছরে এই দ্বীপ এবং তার বাসিন্দাদের হালহকিকত ভালই চেনা হয়ে গেছে তার। বরং বলা যায় এদের জীবনযাত্রার সাথে এতই অভ্যস্ত ক্লার্ক যে অন্য কোথাও গেলে সে হয়তো স্বস্তিই পাবে না। ককেশিয়ান এবং পূর্ব দেশীয় জনগোষ্ঠীর অনেকের সাথেই ওর হার্দিক সম্পর্ক। স্থানীয়দের সাথে সে মিশে যেতে পারে বন্ধুর মতই। আফিম সেবী, ক্ষয়াটে চেহারার চাইনিজ ধোপা বা আবলুস কালো ভারতীয় সুদখোর ব্যবসায়ী কিংবা সোনার দাঁত বাঁধানো মাড়োয়ারী শেঠ, সবাই তাকে চেনে, শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে। ক্লার্কও ওদের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানগুলোর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য করে না। ওদেরকে সে-ও বন্ধু হিসেবেই দেখে। ক্লার্কের ইউরোপীয় বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে এমন মন্তব্যও করেছে, ক্লার্ক আসলে নিজস্ব সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে ক্রমশ প্রাচ্যমুখী হয়ে উঠছে। তবে ক্লার্ক বিশ্বাস করে, প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ধারণ করতে হলে আরও অনেক কিছু জানতে হবে তাকে, শেখার এখনও বাকি আছে অনেক কিছুই। স্থানীয়দের সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তার আগ্রহ এত প্রবল যে ক্লার্ক ইংল্যান্ডে, নিজের বাড়ি ঘরের কথা প্রায় ভুলে যেতে বসেছে।

হলদে রঙের একটা মার্সিডিজ ট্যাক্সি সগর্জনে ওর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে ডাকল রিচার্ড ক্লার্ক। প্রায় সাথে সাথে ব্রেক কষল ড্রাইভার, টায়ারের সঙ্গে রাস্তার পিচের তীব্র ঘর্ষণে বিকট আওয়াজ উঠল, লাল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি ওর কাছ থেকে হাত বিশেক দূরে। গাড়ির জানালা দিয়ে হলদে রঙের একটা মুখ উঁকি দিল, মুচকি হাসছে।

'ট্যাক্সি, জন?'

পা বাড়াল ক্লার্ক, উঠে বসল পেছনের সিটে, ড্রাইভার বিপজ্জনকভাবে স্পীড বাড়াল, দড়াম করে সিটের সাথে বাড়ি খেল ও, পক্ষীরাজের গতিতে ছুটছে ট্যাক্সি। রাগ করল না ক্লার্ক। ট্যাক্সিঅলাদের এমন আচরণ গা সওয়া হয়ে গেছে।

'কোনদিকে, জন?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার। তার কাছে সবাই জন।

'পায়া লেবার এয়ারপোর্ট।'

'পাঁচ ডলার—কেমন?' তাকাল সে ক্লার্কের দিকে, মুখে চওড়া হাসি ফুটে উঠেছে। প্রত্যুত্তরে ক্লার্কও হাসল।

'ফাজলামো হচ্ছে, না? তুমি কি আমাকে বোকা ট্যুরিস্ট ঠাউরেছ? তিন ডলার দেব, এক পয়সাও বেশি নয়।'

'ঠিক আছে, জন—সাড়ে তিন ডলার।'

'বললাম তো, তিন ডলারের এক পয়সাও বেশি নয়।'

'ঠিক আছে, জন—আপনার কথাই রইল।' এখনও হাসছে ড্রাইভার, লোক চিনতে ভুল করেনি সে।

কোলিয়ার জেটি পার হয়ে গেল ওরা, দ্বীপের দূর প্রান্তের ব্যস্ত চায়না টাউনকেও পাশ কাটাল। এয়ারপোর্টে পৌঁছে ক্লার্ক ড্রাইভারকে তিন ডলার ছাড়া আরও পঞ্চাশ সেন্ট অতিরিক্ত বকশিশ দিল। তরুণ চাইনিজ ড্রাইভার খুশিতে হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাল, গুনগুন করতে করতে আগের চেয়েও বেশি স্পীডে গাড়ি ছোটাল। বার-এ ঢুকে ব্রান্ডির অর্ডার দিল ক্লার্ক, গ্লাসটা নিয়ে চলে এল অবজারভেশন ব্যালকনিতে, ওর মক্কেলের আগমনের অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে।

সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ওয়েন হ্যারিসন আর আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসবে। ক্লার্ক তার সাথে হ্যান্ডশেক করবে, নিরর্থক শুভেচ্ছা বিনিময় হবে, তার পরের তিনদিন ওর কাজ হবে আমেরিকানটাকে সিঙ্গাপুর ঘুরিয়ে দেখানো। এজন্য ক্লার্ক তিনশো ডলার পাবে। টাকার অঙ্কটাকে মোটেই মন্দ বলা যাবে না। কাজটা তেমন কঠিন নয় অথচ পারিশ্রমিক ভাল। এ ধরনের কাজ করে আরাম পায় ক্লার্ক। এ পর্যন্ত মক্কেল হিসেবে যত ট্যুরিস্ট ক্লার্কের কাছে এসেছে, এদেরকে হ্যান্ড্‌ল্‌ করতে কখনও তেমন বেগ পেতে হয়নি তাকে। বিশেষ করে আমেরিকানরা তো ইংরেজি জানা গাইড পেলে বর্তে যায়, থাক গাইডের ইংরেজি উচ্চারণে ভিনদেশী টান। এসব ট্যুরিস্টদের আসলে মনে মনে করুণাই করে ক্লার্ক। এদেরকে তার মনে হয় মাথা মোটা, যাদের কাজ সারাক্ষণ ক্যামেরায় হাবিজাবি ছবি তুলে রাখা, চোখের সামনে যা পড়ে তা-ই দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাওয়া। ক্লার্ক দেখেছে এরা অত্যন্ত স্বার্থপর স্বভাবের হয় গরীব মানুষদের প্রতি বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ নেই, পাশ্চাত্য এবং পুবের মাঝে সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রতিও এতটুকু আগ্রহ নেই। সবকিছুর প্রতি উন্নাসিক একটা ভাব, নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা। এদের কথা ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে ব্যালকনির রেলিং শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছিল ক্লার্ক, খেয়াল হতে ছেড়ে দিল। পাশ্চাত্যে জন্ম নিলেও মন-মানসিকতায় নিজেকে প্রাচ্যের ভাবধারায় গড়ে তুলছে বলেই হয়তো আমেরিকানদের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে। সে নিচে, এয়ার ফিল্ডের দিকে তাকাল। রুপোর মত চকচকে বিশাল এয়ারলাইনারটা স্থির হয়ে থাকা পাম গাছগুলোর মাথায় চক্কর দিচ্ছে। এসে গেছে

তার মক্কেলের উড়ুক্কু বাহন।

অ্যারাইভাল লাউঞ্জের বাইরে এসে দাঁড়াল রিচার্ড ক্লার্ক, আয়না বসানো জানালা দিয়ে দেখল কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশনের ভিড় ঠেলে যাত্রীদের স্রোত আসছে। নানা চেহারার, নানা আকৃতির প্রচুর মানুষ। তবে ভিড়ের মধ্যেও ওয়েন হ্যারিসনকে চিনে নিতে সমস্যা হলো না ক্লার্কের। পাসপোর্ট হাতে যাত্রীদের দঙ্গল থেকে সামান্য দূরে সরে দাঁড়িয়েছে সে; ফর্সা, থলথলে চেহারায় শিশুর সারল্য ফুটিয়ে তুলে ইতিমধ্যে ক্যামেরার শাটার টিপতে শুরু করেছে। নিজের কাছে যা-ই একটু অদ্ভুত বা আশ্চর্যের মনে হচ্ছে, খটাখট ছবি তুলে নিচ্ছে। এক মিনিটের ভেতরে সে তিনজন কাস্টমস অফিসার, চারটি ভাষায় লেখা 'ওয়েলকাম টু সিঙ্গাপুর' সাইন এবং নিজের প্লেনের বেশ কিছু যাত্রীর স্ন্যাপ নিয়ে নিল। ওয়েন হ্যারিসন বেশ লম্বা, মাংসল শরীর, মাথায় পাতলা চুল টাকের আভাস দিচ্ছে। তার পরনে পুরানো কিন্তু অত্যন্ত দামী গাঢ় নীল রঙের সুট, ঢোলা ট্রাউজার, পায়ের বাদামী জুতো জোড়া চকচক করছে। গলার উজ্জ্বল হলুদ রঙের টাইটা কড়া ভাঁজের সাদা শার্টের সাথে মন্দ লাগছে না। বোঝাই যায় দুধ-ঘি খাওয়া মানুষ, বেশ মালদার পার্টি, তবে করোনারি থ্রম্বসিসের শিকার হতেও বোধহয় বেশি দেরি নেই।

ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকল রিচার্ড ক্লার্ক নিজের জায়গায়। ফর্মালিটিজ সেরে, সুটকেস নিয়ে ওয়েন হ্যারিসন লাউঞ্জে এলে ওর দিকে এগিয়ে গেল সে। যথাসাধ্য চেষ্টা করল চেহারায় অমায়িক ভাবটা ধরে রাখতে।

'মি. হ্যারিসন?–আমি রিচার্ড ক্লার্ক,' নিজের পরিচয় দিল ও। 'আশাকরি যাত্রা পথে কোন বিঘ্ন ঘটেনি।' আমেরিকানটার দুঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল, যেন অনেক দিনের জানি দোস্তের সঙ্গে দেখা, এমন ভাব করে হাসি মুখে সে মোটা একটা হাত বাড়িয়ে দিল ক্লার্কের দিকে।

'আপনি তো, ভাই, খুব পাংচুয়াল দেখছি! একেবারে ঠিক ঠিক সময়ে এসে হাজির।' লোকটার হাতের নখ সুন্দরভাবে কাটা, লক্ষ করল ক্লার্ক। আর গলার স্বরটাও গমগমে, বিশাল দেহের সাথে মানানসই।

ক্লার্ককে বেশিক্ষণ হাত ঝাঁকাবার সুযোগ দিল না হ্যারিসন, চট করে ক্যামেরাটা তুলে ধরল মুখের সামনে, বিল্ডিং-এর কোণায় সারং-কেবায়া পরা সুন্দরী, মালয়ী মেয়েটি অদৃশ্য হবার আগেই তার একটি ছবি তুলে রাখল। তারপর বোকা বোকা ভাব নিয়ে ঘুরল ক্লার্কের দিকে, যেন সঠিক সময়ে তরুণীর ছবি নিতে পেরে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছে। লোকটার ঢং দেখে গা জ্বালা করে উঠল ক্লার্কের।

হ্যারিসন জরুরী গলায় বলল, 'বেশ, বেশ। এখন তবে যাত্রা শুরু করা যাক। মাত্র তিনদিন থাকব এখানে, তারপর ব্যবসার কাজে হংকং দৌড়াতে হবে। আশা করি, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনি আমাকে এমন সব জিনিস দেখাতে পারবেন, বাড়িতে যার গল্প করে বাহবা নিতে পারব।'

একটা ট্যাক্সি নিল ওরা শহরে ফেরার জন্য। সারা রাস্তা হ্যারিসন ক্রমাগত ক্যামেরার বোতাম টিপে গেল। বর্ণাঢ্য চাইনিজ শব মিছিলের ছবি তুলল সে, ভাবগম্ভীর বুদ্ধ মন্দির এমনকি ঘামে ভেজা শ্রমিকের চেহারাও বাদ গেল না। গুড উড হোটেলে পৌঁছার আগ পর্যন্ত ক্লিক ক্লিক চলতেই থাকল। হ্যারিসন ড্রাইভারকে

আমেরিকান ডলারে ভাড়া মেটালে লোকটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ক্লার্কের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করল। জবাবে ক্লার্কও একই কাজ করল। কোন মন্তব্য করল না। শত হলেও, ট্যাক্সির ড্রাইভার এবং তার কাজ একই।

ক্লার্কের ধারণা ছিল, হ্যারিসন লম্বা ভ্রমণের ধকল সামলাতে আজকের দিনটা অন্তত হোটেলে বিশ্রাম নেবে। কিন্তু কোথায় কি? ঘণ্টা তিনেক পরেই দেখা গেল সে ক্লার্ককে নিয়ে ব্লাকাং মাটি আইল্যান্ডে চলে এসেছে, সাম্পানে চড়ে মাছ ধরবে। কিন্তু মাছের বদলে তার বড়শিতে শুধু বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপ ধরা পড়ল। ক্লার্ক এবং সাম্পানের জেলে অনেক কষ্টে তাকে ডেকে সাপ ওঠানোর প্রবল ইচ্ছে থেকে নিবৃত্ত করল। শেষে হতাশ হয়ে হ্যারিসন গলুইতে চিৎ হয়ে শুয়ে বড় স্ট্র হ্যাট দিয়ে মুখ ঢেকে হেঁড়ে গলায় 'হোম অন দা রেঞ্জ' গাইতে লাগল। সূর্যের খরতাপ যে তার রংধনু রঙের শার্ট আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বারমুডা শর্টস পুড়িয়ে দিচ্ছে সেদিকে খেয়ালই নেই।

ওই দিন সন্ধ্যায় ওরা দু'জন ট্রোইকা রেস্টুরেন্টে পেট পুরে ডিনার সেরে ফিরে এল হোটেলে। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে প্ল্যান করতে বসল পরদিন কোথায় কোথায় যাবে।

'আগামীকাল,' ব্রান্ডির গ্লাসের মুখে আলতো ভাবে তর্জনী স্পর্শ করতে করতে ক্লার্ক বলল, 'আপনাকে থাইপুসামে নিয়ে যাব।'

'থাই পু···কি বললেন?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হ্যারিসন, আরেকটু হলেই সিগারটা গিলে ফেলেছিল।

ক্লার্ক মনে মনে ভাবল গাড়লটাকে সব কথা ব্যাখ্যা না করলে কিছুই বুঝবে না।

সে বলতে শুরু করল, 'সিঙ্গাপুরে বিশ লাখেরও বেশি মানুষের বাস। এদের বেশিরভাগ চাইনিজ। এদেরও আবার ভাগ আছে, যেমন–হোক্কাইন, টিও চিউ, ক্যান্টোনিজ, হাইনানিজ, হাক্কা ইত্যাদি। এরা নানা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। এছাড়া ভারতীয় সিলোনিজ এবং মালয়ীদের সংখ্যাও প্রচুর।

'থাইপুসাম হলো একটা হিন্দু উৎসবের নাম। ভারতীয় পূজারীরা রাস্তায় রাস্তায় এই উৎসবটি পালন করে তাদের প্রায়শ্চিত্তের নামে। কাল ওদের উৎসব মিছিল দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। ভয়ও পেতে পারেন। কারণ তারা প্রায়শ্চিত্ত করে শরীরে ধারাল সুঁই ফুটিয়ে, কখনও পায়ে স্রেফ নগ্ন পেরেকের স্যান্ডেল পরে। আবার কেউ কেউ তাদের নাক, জিভ, থুতনি বা শরীরের আলগা চামড়া বড়শি দিয়ে ফুঁড়ে রাখে।'

বিরতি দিয়ে চামড়ার আর্ম চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ক্লার্ক, লক্ষ করছে গল্প শুনে আমেরিকানটার কি প্রতিক্রিয়া হয়। বিরক্তি লাগল, কারণ হ্যারিসন ওর প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তবু সে বলে চলল।

'কাবাডি হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তের আরেক ধরন। জিনিসটা ভারী কাঠ দিয়ে তৈরি, তাতে ক্ষুরের মত ধারাল ব্লেড ঢোকানো। প্রায়শ্চিত্তকারীর দু'কাঁধে কাঠের ফ্রেমটা বসানো হয়।'

হ্যারিসন ক্লার্কের গল্প শুনছে না। তার সমস্ত মনোযোগ চাইনিজ ওয়েট্রেসের

দিকে। মেয়েটির পরনে চিওংসাম। সে মদের বোতল নিয়ে ওদের টেবিলে আসছে, প্রতিটি পা ফেলার সময় বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত ধবধবে সাদা উরু দেখা যাচ্ছে কাটা পোশাকটার আড়াল থেকে। হ্যারিসন ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মেয়েটি যেন ইচ্ছে করে আরও বেশি নিতম্ব দোলাল। মদের বোতল রেখে মেয়েটি চলে যাচ্ছে, ওর দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আমেরিকান। তরুণী দৃষ্টির আড়াল হলে ফিরল সে ক্লার্কের দিকে।

'চাইনিজদের সম্পর্কে যেসব গল্প শুনি সব কি সত্যি?' হেসে উঠে জানতে চাইল হ্যারিসন।

ক্লার্কের খুব রাগ হলো লোকটার ওপর। শালার আমেরিকান জাতটাই এমন! দাঁতে দাঁত চাপল সে। তবে চেহারা স্বাভাবিক করে বলতে লাগল, 'চাইনিজদের সম্পর্কে যে যাই বলুক না কেন, ওরা কিন্তু বেশ অদ্ভুত প্রজাতির মানুষ। ওদের সংস্কৃতি, রীতি-নীতিগুলোও ভারি অদ্ভুত।' আবার হেলান দিল সে চেয়ারে, অপেক্ষা করছে হ্যারিসন তার টোপটা গেলে কিনা। মুখের সামনে ধোঁয়ার মেঘ জমেছে, আমেরিকানটার চেহারা দেখা যাচ্ছিল না, সে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ধোঁয়া সরাল, এবার আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল, 'যেমন?' মাছ টোপ গিলেছে। ক্লার্ক প্রস্তুত হলো ওকে নিয়ে খেলতে।

'যেমন, কিছু চীনা সম্প্রদায়ের লোক সংক্ষিপ্তের মাথাটাকে খুব সুস্বাদু মনে করে। কাঁটা বাদ দিয়ে পুরো অংশটাই খেয়ে ফেলে, পাশ্চাত্যের মানুষদের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, নয় কি?'

এক পাশের ভুরু কপালের দিকে উঠে গেল হ্যারিসনের, ঠোঁটে শুকনো হাসি ফুটল, তবে কোন মন্তব্য করল না। ক্লার্ক তার গল্পটাকে আরও ফাঁপিয়ে তুলল।

'তারপর ধরুন, এখানে, মানে সিঙ্গাপুরে, এক শ্রেণীর চীনা আছে, এরা সবসময় অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু এরা এমন এক ধরনের উৎসব করে যা নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না।'

হ্যারিসন তার চেয়ারের এক কোণে কাত হয়ে বসেছিল, তার চেহারায় প্রবল আগ্রহের ভাব ফুটে উঠতে দেখে তৃপ্তি বোধ করল রিচার্ড ক্লার্ক। মনে মনে ভাবল, ব্যাটাকে বড় রকমের একটা ধাক্কা দিতে হবে।

সে আবার শুরু করল, 'এই চীনারা বিশ্বাস করে বানরের মগজ খেতে পারলে শুধু বুদ্ধি আর জ্ঞানই বাড়বে না, বৃদ্ধি পাবে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা, নিশ্চয়তা দেবে দীর্ঘ জীবনের। তবে মগজটা খেতে হবে জ্যান্ত বানরের মাথা থেকে, তাৎক্ষণিকভাবে, নইলে কাজ হবে না। ওরা করে কি, হতভাগ্য বানরটাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলে, তারপর মাথার খুলি ফাটিয়ে ভেতর থেকে মগজ বের করে এনে খায়। বানরটা মারা যাবার আগেই কাজটা করতে হয়। মানে যতক্ষণ জানোয়ারটা যন্ত্রণায় মোচড় খেতে থাকে, সেই সময়ের ভেতরে চীনারা খুবলে নেয় মগজ। সে দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। মগজ খুবলে নেয়ার সময় আহত বানরটা এমন ভয়ঙ্কর চিৎকার দিতে থাকে, এর চে' ভয়াবহ ব্যাপার আর হয় না।'

হ্যারিসনের চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

'এসব গল্প বলেই আপনি ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করেন, না? চোখে না দেখলে

আমি সত্যিই আপনার গল্প বিশ্বাস করব না। এ তো সাংঘাতিক অমানবিক কাণ্ড!'

হাসল ক্লার্ক। 'ব্যাপারটা মানবিক না অমানবিক সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে কোন্ পরিবেশে আপনি বড় হয়ে উঠেছেন তার ওপর। সত্যি বলতে কি, সবার মূল্যবোধও এক নয়। যারা এই কাজটা করে তাদের কাছে কিন্তু এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দু'জনে। হ্যারিসনের এখনও সন্দেহ দূর হচ্ছে না। সে ক্লার্কের গল্পটা নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। আবার যখন কথা বলতে শুরু করল, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল সে।

'তিনশো ডলার দেয়ার কথা ছিল আপনাকে।' হিপ-পকেটের পেট মোটা মানিব্যাগ থেকে এক তাড়া নোট বের করল সে, তিনশো ডলারের বেশিই হবে, টাকাটা টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল ক্লার্কের দিকে। 'আপনাকে অ্যাডভান্স দিলাম পুরোটাই। অতিরিক্ত আরও পঞ্চাশ ডলার রাখুন। আশা করি আমাকে স্পেশাল কিছু জিনিস দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

টাকাটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল রিচার্ড ক্লার্ক, সিদ্ধান্ত নিল 'স্পেশাল' কিছু জিনিস আমেরিকানটাকে দেখাবে সে। হ্যারিসন বিশেষ কিছু দেখার অধিকার রাখে। এমন কিছু যা সারা জীবন মনে থাকবে।

পরদিন সকালে একটা গাড়ি ভাড়া করে ক্লার্ক গুড উড হোটেলে চলে এল। হ্যারিসন যে জিনিস দেখতে চেয়েছে তার ব্যবস্থা সে করে এসেছে। গত রাতে, ক্লার্ক হোটেল থেকে চলে আসার পরে, হ্যারিসন নিজেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে রাতের শহরে বেরিয়ে পড়ে এবং এক প্রমোদবালাকে ভাড়া করে। লোকে চীনাদের সম্পর্কে যে গল্প বলে তা আদৌ সত্যি নয়, এই ব্যাপারটি হ্যারিসন আবিষ্কার করে ঠিকই, তবে যে জিনিসটি ওকে সবচে' অবাক করেছে তা হলো, মাত্র বিশ ডলারে সে মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছে মেয়েটির কাছ থেকে। তার রাতের অভিযানের গল্প শুনে ক্লার্ক মৃদু হাসল শুধু, মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করল না। তার মন পড়ে আছে অন্য জায়গায়। সে হ্যারিসনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সকালের বেশিরভাগ সময় কেটে গেল থাইপুসাম উৎসব দেখে। বলাই বাহুল্য, এই সময়ে এক মুহূর্তের জন্যেও হ্যারিসনের ক্যামেরা থেমে থাকেনি। উৎসাহ নিয়ে ছবি তুললেও তার চেহারা দেখে ক্লার্ক বুঝতে পারছিল আমেরিকানটা উৎসব দেখে খুব একটা মজা পাচ্ছে না। অথচ ক্লার্কের নিজের এই উৎসবটি খুবই পছন্দ। যতবার সে থাইপুসাম উৎসব দেখেছে ততবার মুগ্ধ বিস্ময়ে ভেবেছে ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলো কি করে এমন শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করছে। ওদের প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছে তার। এরকম মহান একটা ব্যাপারকে হ্যারিসন অবজ্ঞা করছে দেখে মনে মনে খুবই রুষ্ট হলো ক্লার্ক।

ওইদিন বিকেলে হ্যারিসনকে নিয়ে মাউন্ট ফেবারে উঠে দ্বীপ দেখাল ক্লার্ক, নিয়ে গেল টাইগার বাম গার্ডেনের ভৌতিক মূর্তিগুলোর কাছে, হাউস অভ জেড-এর নয়নাভিরাম সবুজ পৃথিবীও দেখাল। প্রতিটি জিনিস দেখানোর সময় সেগুলোর প্রাসঙ্গিক ইতিহাসও বর্ণনা করে চলল ক্লার্ক তার মক্কেলকে খুশি রাখতে।

রাতের বেলা রাগিস স্ট্রীটের একটি বার-এ ঢুকল ক্লার্ক হ্যারিসনকে নিয়ে।

বসল কাঠের বেঞ্চিতে। এটা কুখ্যাত একটা জায়গা। দুনিয়ার মাতাল, চোর, বেশ্যা, ভিক্ষুক, পকেটমার, ফেরিঅলা আর বিকৃত রুচি লোকদের বাস এখানে। এখানে পয়সা দিয়ে পাপ কেনা যায়, যে কাউকে ইচ্ছে করলেই করা যায় শয্যাসঙ্গিনী। এই অন্ধকার জগতে দেখার মত অনেক কিছু আছে। হ্যারিসন বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল রঙ মাখা একজোড়া বিচিত্র প্রাণীর দিকে। ওরা একদল ব্রিটিশ নাবিকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ক্লার্ক ঝাড়া বিশ মিনিট কসরতের পরে হ্যারিসনকে বোঝাতে সমর্থ হলো যে ওই মেয়েদুটো আসলে পুরুষ। একথা শুনে ওদের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল হ্যারিসন।

'আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে দেখাতে পারি,' ঠাণ্ডা বিয়ারের মগে চুমুক দিতে দিতে বলল ক্লার্ক, 'এ জায়গার সবচে' সুন্দরী মেয়েটিও আসলে পুরুষ।'

শুনে হ্যারিসনের সে কি হাসি! মদে ধরেছে ওকে। অতিরিক্ত মদ্য পানে অভ্যস্ত নয় সে। ঝোঁকের মাথায় তরুণ এক মালয়ীর সাথে জুয়ো খেলতে গিয়ে হেরে গেল। ক্লার্ক পাশে বসে রইল চুপচাপ। ফুরফুরে বাতাস বইছে। ম ম করছে মসলার ঘ্রাণ। নাক টানল ও। ভাল লাগে ক্লার্কের অতি সাধারণ এই জীবন যাত্রা। এখানে এলে ও যেন মানবতার গন্ধ খুঁজে পায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার পুরানো প্রসঙ্গটা টেনে আনল ক্লার্ক।

'আরও খানিকটা উত্তেজনার খোরাক পেতে চান?' জিজ্ঞেস করল সে হ্যারিসনকে।

'মানে?' জড়ানো গলায় প্রশ্ন করল আমেরিকান। লাল টকটকে হয়ে উঠেছে মুখ, নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখ। হাতে ধরা মদের পাত্রে চুমুক দিল। 'নীল ছবি দেখাবেন না?'

'না,' জবাব দিল ক্লার্ক।

অনেক কষ্টে চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল হ্যারিসন, হাসল। 'অঃ, সেই বানরের মগজ খাওয়ার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। যদি আপনার দেখার ইচ্ছে হয়,' বলল ক্লার্ক, দম বন্ধ করে রইল জবাবের অপেক্ষায়।

'বেশ! কখন?' জানতে চাইল হ্যারিসন।

'যেতে চাইলে এখনই।'

মিনিট দশেক পরে ওরা আলোকিত শহর পেছনে ফেলে যাত্রা শুরু করল অন্য আরেক জায়গার উদ্দেশে।

মেইন রোড ছেড়ে গাড়ি নেমে পড়ল এবড়োখেবড়ো এক রাস্তায়, দু'পাশে রাবার আর পাম গাছের সারি, মাঝখানে ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলল ওরা। নিকষ অন্ধকার চিরে দিচ্ছে হেডলাইটের আলো। মাঝে মাঝে সবুজ শস্য খেত দেখা গেল, গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড়ে পালাল ত্রস্ত ইঁদুর। মেঠো পথ ধরে চলতে প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগছে বলে স্পীড কমিয়ে দিয়েছে ক্লার্ক, কাছের ডোবা বা জলা থেকে ভেসে এল কোলা ব্যাঙের কোরাস। পেছনের সিটে দলা মোচড়া হয়ে পড়ে আছে হ্যারিসন। মেঘ গর্জনের মত নাক ডাকছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতেও ঘুম ভাঙছে না। ক্লার্ক চোখের

কোণ দিয়ে দেখতে পেল একটা বাদুড় উড়ে গেল পাশ দিয়ে, পান্না সবুজ রঙের একটা সাপ দ্রুত রাস্তা পার হলো।

মাইল দুয়েক রাস্তা ড্রাইভ করার পরে ক্লার্ক গাড়ি ঢোকাল ছোট্ট একটি গ্রামের ভেতরে। বেশ কিছু ছোট কুটির দিয়ে ঘেরা গ্রামটা। গাড়ি থেকে নামতে বুড়ো এক চীনা হাতে তেলের প্রদীপ নিয়ে ক্লার্কের দিকে এগিয়ে এল। প্রদীপটা উঁচু করে ধরল, আগন্তুককে চেনার চেষ্টা করছে। পরিচিত মানুষ দেখে তোবড়ানো গালে হাসির রেখা ফুটল। দপ দপ করে জ্বলছে প্রদীপ, তেল ফুরিয়ে এসেছে বোধহয়, বুড়োর লম্বা ছায়া পড়েছে মাটিতে, আলোতে ভৌতিক লাগছে চেহারাটা। বুড়োর হাসিতে উদ্ভাসিত মুখটা যেন একটা গুহা, সাকুল্যে একটা মাত্র দাঁত দেখা যাচ্ছে। সোনা দিয়ে বাঁধানো, বাকি সব শূন্য। লম্বা, কালো, বিনুনি করা চুল ঝুলছে থুতনির কাছে। অসংখ্য ভাঁজ আর রেখায় ভর্তি মুখটা চাষ করা জমির কথা মনে করিয়ে দিল, কোটরে ঢোকা কালো চোখ জোড়া ফাঁকা লাগছে। তবে সে যখন ঝুঁকে এসে গাড়িতে বাঁকা হয়ে শুয়ে থাকা হ্যারিসনকে দেখতে পেল, নিস্তেজ দৃষ্টিতে ঝিলিক দিল আলো।

'বেশ, বেশ, মি. ক্লার্ক। আপনি আমাদের জন্যে একজন দর্শনার্থী নিয়ে এসেছেন!'

বুড়োর খনখনে কণ্ঠ শুনে বা অন্য যে কোন কারণে হোক, ঘুম ভেঙে গেল হ্যারিসনের। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল সে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, ঝিমঝিম ভাবটা কাটছে না কিছুতেই। অনেক কসরত করে গাড়ির দরজা খুলে পা রাখল মাটিতে, সিধে হতেও রীতিমত হিমশিম খেতে হলো। শেষে খোলা দরজার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কোনমতে।

'আসল জায়গায় এসে পড়েছি নাকি?' আধ বোজা চোখে একবার চারপাশে দেখল হ্যারিসন, গলা থেকে কোলা ব্যাঙের ডাক বেরিয়েছে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ক্লার্ক। 'লিম চং আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাবে। আমি এখানে আছি। ওসব জিনিস আগেও দেখেছি। আর দেখতে চাই না।'

বিড়বিড় করে কি বলল হ্যারিসন বোঝা গেল না, বুড়ো চাইনিজকে অনুসরণ করল। কাছের একটা কুটিরের দিকে হাঁটছে লিম চং, তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে হ্যারিসনের। ঘরের ভেতর সে ঢুকতেও পারল না, তার আগেই মেঝের ওপর পড়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে।

জ্ঞান ফিরে পাবার পরে ওয়েন হ্যারিসন প্রথমেই নিজেকে ধিক্কার দিল কেন বোকার মত সে স্থানীয় চোলাই মদকে পাত্তা দিতে চায়নি। এগুলোর সাংঘাতিক তেজ বোঝাই যাচ্ছে। হ্যাংওভার কাটেনি এখনও। তালুটা ফেটে যেতে চাইছে। সে একটা হাত তুলে কপালটা চেপে ধরতে চাইল, পারল না। অজানা একটা ভয়ে গায়ে কাটা দিল। ভয়টাকে দূর করতে হ্যারিসন ভাবতে লাগল সে কোথায় এসেছে। মাথাটা কাজ করছে না ঠিকমত, আর চোখেও ভাল দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকারে ডুবে আছে ও, নিজের হাত-পা-ও ঠাহর হচ্ছে না। দোরগোড়ায় একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে বটে কিন্তু ওটার আয়ু প্রায় শেষ। কারণ একেবারে মিটমিটে আলো। হঠাৎ বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে উঠল হ্যারিসনের প্রদীপটাকে ওর দিকে

এগিয়ে আসতে দেখে। কেউ একজন প্রদীপটা হাতে তুলে নিয়েছে, যদিও দেখা যাচ্ছে না তাকে। অবশ্য একটু পরেই লোকটাকে দেখা গেল আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে। তেল দেয়া হয়েছে প্রদীপে। সেই বুড়ো লিম চং। বুড়ো সলতেটা উস্কে দিল, লাফিয়ে উঠল আগুন, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ কুঁচকে গেল হ্যারিসনের।

'এসব হচ্ছেটা কি?' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'ক্লার্ক কোথায়?'

লিম চং প্রদীপটাকে কাঠের একটা পায়ার ওপর রেখে দিল, তারপর এগিয়ে গেল হ্যারিসনের দিকে।

'মি. ক্লার্ক কাছে পিঠেই আছেন,' বলল সে নরম গলায়।

বুড়োর মুখ থেকে বিকট গন্ধ আসছে, মুখ ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল হ্যারিসন। পারল না। পরমুহূর্তে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ও। সাথে সাথে জমে গেল আতঙ্কে। ওকে ভারী একটা কাঠের চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে, মাথাটা ঢোকানো হয়েছে কাঠেরই তৈরি সাঁড়াশির মত একটা যন্ত্রের ভেতরে। যন্ত্রটা এমনভাবে ওর মাথা চেপে আছে, ডানে বা বাঁয়ে ফিরে তাকানোর উপায় নেই। একটা ঘোরের ভেতর এতক্ষণ ছিল বলে হ্যারিসন বুঝতে পারেনি আসলে সে কাঠের চেয়ারটাতে বন্দী হয়ে আছে। কিন্তু কেন? কারণটা বুঝতে না পারলেও অজানা সেই ভয়টা আবার ফিরে এল ওর মাঝে।

'তোমরা কি চাও আমরা কাছে? টাকা? তাহলে যা আছে নিয়ে নাও। দয়া করে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করে দাও!' চিৎকার করে উঠল হ্যারিসন, তবে কাজ হলো না কোন।

লিম চং ঘুরে ওর পেছনে চলে এল, মুখ খুলতে সেই পচা গন্ধটা নাকে ধাক্কা মারল হ্যারিসনের।

'না, স্যার। আপনার টাকার দরকার নেই আমাদের।'

একটু পরেই ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল হ্যারিসন। বুড়ো ক্ষুরের মত ধারাল কিছু একটা জিনিস বসিয়ে দিয়েছে ওর কপালের পাশে, হেয়ার লাইনের ঠিক নিচে। পাগলের মত ধস্তাধস্তি করল ও, লাভ হলো না কিছুই। বাঁধন ছিঁড়ল না। সাহায্যের আশায় চিৎকার করে ক্লার্ককে ডাকল সে, কিন্তু কেউ ওর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না। তবু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে হ্যারিসন।

ব্যথাটা অসহ্য। কোন কিছুর সাথে তুলনা দেয়া যায় না। হ্যারিসন টের পেল তার খুলি থেকে মাংসসহ চুল কেটে নেয়া হচ্ছে, ঘাড় এবং মুখ বেয়ে গরম রক্ত নামতে শুরু করল, চোখে আঠালো ধারাটা পড়তে আচ্ছন্ন হয়ে এল দৃষ্টি, লালচে কুয়াশার একটা আবরণ সৃষ্টি হলো সামনে। গলার সমস্ত রগ ফুলে উঠল হ্যারিসনের চিৎকার দিতে গিয়ে, বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের গায়ে দমাদম বাড়ি খাচ্ছে। ভীষণ আতঙ্ক ওকে প্রায় অবশ করে দিল। শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে যেন প্রতিবাদ করেও লাভ হবে না জেনে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে হ্যারিসনের। এখন আর চিৎকার করছে না, গোঁঙাচ্ছে অস্ফুটে আর ওকে দয়া করতে বলছে। শেষের দিকে কর্কশ, ফোঁপানোর মত আওয়াজ বের হতে লাগল গলা থেকে। শিশুর মত কাঁদতে শুরু করল হ্যারিসন, লবণাক্ত জলের সাথে রক্ত ঢুকে গেল মুখে।

উখা বা করাত ঘষার খরখরে শব্দ শুনতে পেল হ্যারিসন হঠাৎ। লিম চং জিনিসটা দিয়ে ওর খুলি কাটতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড ভয়ে কেঁপে উঠল হ্যারিসন, বিস্ফারিত চোখে দেখল ওর খুলির ছোট ছোট সাদা হাড় মেঝের ওপর ছিটকে পড়ছে।

গোঙাতে গোঙাতে চোখ তুলে চাইল হ্যারিসন। ওর সামনে হলদে রঙের ভৌতিক কয়েকটা মুখ, প্রদীপের কাঁপা আলোতে দেখা গেল শয়তানী হাসি সব ক'টার ঠোঁটে। ওদের ভেতরে রিচার্ড ক্লার্কও আছে। 'কেমন জব্দ!' নিঃশব্দে হেসে যেন বলছে ও। হ্যারিসন দেখল উপস্থিত দর্শকদের সবাই সাগ্রহে থাবার মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার খুলি লক্ষ্য করে। পরক্ষণে মাথায় ভয়ঙ্কর একটা ব্যথার অনুভূতি ওর সারা শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আঁধার হয়ে এল দুনিয়া, শেষ মুহূর্তে, বহু কষ্টে চোখ মেলে তাকাল হ্যারিসন। দেখল ওদের দু'জন রক্ত মাখা, স্পঞ্জের মত ধূসর একটা জিনিস মুখে পুরে কচমচ করে চিবুতে শুরু করেছে। তার পরপরই নিঃসীম আঁধার আবার গ্রাস করল হ্যারিসনকে।

ধীরে সুস্থে গাড়ি চালিয়ে নিজের বাংলোয় ফিরে এল রিচাড ক্লার্ক। এখন ভাল করেই জানে এই জীবনে আর ইংল্যান্ডে ফেরা হবে না তার। অবশ্য তাতে অসুবিধে নেই কোন। গাইডের ব্যবসাটা ভালই জমে উঠেছে, আর প্রাচ্যের রহস্যময়তা তাকে এমন মুগ্ধতায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে যে এখান থেকে কোথাও যাবার ইচ্ছেও তার নেই।

[মূল: জন আর্থারের গল্প]

পালাবার পথ নেই

কলিংবেলের শব্দে জেগে উঠল শ্যারন ফেয়ারচাইল্ড। চট করে চোখ চলে গেল বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা সুদৃশ্য ঘড়িটার দিকে। রাত একটা। কপালে ভাঁজ পড়ল ওর। এমন বৃষ্টির রাতে কে এল? ঘন ঘন, টুং টাং শব্দে আবার বেজে উঠল বেল। বাজতেই থাকল। অধৈর্য হয়ে কেউ টিপে ধরে রেখেছে ঘণ্টিটা। তাই অনবরত বেজেই চলেছে।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল শ্যারন, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি গলিয়ে ছুটল লিভিংরুমের দরজার দিকে। বিরক্তি নয়, অজানা আশঙ্কায় এবার ঢিবঢিবানি শুরু হয়ে গেছে বুকের ভেতর। গভীর রাতে দুটো জিনিস মানুষের ঘুম হারাম করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। একটা হলো টেলিফোন। (অবশ্য শ্যারনের ফোনটা দিন দুই হলো নষ্ট। এক্সচেঞ্জে খবর দেয়া হয়েছে। ওরা বলেছে শিগগিরি রিপেয়ারম্যান পাঠিয়ে দেবে।) অন্যটা কলিংবেল। দুটোই রাত গভীরে বেজে উঠলে গৃহস্থের মনে অশুভ চিন্তাটাই আগে আসে।

অবশ্য শ্যারনের আশঙ্কিত হয়ে ওঠার মত যথেষ্ট কারণ আছে। তার গুণধর ছোট ভাইটা মাঝে মাঝেই আকাম-কুকাম ঘটিয়ে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয় বড় বোনটাকে। শ্যারনের লেখালেখির বড্ড ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে সে ইদানীং। মারামারি, ড্রাগস বহন ইত্যাদি কারণে ইতিমধ্যে পুলিশ কেসও খেয়েছে দু'একটা। এবারও তেমন কিছু ঘটেনি তো? অথবা তারচেয়েও সিরিয়াস কিছু? যার কারণে এত রাতে পুলিশ এসেছে ওর বাড়িতে।

ভীরু, ত্রস্ত পায়ে লিভিংরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল শ্যারন। কলিংবেলের শব্দ থেমে গেছে। সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

ওধার থেকে কোন জবাব নেই।

এবার গলা একটু চড়াল শ্যারন, 'কাকে চাই?'

দরজার ওপাশে ফুঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করল কেউ। অস্পষ্ট, মেয়েলি গলায় বলল কিছু, ঠিক বুঝতে পারল না শ্যারন। তবে নারী কণ্ঠটা অবাক করে দিল ওকে। তাহলে কি পুলিশ নয়? কী-হোলে চোখ লাগাল। যাকে দেখল, তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলল শ্যারন, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ভেজা বর্ষাতি গায়ে, আলুথালু বেশের, ওর সমবয়েসী সুন্দরী তরুণীটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আরে, তুই!'

নবাগতা তরুণীর চোখে স্পষ্ট ভয়, শ্যারনকে দেখে সেখানে নির্জলা বিস্ময় ফুটে উঠল, তারপর ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'তুই এখানে! ঘরে চল। সব বলছি।' কেউ যেন ওকে তাড়া করেছে, একবার পেছন ফিরে চেয়ে শিউরে উঠল সে, শ্যারনকে প্রায় ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তার ইঙ্গিতে দরজার বল্টু লাগিয়ে দিল শ্যারন। তরুণী ততক্ষণে একটা সোফায় এলিয়ে পড়েছে, রীতিমত হাঁপাচ্ছে। উদ্বিগ্ন চেহারা

নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল শ্যারন। 'কি হয়েছে, লিনডা? এমন করছিস কেন? এত রাতে কোত্থেকে এলি? বাসা চিনলি কি করে?' পরপর অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসল সে।

'বলছি। সব বলছি।' হাত তুলে ওকে বাধা দিল লিন্ডা নামের মেয়েটি। 'আমাকে তুই বাঁচা, শ্যারন। ওরা আমাকে ধরে ফেলবে।'

'কারা ধরবে!'

'ওরা ড. জেসন স্লোনের লোক। আমার পিছু নিয়েছে। এ বাড়িতে ঢুকেছি জানতে পারলে নির্ঘাত আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'কি বলছিস মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল শ্যারন। 'তবে ভয় পাসনে। আমি যখন আছি, তোর কিছু হবে না।'

'না, না। তুই বুঝতে পারছিস না ওরা খুব ভয়ঙ্কর। ধরতে পারলে সর্বনাশ করে ছাড়বে।' বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল লিন্ডা।

পুরো ব্যাপারটা গোলমেলে লাগলেও ওকে আর চাপাচাপি করল না শ্যারন। তবে বুঝতে পারছিল সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে তার প্রিয় বান্ধবীর জীবনে। নইলে সহজে ভয় পাবার পাত্রী সে নয়। সে লিন্ডার পাশে বসে রইল ওকে জড়িয়ে ধরে। লিন্ডার ফোঁপানি থামলে যত্নের সাথে ভেজা রেইন কোটটা খুলে নিল গা থেকে, লিভিংরুমের ফায়ারপ্লেসের আগুনটা উস্কে দিয়ে গরম কফি বানিয়ে আনল। লিন্ডা দুই হাতে মগটাকে চেপে ধরল। অনেকক্ষণ চুপচাপ পান করল কফি। তারপর কথা বলতে শুরু করল। নিজের জীবনের রোমহর্ষক সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কখনও কখনও চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, কখনও অশ্রুসজল হলো, বেশিরভাগ সময় ভয়ের ছাপ ফুটল তারায়, শিউরে উঠল বারবার।

ঘটনার শুরু প্রায় বছর খানেক আগে। অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন মানুষ প্রফেসর গর্ডন ম্যাক্সওয়েলের ছোট এক রিসার্চ টীমের একজন সহযোগী ছিল লিন্ডা রেনল্ডস। দলের মোট সদস্য ছিল চারজন, বাকি দু'জন হলো জন বার্ন এবং মার্টিন সন্ডারস। ওদের গবেষণার বিষয় ছিল সর্দিজ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই। উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা ওষুধ আবিষ্কার করা যা খেলে অন্তত পাঁচ বছর মানুষ ঠাণ্ডাজনিত কোন অসুখে আক্রান্ত হবে না।

তবে, দুর্ভাগ্যবশত, অন্যান্য অনেক প্রজেক্টের মত লিন্ডাদের এই রিসার্চ কাজও বিঘ্নিত হচ্ছিল উপযুক্ত ফান্ডের অভাবে। সাফল্যের দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছিল, টাকা-পয়সার সমস্যা ততই প্রকট হয়ে উঠছিল। অবশেষে একটা আশার আলো দেখতে পায় সবাই, ভাবে এবার হয়তো সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। স্যার আর্থার ওয়েন ওদের সামনে জ্বেলে দেন সেই আলো।

স্যার আর্থার ওয়েন অত্যন্ত ধনী এবং ভাল মানুষ, সারা জীবন জনহিতকর নানা কাজে অর্থ বিলিয়ে গেছেন। মিডিয়ায় তাঁর পরিচিতি প্রচুর। তো এই ভদ্রলোক যখন ঘোষণা দিলেন, গবেষণাধর্মী কাজের জন্য হাফ মিলিয়ন পাউন্ড দান করবেন, তখন স্বভাবতঃই লিন্ডারা নেচে উঠেছিল আনন্দে। মেডিকেল রিসার্চের সাথে জড়িত যে কোন ব্যক্তি বা দল পুরস্কার পাবার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বোর্ড অভ এক্সপার্টরা প্রতিটি প্রজেক্ট বিশ্লেষণ করে দেখবেন কার বা কাদের রিসার্চ

সম্প্রতি সময়ে সবচে' বেশি এগিয়ে গেছে বা সমৃদ্ধি অর্জন করেছে।

নিজেদের ব্যাপারে প্রফেসর ম্যাক্সওয়েলের ছোট্ট দলটি যথেষ্ট আশাবাদী ছিল, তাছাড়া তাদের হারাবার তো কিছু ছিল না। তাই প্রতিযোগিতায় নাম লেখায় ওরা। প্রফেসর ম্যাক্সওয়েল অত্যন্ত চমৎকারভাবে তাঁদের গবেষণার বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। অবশেষে জানা গেল ওঁরাই জয়ী হয়েছেন।

ফলাফল ঘোষণার পরে অন্যান্য প্রতিযোগী দলগুলোর প্রায় সবাই প্রফেসরকে বিজয়ে অভিনন্দন জানাল শুধু একজন ছাড়া। এই লোকটির নাম জেসন স্লোন, বোর্ডের বিচারে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। তবে স্যার আর্থারের বোর্ডে হাজির হবার আগ পর্যন্ত তার সম্পর্কে মানুষ তেমন কিছু জানত না বললেই চলে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল মানুষকে হিমায়িত করে দীর্ঘ জীবনের সন্ধান দেয়া। স্লোন দাবি করছিল সে এ ব্যাপারে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে। বোর্ড যখন তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, সেইসময় গুজব রটে যায় স্লোনই প্রথম পুরস্কারটি পাচ্ছে।

স্যার আর্থারের বাড়িতে গর্ডন ম্যাক্সওয়েলের দলের সাফল্য ঘোষণার আয়োজন করা হয়। বক্তৃতায় বোর্ডের চেয়ারম্যান তাঁর কাছে আসা সকল প্রজেক্টের প্রশংসা করেন, স্লোনের নাম তিনি একাধিকবার উচ্চারণ করেন। তাকে দ্বিতীয় পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু জেসন স্লোন বোর্ডের সিদ্ধান্তে মোটেও খুশি হতে পারেনি। প্রফেসর ম্যাক্সওয়েল তাকে অভিনন্দিত করলেও সে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি, প্রফেসরের বাড়ানো হাত দেখেও না দেখার ভান করেছে। মাছের মত ঠাণ্ডা চোখে দেখছিল সে ওদেরকে, যেন চারজনের মূল্য যাচাই করছিল। সে বলছিল, বোর্ড আমার কাজের মূল্যায়ন না করে ভুলই করল।' বলে চলে গেল। জন বার্ন মন্তব্য করল, 'হেরে গিয়ে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

প্রফেসর ম্যাক্সওয়েল বললেন, 'শক্‌ড্ হওয়াই স্বাভাবিক। স্লোন ভেবেছিল প্রথম পুরস্কারটি সে-ই পাবে। হেরে গেলে ওর মত আমরাও ভেঙে পড়তাম।'

স্লোনকে নিয়ে ভাবনার অবকাশ ছিল না লিন্ডাদের। কারণ পরের হপ্তাতেই প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ে ওরা কাজে। নতুন প্রজেক্ট, দাতার নাম অনুসারে যেটার নাম দেয়া হয় এ.ডব্লিউ, ওটার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বেশ কিছু নতুন ইকুইপমেন্ট কেনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রফেসর বললেন তাঁকে হামবুর্গে যেতে হবে জিনিসগুলো কিনতে। বিশেষ প্লেন চার্টার করে জার্মানীতে যাবেন তিনি, ইকুইপমেন্ট পছন্দ হলে সাথে করে নিয়ে আসবেন।

'তোমাকে যেতে হবে না, লিন্ডা,' বললেন ম্যাক্সওয়েল। 'আর ক'দিন পরে তোমার বিয়ে। তুমি বরং বিয়ের কেনাকাটা শুরু করে দাও।'

জন বার্নের সাথে লিন্ডার এনগেজমেন্ট হয়ে গিয়েছিল আগেই, কিন্তু আর্থিক কারণে প্রজেক্টটা স্থগিত হয়ে পড়ায় বিয়ে করতে সাহস পাচ্ছিল না ওরা। এখন নতুনভাবে অর্থসংস্থান হওয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বিয়ের কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবে। আর সেটা হবে জন প্রফেসরের সাথে হামবুর্গ থেকে ফেরার পরপরই।

যাত্রার দিন ওদের বিদায় জানাতে লুটন এয়ারপোর্টে গেল লিন্ডা। তারপর খুশি মনে ফিরে এল বাবার বাড়িতে, বাকিংহামশায়ারে। এখানেই বিয়ের অনুষ্ঠানটা হবে।

জন বলেছিল হামবুর্গ পৌঁছার পরপরই ফোন করবে। কিন্তু ফোনের জন্য বৃথাই অপেক্ষা করল লিন্ডা। ভাবল হয়তো কাজের চাপে ভুলে গেছে জন ফোন করতে।

পরদিন সকালে লিন্ডার মা ওকে ঘুম থেকে জাগাল খবরটা দিতে। ঘুমের রেশ পুরোপুরি কাটেনি তখনও, তাই প্রথমে বুঝতে পারল না মা কি বলছে। কিন্তু মা'র কণ্ঠের জরুরী সুর ওকে জাগিয়ে তুলল পুরোপুরি। মা বলছিল, 'খবরে শুনলাম গত রাতে উত্তর সাগরে একটা হালকা প্লেন নিখোঁজ হয়ে গেছে। তোকে বিরক্ত করতে চাইনি। কিন্তু ভয় লাগছে জনের কিছু হলো কিনা ভেবে।'

খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা গেল লিন্ডার মা'র আশঙ্কাই সত্যি। জনদের প্লেনের সাথে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ যোগাযোগ ছিল ইংলিশ কোস্ট পার হবার আগ পর্যন্ত, তারপর হঠাৎ করেই 'নেই' হয়ে গেছে ওরা। সাগরে অভিযান চালানো হলো। প্লেন বা তার যাত্রীদের কোন হদিশ মিলল না। তিনদিন পরে লিন্ডারা প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল, এমন সময় খবর এল একটা এয়ারক্রাফটের ধ্বংসাবশেষের খোঁজ পাওয়া গেছে। ধ্বংস হওয়া প্লেনটার টুকরো-টাকরা তোলা হলো সাগর থেকে, বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হলেন এটা সেই নিখোঁজ প্লেনই। পরীক্ষায় জানা গেল, আকাশে কোন কারণে বিস্ফোরিত হয়েছে প্লেন। কিন্তু প্লেনের যাত্রীদের কোনই সন্ধান মিলল না।

একেবারেই ভেঙে পড়ল লিন্ডা তার ভবিষ্যৎ স্বামী এবং দু'জন প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে। কলেজের পড়া চুকিয়ে প্রফেসরের প্রজেক্টে ঢুকেছিল বিজ্ঞানী হিসেবে ক্যারিয়ার গড়বে বলে। সে স্বপ্ন এভাবে ভেঙে যাওয়াতে আরও মুষড়ে পড়ল। তবে বিশ্বাস হতে চাইছিল না তিন তিনটে মানুষ কোন চিহ্ন না রেখে এভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। পত্রিকাগুলোও এ নিয়ে বেশ লেখালেখি করছিল। লিন্ডার বার বার কেন যেন মনে হচ্ছিল মরেনি ওরা, বেঁচে আছে এখনও।

গভীর শোক আর ক্ষীণ প্রত্যাশা নিয়ে কেটে যাচ্ছিল একঘেয়ে দিনগুলো। চাকরি-বাকরি করতেও আর ইচ্ছে করছিল না। লিন্ডার বাবা বলল, 'তোকে কিছু করতে হবে না। তুই আমাদের সাথেই থেকে যা।' তাঁর একটা ছোট বাগান ছিল। ফলের ব্যবসা করতেন। মাঝে মাঝে সাহায্য করত লিন্ডা তাঁকে কাজে। মাস ছয়েক পরে একটা ঘটনা ঘটল।

সেদিন আপেল তুলছে লিন্ডা গাছ থেকে, মা বলল এক ভদ্রলোক এসেছে, দেখা করতে চায়। বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখে জেসন স্লোন অপেক্ষা করছে ওর জন্য। খুবই অবাক হয়ে গেল সে ওকে দেখে। 'আমাকে নিশ্চয়ই আশা করেননি, মিস রেনল্ডস,' লিন্ডার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসল সে। মনে হলো ওকে দেখে খুব খুশি হয়েছে।

'জ্বী,' নিজের অজান্তেই যেন হাতটা ধরে বলল লিন্ডা।

'স্যার আর্থার ওয়েনের বাড়িতে পরিচয় হয়েছিল। মনে আছে?'

'মনে আছে।' লোকটার সেদিনের ব্যবহারের কথা মনে পড়তে ইচ্ছে করেই রূঢ় স্বরে কথাটা বলল সে।

লিন্ডার মনোভাব টের পেয়ে দ্রুত বলে উঠল স্লোন, 'সেদিনের কথা ভাবলে আমি এখনও লজ্জায় মরে যাই, মিস রেনল্ডস। সত্যি ক্ষমার অযোগ্য একটা কাজ

করেছি সেদিন। এখন ক্ষমা চাওয়া ছাড়া কিইবা করার আছে আমার? আসলে ওয়েন অ্যাওয়ার্ড না পেয়ে এত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম যে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'

লোকটাকে তার আচরণের জন্য সত্যি খুব মর্মাহত মনে হচ্ছিল। লিন্ডা ভাবল লোকটার ব্যাপারে হয়তো ভুল ধারণাই পোষণ করেছে তারা।

'অনেক কাজ আমরা আবেগের বশে করে ফেলি যার জন্যে পরে আফসোস করতে হয়,' বলল সে। 'ভেবে কষ্ট লাগছে প্রফেসর ম্যাক্সওয়েল এবং তার সঙ্গীদের কাছে ক্ষমা চাইবার সুযোগ কোনদিন হবে না। খুবই করুণ অ্যাক্সিডেন্ট ছিল ওটা।'

'হ্যাঁ, তাই ছিল,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল লিন্ডা।

'আপনাকে আর অ্যাক্সিডেন্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই না। ব্যক্তিগতভাবেও আপনার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। কাগজে খবরটা পড়ে খুব কষ্ট পেয়েছি আমি। প্রফেসর ম্যাক্সওয়েলের মত প্রতিভাবান মানুষের এমন মৃত্যু কল্পনাও করা যায় না! যাকগে, আমি এসেছিলাম আপনার জন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে।'

'প্রস্তাব?' অবাক হয় লিন্ডা।

'জ্বী। আমি চাই আপনি আমার সাথে কাজ করবেন।'

'কিন্তু...'

'আগে ব্যাপারটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন,' বাধা দিল স্লোন। 'আসলে ওই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটার পর থেকে আপনাকে খুঁজছিলাম। আপনার ঠিকানা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লেগেছে। প্রফেসর ম্যাক্সওয়েলের ল্যাবরেটরির লোকজন আপনার ফ্ল্যাটের ঠিকানা শুধু জানত, বাড়ির কথা জানত না কেউ। অনেক কষ্টে আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি আপনি যদি আমার সাথে কাজ করতে রাজি হন তাহলে সেটা একদিক থেকে প্রফেসর ম্যাক্সওয়েলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই হবে। এটা তাঁর প্রজেক্ট না হলেও আমিও বিশ্ব মানবতার কল্যাণে কাজ করছি। তিনিও তাই করছিলেন। কাজেই আমার সাথে কাজ করলে আপনি মানবতার সেবাই করবেন।'

সামান্য বিরতি দিল সে, তারপর বলল, 'তাছাড়া আমার একজন ভাল অ্যাসিস্ট্যান্টও দরকার।'

'কিন্তু আপনি আমাকে কতটুকু চেনেন,' বলল লিন্ডা। 'আমি আপনার প্রয়োজনে না-ও আসতে পারি।'

'খুব ভাল এবং দক্ষ লোক ছাড়া যে প্রফেসর ম্যাক্সওয়েলের দলে সুযোগ পাওয়া যায় না তা আমার চেয়ে ভাল কে জানে? না, আপনাকে আমার সাথে কাজ করতে বলে কোন ভুল করিনি। আপনি রাজি কিনা তাই বলুন?'

লিন্ডাকে ইতস্তত করতে দেখে স্লোন বলল, 'বুঝতে পারছি এখনও শোক সামলে উঠতে পারেননি...'

'না, ঠিক তা নয়,' বলল সে।

'তাহলে এখানে বসে বসে আপনার প্রতিভার অপচয় করছেন কেন?'

জেসন স্লোনের মানুষকে পটানোর ক্ষমতা সাংঘাতিক। কিন্তু মনস্থির করতে পারছিল না লিন্ডা।

'ঠিক আছে,' বলল সে অবশেষে। 'এখনই কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। আগে

চলুন আমার কাজের জায়গায়। আমার ল্যাবরেটরি ঘুরিয়ে দেখাই আপনাকে। তারপর ঠিক করবেন কাজ করবেন কিনা।'

স্লোনের কথায় যুক্তি ছিল। তারপরও ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল লিন্ডা রেনল্ডসের। স্লোন আরও খানিকক্ষণ ঝোলাঝুলি করার পরে রাজি হয়ে গেল ওর ল্যাবরেটরি দেখতে। ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল সে।

দিন দুই পরে সন্ধ্যার ট্রেনে চড়ে লন্ডনে গেল লিন্ডা, সেখান থেকে গ্লাসগোতে। স্লোন নিজে ওকে রিসিভ করল কুইন স্ট্রীটে, তারপর গাড়ি নিয়ে ছুটল শহরের বাইরে, উত্তর দিকে। খটকা লাগল লিন্ডার, জানতে চাইল কোথায় যাচ্ছে। স্লোন বলল, তার ল্যাবরেটরি পাহাড়ের ওপরে। ব্যাখ্যা করল, টাকার অভাবে শহরে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

গ্লাসগো শহর পেছনে ফেলে ওরা ডানবার্টনশায়ার-এর পেঁচানো রাস্তা ধরে আরগিলের দিকে ছুটল। এদিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম নেই তেমন। টানা দুই ঘণ্টা পরে সরু একটা রাস্তায় ঢুকল, দু'পাশে বাঁধ, পাথর দিয়ে বাঁধানো। আরও মাইলখানেক এগোবার পরে একটা পাহাড় চোখে পড়ল, তার পরে ঘন জঙ্গলে ঢাকা উপত্যকা। দূর থেকে কালো রঙের, চৌকোনা চিমনি দেখল লিন্ডা, হালকা ধোঁয়ার রেখা ভেসে যাচ্ছে গাছের মাথার ওপর দিয়ে। জীবনের চিহ্নও নেই কোথাও। এমনকি পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। কেমন অস্বাভাবিক, থমথমে একটা পরিবেশ।

টাকা বাঁচাতে এবং কাজের সুবিধের জন্য জেসন স্লোন এমন একটা জায়গা বেছে নিলেও পরিবেশটা পছন্দ হলো না লিন্ডার। বড্ড বেশি নির্জন। গা ছমছম করে।

গাছের ভেতর থেকে পথ করে ওরা এগোল বাড়িটার দিকে, ক্রমে দৃশ্যমান হয়ে উঠল লম্বা, চৌকোনা, ধূসর রঙের চিমনিগুলো, পাথুরে দেয়াল, সেই সাথে ছোট ছোট জানালা। বাড়িটা এমন আদলে তৈরি, বাইরে থেকে মধ্য যুগের দুর্গ মনে হয়, একই সাথে ভিক্টোরিয়ান আমলের কারাগারের কথাও মনে করিয়ে দেয়।

'এটা একটা পুরানো হান্টিং লজ,' প্রকাণ্ড সদর দরজার দিকে যেতে যেতে ব্যাখ্যা করল স্লোন। 'তবে ভেতরটা বেশ আরামদায়ক।'

পাথুরে দেয়ালে পায়ের আওয়াজ তুলে বিশাল একটা ঘরে ঢুকল ওরা। ঘরটিতে সেগুন কাঠের আসবাব, বিমগুলো কালো রঙের, দেয়ালে ঝোলানো পেইন্টিংগুলো বিবর্ণ, ম্লান। খোলা ফায়ারপ্লেসে দাউ দাউ জ্বলছে আগুন, বাড়িটাকে আলখেল্লার মত জড়িয়ে থাকা হিম ঠাণ্ডা ভাব অনেকটা দূর হয়েছে উষ্ণ তাপে। কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করল লিন্ডা পাহাড় থেকে শিকার করে এ বাড়িতে ফিরে এসেছে তার বাসিন্দারা, তাদের কলহাস্যে মুখরিত প্রতিটি ঘর। কিন্তু কল্পনার চোখে কিছুই ফুটল না।

এক গ্লাস শেরি ঢেলে দিল স্লোন ওকে. নিজে নিল হুইস্কি। আগুনের সামনে বসে কথা বলল দু'জনে।

'ভাগ্যগুণে এ বাড়িটি পেয়ে গেছি আমি. উৎফুল্ল দেখাচ্ছে স্লোনকে। 'গ্লাসগোর ডিস্টিলারী ব্যবসায়ী মি. ওডারেট লডারেট মালিক ছিলেন এটার। বিশ এবং ত্রিশের

দশকে, ছুটির দিনগুলোতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আসতেন তিনি এখানে। মাছ ধরতেন শিকার করতেন। কিন্তু যুদ্ধ তাঁর সমস্ত আনন্দ শেষ করে দেয়। সেনাবাহিনী বাড়িটিকে তাদের কমান্ডো ট্রেনিং হেডকোয়ার্টার বানায়। কমান্ডো ট্রেনিং-এর জন্য দুর্গম এই অঞ্চল যথার্থ ছিল বটে। যুদ্ধ শেষে লডারেট তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে দেশের বাইরে চলে যান। বাড়িটি বহুদিন খালি ছিল। তারপর ইয়ুথ হোস্টেলস অ্যাসোসিয়েশন এখানে অফিস করেছিল। কিন্তু তারাও বেশিদিন থাকেনি। তারপর জলের দামে বাড়িটি আমি কিনে নিই।'

আরেক গ্লাস ড্রিঙ্ক অফার করল স্লোন লিন্ডাকে, মানা করতে নিজেই খানিকটা হুইস্কি গিলে নিল ঢক ঢক করে। তারপর আবার শুরু করল বকবক।

'বাড়িটি আমার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বড়, যদিও কিছু চাকর-বাকরও আছে। ওরা রান্না করে, ঘর-দোর পরিষ্কার রাখে। দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, তেমন দক্ষ নয়। তাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একজন পার্সোনাল অ্যাডভাইজারের খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই আপনার কাছে যাওয়া। আপনার সাহায্য আমার ভীষণ দরকার। আপনার সাহায্য পেলে গবেষণার কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।'

এমন সময়, দাড়িঅলা, সাদা কোট পরা, বিশালদেহী এক লোক ঝড়ের বেগে ঢুকল ঘরে। লিন্ডাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর স্লোনের দিকে ঘুরে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ড. স্লোন, দয়া করে একবার আসবেন? এক রোগিণীকে নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। নিঃশ্বাস ফেলছে না সে।'

বিরক্তিতে কপাল কোঁচকাল স্লোন, শঙ্কা ফুটল চোখে পরমুহূর্তে চেহারা স্বাভাবিক করে বলল, 'তুমি যাও, ব্রানস্টোন। আমি আসছি এখুনি।'

ব্রানস্টোন যাবার পরে ঘুরে দাঁড়াল স্লোন লিন্ডার দিকে। 'অল্পক্ষণের জন্য আমাকে ক্ষমা করতে হবে, মিস রেনল্ডস। শুনলেনই তো ইমার্জেন্সী কেস। একবার নিচে যাওয়া দরকার। আপনি গেস্টরুমে গিয়ে ততক্ষণে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি হাউসকীপারকে বলে দিচ্ছি। প্লীজ, নিজের বাড়ির মত ভাবুন এ বাড়িটিকে। আমি শীঘ্রি ফিরব। তারপর একসাথে লাঞ্চ করে সব ঘুরিয়ে দেখাব।'

স্লোনের ডাকে কালো পোশাক পরা এক বুড়ি এল, লিন্ডাকে দোতলায় নিয়ে গেল, করিডরের শেষ মাথায়, একটা ঘরে ঢুকল। বুড়ির সাথে ভাব জমাতে চাইল ও। কিন্তু ওর একটা প্রশ্নেরও জবাব দিল না সে, শুধু হুঁ হাঁ করে গেল।

বেডরুমটা বাড়ির পেছনের অংশে, বড় বড়, উঁচু জানালা দিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা চোখে পড়ে। মনে হলো বাড়িটার সমস্ত দিক ঘিরে আছে রুক্ষ পাহাড়ের সারি।

ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে লিন্ডা। যতই সুন্দর নিসর্গ থাকুক, এমন ভৌতিক নির্জনতার মাঝে থাকতে পারবে না ও, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। একা হলেই প্লেন ক্রাশের কথা মনে পড়বে, আর খালি মন খারাপ হবে। ঠিক করল প্রথম সুযোগেই স্লোনকে তার বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলবে ফিরতি ট্রেনে লন্ডনে ফিরে যেতে চায় সে।

লাঞ্চের সময় অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য পরিবেশন করা হলেও খাওয়াতে মন

বসল না লিন্ডার। টেবিলে স্লোন ছাড়াও তার দুই সহকারী ছিল। একজনকে আগেই দেখেছে–ব্রানস্টোন। অপরজন বয়সে তরুণ, রোগা চেহারা, তীক্ষ্ণ চোখ, নাম ডেভিস। ওরা যে বারবার লিন্ডার দিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল সে। স্লোন খোশ গল্প চালিয়ে যাবার ভান করলেও তার মন ছিল অন্যদিকে। কারণ মাঝে মাঝে কথার খেই হারিয়ে ফেলছিল সে, কি যেন চিন্তা করছিল।

লাঞ্চ শেষে স্লোন বলল, 'মিস রেনল্ডস, এবার তাহলে যাওয়া যাক। চলুন, আমার ল্যাবরেটরি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি।'

হলঘর থেকে বের হয়ে ছোট একটা দরজার সামনে চলে এল স্লোন। এটা আসলে একটা চোর-কুঠুরি। দরজা খুলে, আলোকিত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল। প্রবেশ করল ভিন্ন এক জগতে।

এদিকের দেয়ালগুলো চমৎকার চুনকাম করা, এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের কারণে স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা ভাবটা নেই। সিঁড়ি গোড়ায় আরেকটা দরজা, তারপর সরু প্যাসেজ। তারপর আরও একটা দরজা পার হয়ে ঢুকে পড়ল স্লোনের সুসজ্জিত, বিশাল গবেষণাগারে।

'এ ধরনের গবেষণাগার আপনার জন্য নতুন কিছু নিশ্চয়ই নয়,' বলল স্লোন। 'বাড়িটার আন্ডারগ্রাউন্ডের এই ঘরগুলো আমার খুব কাজে লেগেছে। এসব ঘর ব্যবহার করা হত কিনা জানি না, তবে ধারণা করতে পারি এদিকের একটা অংশ ছিল ওয়াইন সেলার। হয়তো জ্বালানী গুদামজাত করে রাখা হত এখানে, শিকারীদের শিকার করা হরিণের চামড়া ছেলা হত। বুঝতেই পারছেন ঘরগুলোকে নিজের মত করে সাজাতে প্রচুর খরচ হয়েছে আমার। এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ব্যবস্থা করেছি বেশিদিন হয়নি। এর আগে হিটার জ্বালিয়ে রাখতাম। এখন আমাদের নিজস্ব ইলেকট্রিক জেনারেটিং প্ল্যান্টও রয়েছে। কারণ পাওয়ার ফেল করার ঝুঁকি তো আর নিতে পারি না।'

ল্যাবরেটরিটা ঘুরে দেখল লিন্ডা। কিছু অ্যাপারেটাস চিনতে পারল, বেশিরভাগই অচেনা ঠেকল।

'আপনার সাথে আলোচনায় বসার আগে আমার কাজের ধরন নিয়ে একটু কথা বলি,' বলল স্লোন। 'মোট তিন ধরনের লোক আছে এখানে, যাদের নিয়ে আমি কাজ করছি। প্রথম ক্যাটাগরির লোকেরা, চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় মৃত। মৃত্যু তাদের শারীরিক বৃদ্ধি রুখে দিয়েছে, তাদেরকে রাখা হয়েছে কোল্ড স্টোরেজে। এদের নিয়ে আমার কিছু করার নেই। তবে থিওরী মতে, যদি তাদের শরীরের টিস্যুগুলো ঠিকঠাকভাবে সংরক্ষণ করে রাখা যায়, যে রোগের কারণে তাদের মৃত্যু সেটার প্রতিষেধক যদি আগামীতে তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে তাদের আবার বেঁচে ওঠার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। জানি, আমেরিকায় একদল বিজ্ঞানী একই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তাঁদের থেকে একশো কদম এগিয়ে আছি। শুরুতে, আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিফল হয়। পরবর্তীতে লাশগুলোকে নিয়ে আমরা আরও কাটাছেঁড়া করেছি, স্টোর করেছি, দেখেছি দু'একটা অঙ্গের পচন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। গত কয়েক বছরে অন্তত এটুকু সাফল্য আমার এসেছে

যে লাশের স্বাভাবিক পচন রোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আশা করছি নিকট ভবিষ্যতে থিওরী'র দ্বিতীয় অংশেও সাফল্য অর্জন করতে পারব।

'আমার এক ক্লায়েন্ট মারা গেছে বছর পাঁচেক আগে। লোকটার হার্ট দুর্বল ছিল। আপনার জানার কথা, ওইসময় হার্ট ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট অপারেশন সম্পর্কে ডাক্তাররা জানতেন না কিছুই। আর এখন তো এটা অহরহ প্রাকটিসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার ক্লায়েন্টকে যদি হার্ট ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট অপারেশন করে বাঁচিয়ে তুলতে পারি সেটা কতবড় বিজয় হবে ভাবুন একবার। তবে এ জন্য আগে দরকার একজন উপযুক্ত ডোনার এবং একজন দক্ষ সার্জন, যিনি নিখুঁতভাবে ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের কাজটা করতে পারবেন।'

কথা বলতে বলতে উদাস হয়ে উঠল স্লোনের চোখ। আসলে নিজেকে জাহির করছে সে। ওর কাজ কর্মের বর্ণনা শুনে ওকে পাগল মনে হতে লাগল লিন্ডার।

'আর দ্বিতীয় ক্যাটাগরি?' অস্বস্তি নিয়ে জানতে চাইল সে।

'দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে আছে সেইসব লোক যারা প্রচণ্ড অসুস্থতার কারণে মারা যেতে বসেছে, কিন্তু মরেনি এখনও। এখানেও সেই একই দাওয়াই দিতে হবে, তবে এদের ক্ষেত্রে সফল হবার সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল আজ সকালের ইমার্জেন্সী কেসটা অমনই একটা ছিল। অল্প বয়সী একটা মেয়ে, মারা যেতে বসেছিল, ওকে এখানে নিয়ে আসা হয়। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য, ফ্রিজিং প্রসেসটা সময় মত শুরু করতে পারিনি বলে দুপুরের ঠিক আগে মারা গেছে সে। ওকে আমরা হিমায়িত করে রাখব, তবে ভবিষ্যতে ওর বেঁচে ওঠার চান্স শেষ হয়ে গেছে।'

লোকটার বকবকানি যথেষ্ট শোনা হয়ে গেছে লিন্ডার। সে যা অর্জন করতে চাইছে তা শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, ভয়ঙ্করও। এ ধরনের উন্মাদের সাথে ও কাজ করবে না।

'শুনুন, ড. স্লোন,' বলল লিন্ডা। 'আপনার আমন্ত্রণে এখানে এসেছি আমি। কিন্তু মনে হচ্ছে না আপনার সাথে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে। আপনি বরং সময় নষ্ট না করে আরেকজনের সন্ধানে লেগে যান। আর কাউকে দিয়ে আমাকে গ্লাসগো পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল স্লোন, তারপর যখন কথা বলল, যেন এক ভিন্ন মানুষ। ওর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে শিউরে উঠল লিন্ডা।

'ব্যাপারটা দুঃখজনক, মিস রেনল্ডস, সত্যি দুঃখজনক,' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে সে। যখন এসেই পড়েছেন তৃতীয় ক্যাটাগরির লোকদেরকে না দেখিয়ে আপনাকে ছাড়ছি না।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে…'

'আপনাকে ছাড়ছি না কিন্তু,' অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ফুটল তার মুখে। 'এবারের জিনিসটা দেখে খুব আনন্দ পাবেন আপনি। প্লীজ, আসুন তো।'

ল্যাবরেটরির শেষ মাথার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, ঢুকল অন্ধকার, ঠাণ্ডা একটা প্যাসেজে। মনে হলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে উঠছে। হালকা কমলা আলোয় প্যাসেজের দু'পাশে অসংখ্য ছোট ছোট দরজা চোখে পড়ল।

'আমার পেশেন্টরা থাকে এসব ঘরে,' ব্যাখ্যা করল স্লোন। 'এদের অর্ধেক মৃত, বাকিরা মরো মরো অবস্থায় এখানে এসেছে। তবে প্রসেসটা আপাতত স্থগিত রাখা

হয়েছে। অবশ্য সবাইকে ভাল মত পরীক্ষা করে মাইনাস দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হিমায়িত করে রাখা হয়েছে। তাদের শারীরিক যে কোন পরিবর্তন আমরা রেকর্ড করে রাখছি।'

মনে হলো একটা কবরস্থানে হাজির হয়েছে লিন্ডা, বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ। খুব ভয় ভয় লাগছিল, একই সাথে কৌতূহলও জাগছিল।

'কতদিন ধরে ওরা এখানে আছে?' শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করল ও।

'সবচে' পুরানো পেশেন্টের এখানে অবস্থানের সময় দশ বছর তো হবেই,' জবাব দিল স্লোন। 'যারা এখনও মারা যায়নি, এমন পেশেন্ট এসেছে পাঁচ বছর আগে।'

প্যাসেজের দূরপ্রান্তের একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো, স্লোন দরজা খুলল। আবার সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে।

'সমস্যা হলো,' ফ্যাকাসে, ক্ষীণ আলোয় সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলল স্লোন, 'গত ২/৩ বছর ধরে পেশেন্টদের রাখার জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। তাই একটা লোয়ার চেম্বার খুলতে হয়েছে।'

নিচে আসার পরে, স্লোন সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিল বাতি, যদিও পুরোপুরি অন্ধকার দূর করতে পারল না আলো। লিন্ডা দেখল একটা লম্বা, সরু, ভল্টের মত ঘরে ঢুকেছে, ছাদটা ঢেউ খেলে দেয়ালের সাথে মিশেছে, এত নিচু যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। দেয়ালের এক ধারে অসংখ্য ডায়াল আর সুইচ, তবে ওর নজর কেড়ে নিল লম্বা দেয়ালের বিপরীত দিকটা। চারকোনা, গভীর করে খোদাই করা অনেকগুলো পাথুরে গর্ত ওদিকটাতে। তিনটা গর্ত দেখে বোঝা গেল অল্প ক'দিন আগে ইঁট আর সিমেন্ট দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকি গর্তগুলো খালি। শেষ মাথার গর্তটার সামনে বড় একটা ধাতব ক্যানিস্টার শোয়ানো। সিলিন্ডার আকারের ক্যানিস্টারটি লম্বায় ফুট সাতেক হবে, ডায়ামিটারে তিন/চার ফুট। হয়তো পেছনের গর্তে ওটার জায়গা হবে। ক্যানিস্টারটা পুরো লেংথ থেকে এমন ভাবে ভাগ করা, ইচ্ছে করলেই ওপরের অংশটা তলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

চারপাশে চোখ বোলালেও লিন্ডা টের পাচ্ছিল স্লোন তাকিয়ে আছে ওর দিকেই। তার চোখে চোখ পড়তে দেখল বন্ধুসুলভ ভাবটা চেহারা থেকে মুছে গেছে স্লোনের, ঠাণ্ডা, বুক হিম করা একটা হাসি মুখে। লিন্ডার বুকটা কেঁপে উঠল।

ধাতব ক্যানিস্টারে টোকা দিল স্লোন, বলল, 'এটার মধ্যে এবং এটার মত আরও তিনটে কন্টেইনারে, যেগুলো দেয়ালের পেছনে ইঁট দিয়ে পুঁতে রাখা হয়েছে, ওখানে যারা শুয়ে আছে তারা না জীবিত না মৃত।'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না,' বলল লিন্ডা।

'আমি বলতে চাইছি, ওখানে যাদের রাখা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই সুস্বাস্থ্যবান ছিল।'

'কিন্তু কেন?' অবাক হলো লিন্ডা। 'এতে তাদের সুবিধেটা কি?'

'সুবিধেটা তাদের নয়, আমার ইচ্ছে সুবিধেটা গোটা বিশ্বের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া।'

'ওঁরা কি এ ধরনের অভিযানে স্বেচ্ছায় এসেছেন?'

'ঠিক তা নয়,' শয়তানী হাসি হাসল স্লোন। 'তাদেরকে কাজটা করাতে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছে। বিজ্ঞান যদি বিনিময়ে অনেক লাভবান হতে পারে তাতে সামান্য শক্তি প্রয়োগের ঘটনায় কিইবা এসে যায়?'

'তার মানে আপনি ইচ্ছের বিরুদ্ধে মানুষগুলোর অমন অবস্থা করেছেন?' ঘৃণা আর রাগে গলা চড়ল লিন্ডার। 'এমন অমানবিক আচরণের কথা জীবনেও শুনিনি আমি।'

'থামুন!' ধমকে উঠল স্লোন। 'লেকচার দেয়ার সময় পরে পাবেন। আসুন এদিকে। আরও কিছু জিনিস দেখানো বাকি রয়ে গেছে।'

ক্যানিস্টারের ডালা খুলল স্লোন, হিমায়িত বাষ্পের একটা মেঘ উঠে এল ওপরে। ঘন মেঘটা স্বচ্ছ হয়ে ওঠার পরে লিন্ডা দেখল একটা লোক শুয়ে আছে ক্যাপসুলের ভেতরে। লোকটা সম্পূর্ণ নগ্ন, গায়ের চামড়া অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে, খিঁচ ধরে আছে মাংসপেশী, পরিষ্কার বোঝা গেল। মরা মানুষের মত শুয়ে আছে সে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। তার চোখ বোজা, মাথায় এক গাছি চুলও নেই, নিখুঁতভাবে কামানো, তারপরও ওকে চিনে ফেলল।

'জন,' নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল লিন্ডা। তারপরই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

সম্ভবত কয়েক মিনিট চেতনা ছিল না ওর জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখে চিৎ হয়ে পড়ে আছে স্লোনের চেম্বারে, ধাতব কবরটা খোলা, ভেতরে শুয়ে আছে প্রেমিক জন বার্ন।

হাত ধরে টেনে তুলল স্লোন লিন্ডাকে, ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল সে।

'আপনি–আপনি একটা দানব!' হিস্টিরিয়া আক্রান্ত রোগীর মত চেঁচাতে লাগল লিন্ডা। 'আমার জনের কি দশা করেছেন! ও এখানে এল কি করে?'

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে,' মুচকি হাসল স্লোন। 'এক এক করে আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। আপনার প্রেমিক এবং তার দুই বন্ধু, তাদের পাইলটসহ, সবাই আছে এখানেই। অন্যদেরকে দেয়ালের ইঁট দেয়া অংশে একই কন্টেইনারে পুরে সীল করে দেয়া হয়েছে। আপনার প্রেমিককেও একই পদ্ধতিতে সীল করা হবে। আমি তাকে এখানে এনে রেখেছি আপনার কথা ভেবে। আপনি ওকে দেখে হয়তো খুশি হবেন।'

লিন্ডা মারমুখী হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে থামিয়ে দিল স্লোন।

'আগে আমার কথা শেষ করতে দিন। কেন কাজটা করতে গেলাম সে ব্যাখ্যায় এবার আসছি। যে ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করে সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম, সে প্রজেক্ট হঠাৎ স্থবির হয়ে পড়ে ফান্ডের অভাবে। কাজটা আবার শুরু করার স্বপ্ন দেখছি, এমন সময় প্রফেসর ম্যাক্সওয়েল ওয়েন অ্যাওয়ার্ড আপনারা জিতে আমার শেষ ভরসাটাও নষ্ট করে দিলেন। তারপর ভাবলাম আপনাদের টাকায় ভাগ বসাচ্ছি না কেন? হাফ মিলিয়ন পাউন্ড অনেক টাকা। এ টাকা দিয়ে দু'দলের প্রজেক্টের কাজই ভাল ভাবে চলতে পারে। কাজেই প্লেনটা হাইজ্যাকের ব্যবস্থা করতে হলো আমাকে, ওদেরকে নিয়ে এলাম এখানে। প্রফেসরের কাছে প্রস্তাব

দিলাম এক সাথে কাজ করার। তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন সেই প্রস্তাব। তখন ওদের তিনজনকে চিরতরে অদৃশ্য করে দেয়া ছাড়া বিকল্প রাস্তা ছিল না আমার। প্রফেসরের প্রজেক্ট বাতিল মানে দ্বিতীয় সেরা হিসেবে টাকাটা আমি পেয়ে যাব।

'ওদের নিয়ে কি করব সেটা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বেপরোয়া স্বভাবের মানুষ হলেও আমি বিজ্ঞানী। কাজেই ওদের খুন করার প্রশ্নই আসে না। হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এল। মৃত বা মৃতপ্রায় লোকদের ওপর আমার টেকনিক ব্যবহার না করে এই সুস্থ, সবল মানুষগুলোকে দিয়ে পরীক্ষা চালালেই তো হয়। আমি তরুণদের হিমায়িত করে দেখতে চাই বয়সের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দেয়া যায় কিনা। ধরুন, আজ থেকে একশো বা দুশো বছর পরে আপনার প্রেমিকের আবার পুনর্জন্ম হলো ঠিক এই চেহারা এবং বয়স নিয়ে। ব্যাপারটা দারুণ হবে, না?'

'আপনি একটা পাগল,' বলল লিন্ডা।

তাচ্ছিল্যভরে কাঁধ ঝাঁকাল স্লোন।

'হয়তো। খামখেয়ালীপনা আমাদের সবার মধ্যেই আছে। তবে মতিভ্রমতা এবং মতিস্থিরতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যাবে কিভাবে? আমি শুধু বুঝি সারাজীবনের পরিশ্রমের সাফল্য আমাকে পেতে হবে। মানব কল্যাণই হলো আসল কথা। এটা এমন বিশাল একটা ব্যাপার যে এর কাছে তিনটি মানুষের জীবন আর হাফ মিলিয়ন পাউন্ডের মূল্য কিছুই না।'

'মানে...' লিন্ডা তেতেমেতে মুখ খুলতে যেতেই স্লোন বাধা দিল আবার।

'এমন কিছু বলবেন না যাতে আপনার ফিঁয়াসে শক্‌ড্ হয়। উনি কিন্তু সব কথা শুনছেন।'

'কি!' হতভম্ব হয়ে গেল লিন্ডা কথাটা শুনে। এটা স্লোনের কোন নির্মম রকিসকতা নয়তো? কিন্তু স্লোনকে সিরিয়াস দেখাল।

'জ্বী। জনকে হিমায়িত করে শরীর থেকে সমস্ত রক্ত টেনে নেয়া হলেও মস্তিষ্ক কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছে। আমাদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছেন উনি। এ সমস্যাটার এখনও সমাধান করে উঠতে পারিনি আমি। শরীরটাকে অসার করে সমস্ত ফাংশন বন্ধ করে দিতে পারলেও ব্রেনসহ কিছু অনুভূতিকে ডি-অ্যাক্টিভেট করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেমন, সাবজেক্ট এখনও শুনতে পাচ্ছে, কিছু বিশেষ অনুভূতি অনুভব করার ক্ষমতাও তার রয়ে গেছে।'

'একবার যদি ব্রেন তার কাজ বন্ধ করে দেয়, ওটাকে চালু করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে রোগীকে আবার আগের সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এ কারণেই আমার এক নম্বর ক্যাটাগরির পেশেন্টদের দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যের ব্যাপারে আমি সন্দিহান। বিশেষ করে যারা এখনও মারা যায়নি। তবে, যারা ডিপ ফ্রিজের মধ্যে থাকছে, তাদের ব্রেনের কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে না।'

'আপনার এসব পরীক্ষা স্রেফ পাগলামি,' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল লিন্ডা। 'পুলিশে খবর দিলে ওরা আপনাকে পাগলা গারদে পাঠাবে।'

'আপনি আমাকে সত্যি হতাশ করলেন, মিস রেনল্ডস,' এদিক-ওদিক মাথা

নাড়তে নাড়তে বলল স্লোন। 'কি করে ভাবলেন আমার সমস্ত গোপন কথা জানার পরেও আপনাকে পুলিশের কাছে যেতে দেব?'

লোকটার প্রচ্ছন্ন হুমকি শুনে থ হয়ে গেল লিন্ডা। এভাবে নিজের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে কল্পনাও করেনি। আতঙ্কে অবশ হয়ে এল শরীর।

স্লোন বলে চলল, 'আপনাকে এখানে ডেকে এনেছিলাম আমার কাজে সাহায্য করার জন্য। এখন দেখছি সে আশায় গুড়ে বালি। ওই ক্যাপসুলের ভেতরে কে বা কারা আছে জানার দরকার ছিল না আপনার। কিন্তু যে মুহূর্তে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, সিদ্ধান্ত নিলাম আপনাকে ভিন্ন কাজে লাগাব। এতে আপনার প্রেমিককেও খানিকটা শাস্তি দেয়া যাবে।

জন নিশ্চয়ই আপনাকে খুব ভালবাসে। আপনার দশা কি করব তা যখন জানবে সে, আফসোস করবে আমাকে কেন গালাগালি দিয়েছিল ভেবে। জানেন, ওকে ধরে নিয়ে আসার পরে ও পালাবার চেষ্টা করেছে? আমার মূল্যবান কতগুলো অ্যাপারেটাসও ভেঙেছে।' বলতে বলতে ধকধক করে জ্বলে উঠল স্লোনের চোখ। এই প্রথম ওকে রাগতে দেখল লিন্ডা। 'বোকাটার জন্য আমার কাজ পিছিয়ে গেছে কয়েক বছর। তাই ঠিক করি ওকে এবং ওর বন্ধুদের গিনিপিগ বানাব।'

একটু বিরতি দিল স্লোন। চেহারা শান্ত দেখালেও এমন ভাবে লিন্ডার দিকে তাকাল যে আত্মা উড়ে গেল। 'এবার তোমাকেও বাগে পেয়েছি, মাই ডিয়ার,' হঠাৎ সম্বোধন পরিবর্তন করে বসল স্লোন। 'এখন আমার ধারাবাহিক এক্সপেরিমেন্টগুলো শেষ করব। খুব শীঘ্রি তোমার তিন বন্ধুর সাথে যোগ দিতে হবে তোমাকে। তার আগে তোমাকে গর্ভবতী করা প্রয়োজন। তাহলে এ পরীক্ষাটাও হয়ে যাবে অনন্ত কালের জন্যে গর্ভধারণকে প্রতিহত করে রাখা যায় কিনা এবং মুক্ত হবার পরে প্রক্রিয়াটা আবার চালু করা সম্ভব কিনা।'

জনের দিকে তাকাল সে। 'শুনতে পাচ্ছেন, মি. বার্ন?' চেঁচিয়ে উঠল স্লোন। 'বিজ্ঞানী হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই আমার মতামতকে শ্রদ্ধার সাথে বিচার করবেন। একটু পরেই আপনাকে সীল করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। হয়তো অনন্তকালের জন্য। তবে এটুকু ভেবে অন্তত সান্ত্বনা পাবেন, আপনার বাগদত্তা আপনার ধারে কাছেই থাকবে।'

'তুমি একটা উন্মাদ,' হিসিয়ে উঠল লিন্ডা। 'আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না আমি।'

সিঁড়িঘরের দিকে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ও, ভয়ঙ্কর এই চেম্বার, যেটা গোরস্থানের চেয়েও ভয়াবহ মনে হচ্ছিল, এখান থেকে পালাতে পারলেই এখন বাঁচে। অবাক হয়ে লক্ষ করল স্লোন ওকে বাধা দেয়ার কোন চেষ্টাই করল না। একটু পরেই অবশ্য কারণটা বোঝা গেল। সিঁড়ি গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে যমদূত, তার দুই সহকারী।

'ব্রানস্টোন,' বলল স্লোন। 'মিস রেনল্ডসকে ওপরে, তার ঘরে নিয়ে যাও। দেখো যেন পালাতে না পারে। আর ডেভিস, ওকে সাহায্য করো। একটু পরেই তোমাদের ডাকব আমি। ক্যাপসুলটা বন্ধ করে এখান থেকে সরাতে হবে।'

ব্রানস্টোন আর ডেভিস লিন্ডার হাত ( ] ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল প্রায়

অন্ধকার প্যাসেজ দিয়ে। ধস্তাধস্তি করল মেয়েটি, গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল। কোন লাভ হলো না। কেউ এল না সাহায্য করতে। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে, তারপর আরেকটা দরজা দিয়ে, যেটা আগে লক্ষ করেনি, সেখান থেকে একটা ঘরে ঢুকল, সিঁড়ির নিচে। ঘরে আসবাব বলতে শুধু একটা বিছানা। লিন্ডাকে ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ওরা চলে গেল। পায়ের শব্দ শুনতে পেল ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

পরবর্তী কয়েকটা হপ্তা আতঙ্ক, ভয়, নির্যাতন আর অনিশ্চয়তার এক ভয়ানক দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল। স্লোনের ল্যাবরেটরিতে লিন্ডার নানা শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা চলল। বাকি সময়টা ওই ঘরে বন্দী হয়ে রইল। দুই সাগরেদ পালাক্রমে ওর খাবার দিয়ে যায়, মাঝে মাঝে স্লোন নিজেও নিয়ে আসে। ওদের দেখলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যায় লিন্ডা কপালে আরও কত দুর্ভোগ আছে ভেবে। মাঝে মাঝে জন, মার্টিন এবং প্রফেসর ম্যাক্সওয়েলের কথা চিন্তা করে। ভেবে পায় না ওরা এই শয়তানের পাল্লায় পড়ল কি করে।

একদিন জেসন স্লোন নিজেই ঘটনাটা খুলে বলল। কোন কারণে মূড ভাল ছিল তার, কথা বলার নেশায় পেয়ে গেল। আর বক বক শুরু করলে সে তো থামতেই চায় না।

স্লোন বলল, তার সাগরেদ ব্রানস্টোন একজন ট্রেইন্ড্ পাইলট, প্রফেসরদের যাত্রার দিন সে আসল পাইলটকে হাত-মুখ বেঁধে প্লেনের পেছনে লুকিয়ে রেখে নিজেই পাইলট সেজে বসে। জার্মানীর দিকে কোর্স সেট করলেও কোস্ট পার হবার পরে কোর্স বদলে সে স্কটল্যান্ডের দিকে যাত্রা শুরু করে। মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে চলছিল ওরা, ওদিকে নিচেটাও ছিল অন্ধকার, ফলে যাত্রীরা কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারেনি। তাদের টনক নড়ে প্লেন স্লোনের বাড়ির ধারে, পুরানো এক এয়ারফিল্ডের ল্যান্ড করার পরে। ওরা প্রথমে ভেবেছিল বোধহয় কোন ঝামেলা হয়েছে যার কারণে প্লেন ওখানে নেমেছে। কিন্তু স্লোন এবং ডেভিস মাথায় পিস্তল ঠেকাতে তাদের ভুল ধারণা ভেঙে যায়। তারপর স্লোন প্রফেসরকে তার প্রস্তাব দেয় এবং প্রফেসর ঘৃণা ভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারপরে কি হয়েছে সে কথা লিন্ডার জানা।

স্লোন বলল প্রফেসরদের এয়ার ক্রাফট সে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। তারপর প্লেনের খানিক ধ্বংসাবশেষ নিয়ে আকাশ পথে ফিরে যায় অরিজিনাল রুটে, যে কোর্স ধরে প্রফেসরদের যাবার কথা ছিল। ওখানে, সাগরের পানিতে প্লেনের ধ্বংসাবশেষ ফেলে দেয় স্লোন। অনুসন্ধানকারীরা ওই জিনিসগুলোই পরে খুঁজে পেয়েছে।

একদিন শয়তান স্লোন সত্যি সত্যি ব্রানস্টোন আর ডেভিসকে লিন্ডার ওপর লেলিয়ে দিল। ওরা পালা করে ওকে ধর্ষণ করল। জঘন্য কাজটাতে ওরা মজা পেয়েছে ঠিকই, তবে পুরো ব্যাপারটাই ঘটল স্লোনের উপস্থিতিতে। সে যেভাবে যেভাবে বলে দিল ওরা ঠিক সেভাবে ওর ওপর চড়াও হলো।

লিন্ডার ধারণা, স্লোন ওর শরীরে ফার্টিলিটি ড্রাগ পুশ করেছে। মাস দুয়েক পরেই সে গর্ভবতী হয়ে পড়ল। স্লোন বেশ খুশি। মা হতে পারা প্রতিটি মেয়ের

পরম সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু লিন্ডা মোটেও সুখী হতে পারল না। কারণ জানে, কিছুদিনের মধ্যেই জনের মত ওকেও বরফের মধ্যে কবর দেয়া হবে, জীবন্মৃত অবস্থা হবে ওর, গর্ভের সন্তানও হিমায়িত হয়ে রইবে।

ঘরের মধ্যে বন্দী অবস্থায় দিন কাটছিল লিন্ডার। সারাক্ষণই পালাবার চিন্তা করত। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিল না। মরিয়া হয়ে একটা বুদ্ধি আঁটল। তবে বুদ্ধিটা কাজে লাগানোর জন্যে দুটো কাঠের টুকরো দরকার। জিনিস দুটো ল্যাবরেটরি থেকে একদিন লুকিয়ে নিয়েও এল। ওরা লিন্ডার কি একটা টেস্ট করতে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়েছিল, সেই সময়। একটা টুকরোর সাইজ কিউবিক ইঞ্চি, অন্যটা চেটাল, চওড়ায় ইঞ্চি তিনেক। কাঠের টুকরো দুটোর ওপর লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু কাজ চালাল। আসলে দেয়াল আর মেঝেতে ঘষে ও দুটোকে আরও মসৃণ করে তুলল।

সেদিন সন্ধ্যার অনেক পরে ব্রানস্টোন এল ওকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে, আরও কিসব টেস্ট করাবে।

'চলো, আমার সাথে,' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল সে, তারপর লিন্ডা পিছু পিছু আসছে কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ল্যাবরেটরির দিকে হাঁটা দিল।

দরজায় বাইরে থেকে ইয়েল লক লাগানোর ব্যবস্থা আছে, কী-হোলসহ। ভেতরের মেকানিজম নষ্ট। ঘর থেকে বেরুবার সময় কাঠের ছোট টুকরোটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল লিন্ডা, এর ফলে দরজা বন্ধ করার সময় লকটা স্বাভাবিকভাবে উঁচু হয়ে থাকবে। ব্রানস্টোন এদিকে তাকাল না দেখে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। কাঠের টুকরোটা শক্তভাবে লাগানো হয়েছে, সহসা পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

স্লোন তার ল্যাবরেটরিতে মিনিট কয়েক পরীক্ষা করল লিন্ডাকে, কাজ শেষ করে ব্রানস্টোনের দিকে ঘুরল। 'ঠিক আছে, আমি লিস্ট তৈরি করছি। তুমি ডোভসকে বলো গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করতে। মেয়েটাকে ওর ঘরে নিয়ে যাও, তারপর তোমার কাজে যেয়ো। তোমরা ফিরে এলে, মাঝ রাত্তিরে কাজ শুরু করব।'

স্লোন চলে গেল বরাবরের মত লিন্ডার দিকে একবারও না তাকিয়ে। লিন্ডা কার্ডিগানটা গায়ে জড়িয়ে নিল, চেয়ে চেয়ে দেখল ব্রানস্টোন। তারপর নিয়ে চলল ওর ঘরে।

লিন্ডাকে ঘরে ঢুকিয়ে ব্রানস্টোন দরজা বন্ধ করছে, বিদ্যুৎগতিতে কাঠের গোঁজটা তালার নিচে, ফাঁকা জায়গাটাতে ঢুকিয়ে দিল, চেপে রাখল সর্বশক্তি দিয়ে। একটু পরেই শুনল ব্রানস্টোন চলে যাচ্ছে, জুতোর আওয়াজ উঠল মেঝেতে। আগে ভালভাবে দেখে যেত সে ঠিকঠাক তালা মারা হয়েছে কিনা। ইদানীং তেমন দেখে না। হতে পারে সে ভেবেছে লিন্ডা পালাবে না। আর পালালেও কোন লাভ হবে না। দুর্গম এই অঞ্চলের পথ-ঘাট তো আর সে চেনে না।

ব্রানস্টোন চলে যাবার পরে, দুরু দুরু বুকে কাঠের গোঁজটা টেনে খুলল লিন্ডা, মনে মনে প্রার্থনা করল গর্তের মধ্যে আগে ঢুকিয়ে রাখা ছোট্ট কাঠের টুকরোটা যেন তালাটাকে বন্ধ হতে না দেয়। আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠল দরজাটা খুলে যেতে। কাজ হয়েছে! সাবধানে পা রাখল সে এবার প্যাসেজে, কাঠের টুকরোটা হাতে নিয়েছে আগেই, তারপর বন্ধ করল দরজা। পা টিপে টিপে এগোল সিঁড়ির দিকে, সিঁড়ির

মাথায় দরজা খুলে উঁকি দিল। মিটমিটে আলো জ্বলছে হলঘরে। বাতাসটা ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে। মনে পড়ল এ বাড়িতে আসার প্রথম দিনটির কথা। সেদিনও গা হিম করা ঠাণ্ডা ছিল। সে যেন অনেক আগের কথা।

সদর দরজায় একটা গাড়ি আসার আওয়াজ পেল, কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। চট করে সরে গেল লিন্ডা দরজার আড়াল থেকে, ডেভিস। হলঘর পার হয়ে দূরপ্রান্তের একটা দরজার দিকে এগোল সে।

পালাবার এটাই সুযোগ। না হলে এমন সুযোগ আর কোনদিন পাবে না ও। ভূতের মত নিঃশব্দ পায়ে হলঘরের দিকে এগোল লিন্ডা, দাঁড়িয়ে পড়ল দরজার সামনে। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, দরজার পাশে, একটা র‍্যাকে একটা রেইনকোট ঝুলছে। চট করে বর্ষাতিটা গায়ে চাপাল। তারপর দরজা খুলে পা রাখল বাইরে।

চারদিকে নজর বুলিয়ে লিন্ডা বুঝতে পারল এমন বর্ষার রাতে, চেনে না জানে না এমন দুর্গম একটা এলাকায়, ছুটে পালানোর চিন্তা বাতুলতা মাত্র। ওর জানা নেই আশ-পাশে আর কোন ঘর বাড়ি আছে কিনা। রাস্তায় বেরুলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে দিশা হারিয়ে ফেলবে। কে জানে ওরা কুকুর পোষে কিনা। তা হলে নিরাপদ কোন আশ্রয়ে যাবার আগেই ওরা ওকে ধরে ফেলবে। কপালে যা থাকে ভেবে এক দৌড়ে স্লোনের গাড়ির বুট খুলে ভেতরে বসে রইল লিন্ডা।

খানিক পরে লোকজনের সাড়া পেল, গাড়ির দিকেই আসছে। এখন ওরা কোন কারণে গাড়ির বুট খুলে ফেললেই সে শেষ। গাড়ির পেছন দিয়ে কেউ একজন যাচ্ছে টের পেয়ে বন্ধ করে রাখল দম। দুপদাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, ভয় হলো হার্টবিটের আওয়াজ শুনে ফেলবে লোকটা। লোকটা গাড়িতে উঠে বসল, দড়াম করে বন্ধ করল দরজা। গর্জন ছেড়ে চালু হয়ে গেল এঞ্জিন, চলতে শুরু করল, লিন্ডাকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে চলল নরক থেকে। চোখে জল এসে গেল ওর। নীরবে কাঁদতে লাগল।

বুটের মধ্যে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিল লিন্ডা, গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবে কষ্টটাকে আমল দিল না। ভাবছিল স্লোন সাপার নিয়ে এসে যখন দেখবে সে পালিয়েছে, কিরকম প্রতিক্রিয়া হবে তার। রাগে উন্মাদ হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। সে কি সন্দেহ করতে পারে গাড়িতে চড়ে কেটে পড়েছে লিন্ডা? ব্রানস্টোন এবং ডেভিসের সাথে সে নির্ঘাত যোগাযোগ করবে, ফোন করবে গ্লাসগোর ল্যাবরেটরিতে। ওরা লিন্ডা পালিয়েছে শোনা মাত্র ফিরে আসবে হান্টিং লজে। কাজেই থামা মাত্র নেমে পড়তে হবে লিন্ডাকে।

কতক্ষণ ধরে গাড়ি চলছিল জানে না, তবে প্রায়ই অন্যান্য বাহনের হুস করে পাশ কেটে যাবার শব্দে বুঝতে পারছিল শহরে ঢুকে পড়েছে ওরা। ওরা গন্তব্যে না পৌঁছা পর্যন্ত কোথাও গাড়ি থামাবে বলে মনে হলো না। আরও অনেকক্ষণ গাড়ি চলার পরে থেমে গেল এক জায়গায়। লিন্ডা শুনল ব্রানস্টোন নামছে দরজা খুলে।

'তুমি এগোও,' ডেভিসের গলা শোনা গেল। 'আমি গাড়িটা পার্ক করে আসছি এখুনি।'

শঙ্কিত হয়ে উঠল লিন্ডা, ব্রানস্টোন ল্যাবরেটরিতে ঢোকামাত্র ওর খবর পেয়ে যেতে

পারে। এদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে পার্ক করল ডেভিস, থেমে গেল এঞ্জিনের শব্দ, টের পেল নামছে সে। গুনে গুনে দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে, তারপর ধাক্কা মেরে বুট খুলল, নেমেই দিল দৌড়। কে যেন ওর নাম ধরে ডাক দিল। কিন্তু পেছন ফেরার সাহস পেল না ও। কারও সাহায্য পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে ও. হঠাৎ একতলা বাড়িটা চোখে পড়ল। ছোট গেট। টপকে ভেতরে ঢুকতে অসুবিধে হলো না। কলিংবেলে পাগলের মত চাপ দিতে লাগল ও। দরজা খুলে গেল। অবাক হয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরই বান্ধবী শ্যারন ফেয়ারচাইল্ড।

লিন্ডার রোমাঞ্চকর, অবিশ্বাস্য গল্প শেষ হলো। লিভিংরুমের ফায়ারপ্লেসের আগুন প্রায় নিবু নিবু হয়ে এসেছে। পুরো গল্পটা মনোযোগের সাথে শুনেছে শ্যারন, কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য করেনি। দেখল গল্প শেষ করার পরে বান্ধবীর চেহারায় ভয় এবং শঙ্কা ফুটে উঠেছে,. নরক থেকে পালিয়ে আসার ভয়াবহ স্মৃতি নতুন করে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেছে ওকে।

গল্প শেষ করে মৃদু গলায় লিন্ডা বলল, 'আমি কল্পনাও করিনি তোকে এখানে দেখব।'

শ্যারন বলল, 'মাস দুয়েক আগে কটেজটা ভাড়া করেছি। নতুন একটা লেখায় হাত দিয়েছি। কিন্তু যাকগে ওসব। তুই এখন কি করবি?'

'জানি না কি করব,' গুঙিয়ে উঠল লিন্ডা। 'ওরা হয়তো দেখেছে আমাকে এখানে আসতে, বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'মনে হয় না। তবু আমরা কোন ঝুঁকি নেব না। আমি এখুনি পুলিশকে ফোন করছি। ওরা এসে পড়লে আর ভয় নেই।'

শ্যারনকে গায়ে কোট চাপাতে দেখে সভয়ে জিজ্ঞেস করল লিন্ডা, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ফোন করতে। আমার ফোনটা নষ্ট। রাস্তার ধারে একটা ফোন বক্স আছে। পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'আমাকে একা রেখে যাবি?' আর্তনাদ করে উঠল লিন্ডা।

'তাহলে তুইও চল সাথে।'

'ওরে বাবা! রাস্তায় আমি কিছুতেই যাব না।' আঁতকে উঠল লিন্ডা।

'বেরুনো ঠিকও হবে না,' ওর সাথে একমত হলো শ্যারন। 'ভয় নেই। এখানে কোন সমস্যা হবে না। আমি যাবার পরে দরজাটা বন্ধ করে দিবি।' বলে দরজা খুলল শ্যারন এবং আক্রান্ত হলো।

কে জানে কখন থেকে ওরা ওঁৎ পেতে ছিল দরজার পাশে। দরজায় কান লাগিয়ে হয়তো সব শুনেওছে। অপেক্ষায় ছিল কখন শ্যারন দরজা খুলবে। লিন্ডার কথাই ঠিক ওরা দেখে ফেলেছিল ওকে। অনুসরণ করে চলে এসেছে ওখানে।

কানের ঠিক নিচে রবারের শক্ত ডাণ্ডার বাড়িটা লাগল শ্যারনের, গলা দিয়ে বিদঘুটে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। বিদ্যুৎগতিতে ভেতরে ঢুকে পড়ল ব্রানস্টোন এবং ডেভিস। ওদেরকে দেখে ভীষণ আঁতকে উঠল লিন্ডা, ঝট করে উঠে দাঁড়াল সোফা থেকে। এক লাফে ওর পাশে

পৌঁছে গেল হালকা-পাতলা ডেভিস, চকচকে একটা ক্ষুর গলায় চেপে ধরে হিসিয়ে উঠল, 'আওয়াজ দিয়েছ কি এক পোঁচে কল্লা নামিয়ে দেব।'

অবশ্য চিৎকার করলেও লিন্ডার আর্তনাদ কেউ শুনতে পেত কিনা সন্দেহ। কারণ আশপাশে দু'এক মাইলের মধ্যে আর বাড়ি-ঘর নেই, শুধু স্লোনের ল্যাবরেটরি ছাড়া। নির্জনতা পছন্দ করে লেখিকা শ্যারন ফেয়ারচাইল্ড। তাই লোকালয় থেকে এত দূরের একটা বাড়ি বেছে নিয়েছে লেখালেখির জন্য। লোকজনের হৈ-হট্টগোল পছন্দ করে না বলে স্লোনও শহরতলির শেষ মাথায় ওর ল্যাবরেটরি বানিয়েছে।

'ড. স্লোন রেগে বোম হয়ে আছেন,' দুষ্টু মেয়েকে বোঝাবার ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল ব্রানস্টোন। 'এখন চলো।' হাত ধরে টান দিল সে।

শ্যারন ফেয়ারচাইল্ডের হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে ওরা যখন বাড়ির বাইরে এসেছে, তখন পুবাকাশ একটু একটু ফর্সা হতে শুরু করেছে। দূরে অপেক্ষমাণ গাড়িতে ওরা ঠেলতে ঠেলতে তুলল লিন্ডাকে। যন্ত্রচালিত পুতুলের মত গাড়িতে উঠে বসল লিন্ডা, মাথাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে আছে, কিছুই ভাবতে পারছে না সে, মেনে নিয়েছে অমোঘ নিয়তিকে। তাই সারা রাস্তা সম্মোহিতের মত বসে থাকল সে, ফিরতি পথে একটা কথাও বলল না। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো পুরানো হান্টিং লজের সেই ল্যাবরেটরিতে।

স্লোন লিন্ডাকে দেখে আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল, 'আমাদের অনেক ঝামেলায় ফেলে দিয়েছ তুমি। পুলিশ-টুলিশ এলে ওদের উৎকট প্রশ্নের জবাবে এখন আমাদের আগেই সাবধান হয়ে যেতে হবে। যদিও তোমার নিয়তি কেউ খণ্ডাতে পারবে না।'

লিন্ডা স্লোনের কথা শুনছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তার চেহারা শান্ত, ভয় বা আশঙ্কার কোন ভাব ফুটে নেই। যেন সমস্ত আবেগ, অনুভূতি শুষে নেয়া হয়েছে। ভয়, আতঙ্ক, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুর ঊর্ধ্বে এখন লিন্ডা রেনল্ডস।

স্লোনের নির্দেশে তার সঙ্গীরা কাজ শুরু করে দিল। ব্যাকটেরিয়ার অনুপ্রবেশ যাতে ঘটতে না পারে সে জন্য আগেভাগে ঘরের তাপমাত্রা কমিয়ে রাখা হয়েছে। এখন চূড়ান্ত প্রসেসিং-এর আগে বাকি কাজগুলো সেরে নিতে হবে।

ওরা জামা-কাপড় খুলে নগ্ন করল লিন্ডাকে, মেয়েটা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সামান্য ধস্তাধস্তি পর্যন্ত করল না। ওর লম্বা সুন্দর চুলগুলো ছেঁটে দেয়া হলো, কামানো হলো মাথা। তারপর অত্যন্ত সাবধানে শরীরের অন্যান্য সমস্ত অবাঞ্ছিত লোমও চেঁছে ফেলা হলো ক্ষুর দিয়ে। তারপর স্টিম বাথ দেয়া হলো লিন্ডাকে। প্রতিটি লোমকূপের গোড়া থেকে দূর করা হলো ধূলিকণা। সবশেষে শরীর শুকিয়ে ফেলা হলো গরম বাষ্প চালিয়ে।

গোটা ব্যাপারটা তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল স্লোন। সন্তুষ্ট হয়ে মেয়েটাকে ঠাণ্ডা স্টেরিলাইজড় টেবিলে শুইয়ে দিল, হাইপডারমিক সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে দাঁড়াল পাশে। নিষ্প্রাণ চোখে ওকে দেখল লিন্ডা।

'অবশেষে সময় হয়েছে,' উল্লাসের সাথে ঘোষণা করল স্লোন। 'সুঁই'র সামান্য একটা গুঁতো ছাড়া আর কোন ব্যথা পাবে না তুমি। ইনজেকশনটা দেয়ার পরে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসবে তোমার কাছে, যদিও খানিক পরে বুঝতে পারবে

তোমাকে হিমায়িত করতে চলেছি আমরা। এরপর সীমাহীন নীরবতা ছাড়া আর কিছুই টের পাবে না।'

ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রইল লিন্ডা ছাদের দিকে, পুট করে ওর কোমল বাহুতে সুঁই ফোটাল স্লোন।

পরের কয়েক ঘণ্টা লিন্ডাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকল ওরা। গা থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নেয়া হলো, পরিবর্তে গ্ল্যাকো-স্যালাইন সল্যুশন ঢোকানো হলো। এ জিনিসটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও জমাট বাঁধবে না বা শরীরের কোন অঙ্গের ক্ষতি করবে না। লিন্ডাকে উজ্জ্বল সবুজ রঙের একটা ধাতব ক্যানিস্টারে শোয়ানো হলো। সারা শরীরে পেঁচানো হলো তার। তারগুলো ল্যাবরেটরির নানা যন্ত্রপাতির সাথে আটকানো। এটা আসলে একটা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রস্তুত কফিন। কয়েকটা সুইচ টিপতেই ক্যানিস্টারের ভেতরের তাপমাত্রা দ্রুত কমে আসতে লাগল।

'বন্ধ করে দাও.' নির্দেশ দিল স্লোন। ঢাকনি নামিয়ে সীল করে দেয়া হলো। তারপর ক্যানিস্টারটা ব্রানস্টোন এবং ডেভিস টেনে নিয়ে গেল দেয়ালের কাছে। দেয়ালটা আগেই খুঁড়ে গর্ত করে রাখা হয়েছে, ভেতরে ক্যানিস্টারটা বসিয়ে দিল ওরা। তারপর দ্রুত হাতে ফাঁকা দেয়াল ভরাট করে ফেলল ইঁট আর বালু দিয়ে।

স্লোন শেষবারের মত তাকাল দেয়ালের [illegible], ঘুরল সিঁড়ি ঘরের দিকে। ওদিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বিড়বিড় করে যে[illegible]জেকেই শোনাল, 'এখন তুমি আমাকে ঘৃণা করছ, মাইডিয়ার, কিন্তু একশো বছর পরে তোমার অনুভূতিটা অন্যরকমও হতে পারে।'

মূলঃ উইলিয়াম সিনক্লেয়ার-এর 'দ্য হরিফাইং এক্সপেরিমেন্টস অভ ড. জেসন স্লোন।']

ঘৃণা

এক

শিশুদের আমি ঘৃণা করি।

ওদের কষ্ট দিতে ভাল লাগে আমার। ভাল লাগে গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দিতে।

আমাকে পারভার্ট বলতে পারেন আপনারা। পাগল বললেও কিছু এসে যাবে না। কিন্তু খবরদার, 'বেঁটে বামুন' বলে কখনও খেপাবেন না। তা হলে খবর করে দেব। শক্তিতে হয়তো আপনার সাথে পারব না। কিন্তু আমাকে অপমান করার শোধ ঠিকই নেব। আপনার ঘরে যদি কাচ্চা-বাচ্চা থাকে তাহলে ওরা হবে আমার প্রতিশোধের শিকার। ধরে নিয়ে গিয়ে আগুনের ছ্যাঁকা দেব গায়ে। ওরা যন্ত্রণায় চিৎকার করবে। আমি তখন আনন্দে হাততালি দেব।

শিশুরা আমাকে দেখতে পারে না। 'বামন' বলে খেপায়। এক সময় চাকরের কাজ করতাম। এক বড়লোকের বাসায় পাঁচ বছরের বিচ্ছুটার ভয়ে সব সময় সিঁটিয়ে থাকতে হত। আমাকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে খুব আনন্দ পেত শয়তানটা। মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। কারণ ওই সময় আমার যাবার কোন জায়গা ছিল না। রাস্তায় ফেরিওয়ালার কাজটা ছেড়ে দিতে হয়েছে এই বিচ্ছুগুলোর যন্ত্রণায়। ওরা আমাকে যেখানে দেখে সেখানেই পিছু নেয়। 'বাঁটকু' 'বেঁটে বাটুল' 'বেঁটে ভূত' ইত্যাদি বলে খেপায়। আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু চেহারা এবং আকৃতি নিয়ে অপমান সইতে পারি না। জানি আমি দেখতে সুন্দর নই, তার ওপর ছোট বেলায় পোলিও রোগে একটা ঠ্যাং গেছে বাঁকা হয়ে। চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা ছিল না দিনমজুর বাপের। এক গাদা ভাইবোন আমরা। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গ্রাম থেকে পালিয়ে আসি আমি। পরে একটা চায়ের দোকানে কাজ জুটেছিল। কিন্তু খদ্দেরদের আমার চেহারা নিয়ে কটূক্তি সহ্য করতে না পেরে চাকরিটা ছেড়ে দিই। কিছুদিন আইসক্রীম বিক্রি করেছি। বিচ্ছুগুলো বাকি খেয়ে তাও লাটে উঠিয়ে দিয়েছে। ওদের তোয়াজ করতাম যাতে আমাকে আজে বাজে কথা না বলে। কিন্তু একেকটা লম্বায় আমার সমান হলে কি হবে, বুদ্ধিতে সব ক'টা ধাড়ি শয়তান। চেটেপুটে আইসক্রীম খাওয়া শেষ হলে 'বেঁটে বাঁটকু' বলে দৌড় দিত। ওদের সাথে দৌড়ে পারতাম না, নিষ্ফল আক্রোশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুসতাম।

গুলশানের বাড়িটাতে আমার চাকরি হয়েছে আইসক্রীম বিক্রি করতে গিয়ে। সোবহান সাহেবের বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। বাচ্চাটার বাবা-মা দু'জনেই চাকরি করেন একটা বিদেশী এমব্যাসীতে। অসুস্থ বিলটুর খেলার সাথী কেউ নেই। আমাকে ওই বাড়িতে চাকরি দেয়া হলো সার্কাসের ক্লাউন সেজে বিলটুর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। বিনিময়ে মাস গেলে মোটা বেতন। আগেই বলেছি,

তখন আমার আইসক্রীমের ব্যবসা লাটে ওঠার জোগাড়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাকরিটা নিলাম। আর প্রথম দিনই বিলটুর উদ্ভট নির্যাতনের শিকার হতে হলো। আমাকে ঘোড়া বানিয়ে, পিঠে উঠে আমার অর্ধেক চুল ছিঁড়ে ফেলল সে। আর 'হাঁট ঘোড়া হাঁট' বলে পেটে লাথি মেরে সে কালশিটে ফেলে দিল শরীরে। কোনমতে একটা হপ্তা টিকে থাকলাম। ততদিনে আমার সামনের পাটির দুটো দাঁত নড়ে গেছে বিলটুর লাথি খেয়ে, ডান কান সব সময় ঝাঁ ঝাঁ করে ও নলের মত কি একটা জিনিস ঢুকিয়ে জোরে ফুঁ দেয়ার পর থেকে। আমার বাঁ পা মচকে গেল ওর হুকুমে দোতলার সিঁড়ি লাফাতে গিয়ে। বিলটুর বিটকেলে নির্যাতনে আমার দিশেহারা অবস্থা। শুকনো, পাটখড়ির মত, মায়াবী চেহারার খুদেটার মাথায় অত দুর্বুদ্ধি জানলে আমি রাস্তায় ভিক্ষে করে পেট চালাতাম, জনমেও এ বাড়িতে আসতাম না। আসলে শিশুদের মত নিষ্ঠুর পৃথিবীতে নেই। ওরা দেব শিশু না ছাই। একেকটা ইবলিশের দোসর।

শিশুদের আমি এমনিতেই দেখতে পারি না। বিলটুর অত্যাচারে ওদের প্রতি ঘৃণা আমার আরও বেড়ে গেল। পালিয়ে যাব ঠিক করলাম। তার আগে বিলটুটাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।

রোববার দিন বিলটুর বাবা-মা যথারীতি অফিসে যাবার পর বিলটু আমার ওপর তার বিদঘুটে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করে দিল। ছোকরার নাকি হার্টের সমস্যা আছে। তাই ওকে এখনও স্কুলে ভর্তি করেননি সোবহান সাহেব। তবে বিলটুর মা ওকে বাড়িতে এ বি সি ডি শেখান। তাঁরা অফিসে যাবার আগে পইপই করে পুত্রধনকে বলে যান সে যেন দুষ্টুমি না করে বই-খাতা নিয়ে বসে। কারণ সামনের মাসে বাড়ির কাছে কিন্ডার গার্টেনটায় বিলটুকে ভর্তি করে দেবেন তাঁরা। বিলটুকে নিয়মিত স্কুলে যেতে হবে না, শুধু পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিলেই চলবে। তবে ভর্তি পরীক্ষায় তো আগে পাস করতে হবে। বিলটু সুবোধ ছেলের মত মাথা দোলালেও, যেই সোবহান সাহেবের গাড়ি গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়েছে, সাথে সাথে দুরন্ত গতিতে বাঁদরামি শুরু হয়ে গেল তার।

কিচেন থেকে একটা রঙিন মোমবাতি নিয়ে এল বিলটু। বলল, 'মজা দেখবে। এসো?' আমার হাত টানতে টানতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সে। দরজা বন্ধ করে পকেট থেকে একটা ম্যাচ বের করল। আমি তটস্থ হয়ে থাকলাম নতুন অঘটনের ভয়ে। বিলটু এবার বাথটাবের কল ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে টলটলে জলে ভরে গেল বাথটাব। তারপর জিন্সের ঢাউস প্যান্টের আরেক পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বের করল। বলল, 'এবার তুমি বাথটাবে নেমে পড়ো।'

'কেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'আহ্, নামোই না। মজা দেখবে।'

বিনাবাক্যব্যয়ে একান্ত অনুগত দাসের মত লুঙি পরেই বাথটাবে নেমে পড়লাম আমি।

বিলটু বলল, 'ডুব দাও। চোখ বন্ধ করে।'

আমি এক হাতে নাকে আঙুল টিপে ধরে মাথা ডুবিয়ে দিলাম পানিতে। হঠাৎ 'ছ্যাত ছ্যাত' শব্দ শুনে চোখ মেললাম। দৃশ্যটা দেখে ভয়ে আত্মা উড়ে গেল। বিলটু

জ্বলন্ত মোমবাতিটা উল্টো করে ধরে আছে, মোম গলে পড়ছে পানিতে আর 'ছ্যাত ছ্যাত' শব্দ হচ্ছে। আর বিরাট এক আরশোলা গরম মোমের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রাণপণে সাঁতার কাটছে বাথটাবে। নিচ থেকে ওটাকে দেখতে বিকট এবং ভয়ানক লাগছে। বিলটুর দাঁত বের করা মুখখানাও কিম্ভূতকিমাকার লাগল।

আরশোলাকে আমি ভয় পাই যমের মত। মুখ হাঁ করে চিৎকার করতে যেতে নাকের মধ্যে গড়গড় করে পানি ঢুকে গেল, খাবি খেয়ে লাফিয়ে উঠলাম আমি। নামতে গিয়ে পিছলা বাথরুমে পা পিছলে আলুর দম হয়ে গেলাম। মোজাইক করা মেঝেতে ভীষণভাবে ঠুকে গেল মাথাটা। পরক্ষণে কপালের কাছটা জ্বলে উঠল ভীষণভাবে। চেয়ে দেখি বিলটু হাসি মুখে জ্বলন্ত মোমবাতিটা উল্টো করে ধরে আছে আমার মুখের ওপর, ফোঁটায় ফোঁটায় গরম মোম গলে পড়ছে।

আর সহ্য হলো না। শুয়ে শুয়ে ল্যাং মেরে দিলাম বিলটুর পায়ে। প্যাঁকাটি বিলটু লাথি খেয়ে দড়াম করে পড়ে গেল আমার পাশে। মোমটা ছিটকে পড়ল বাথটাবের এক কোণে। বিদ্যুৎগতিতে ওটা তুলে নিয়ে বিলটুর যন্ত্রণায় হাঁ করা মুখে ঠেসে ধরলাম। বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল বিলটু আল জিভে জ্বলন্ত শিখার ছ্যাঁকা খেয়ে। আমি দু'হাতে চেপে ধরলাম ওর মুখ যাতে আর চিৎকার করতে না পারে। বিলটু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল, পা ছুঁড়ল কাটা মুরগীর মত, তারপর স্থির হয়ে গেল। বিলটুর মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। গ্যাঁজলা আর রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে হাত। রাগে আর ব্যথায় শরীর তখনও কাঁপছে আমার। শয়তানটা অজ্ঞান হয়ে আছে না মারা গেছে খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছেই হলো না। বিলটুর যে দশা আজ করেছি আমি, সোবহান সাহেব এসে দু'টুকরো করে ফেলবেন আমাকে। কাজেই পালাতে হবে। ঢাকা শহর ছেড়ে দূরে, অনেক দূরে। কেউ যেখানে আমার খোঁজ পাবে না কখনও।

দুই

বিলটু সম্ভবত মারা যায়নি। কারণ সোবহান সাহেবের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসার পর কোন পত্রিকায় শ্বাসরোধ হয়ে শিশু মৃত্যুর কোন খবর আমার চোখে অন্তত গত পনেরো দিনে পড়েনি। বলতে ভুলে গেছি, গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। যাহোক, প্রথম ক'টা দিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। এখনও যে নির্ভয়ে আছি তা বলব না। বলা যায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি। বিলটুদের বাসা থেকে পালানোর সময়ে আমার আগের জমানো টাকা আর বিলটুর গলা থেকে দু'ভরি ওজনের সোনার চেনটা নিয়ে এসেছি। চেন বা হারটা মফস্বলের এক সোনার দোকানে অর্ধেকেরও কম দামে বিক্রি করে সেই টাকায় এখনও চলছি। ঠিক করেছি এ দেশে আর থাকব না, সীমান্ত পার হয়ে ভারত চলে যাব। ওখানে কোন কাজ জুটিয়ে নেব। বিচিত্র ধরনের কাজের অভিজ্ঞতার তো কমতি নেই আমার। এখানে থাকা আমার জন্য ঝুঁকি। কারণ বিলটুর যে দশা করে

এসেছি, তাতে সাবহান সাহেব প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না। কে জানে গোপনে আমাকে পুলিশ খুঁজছে কিনা। তাই বড় শহর বাদ দিয়ে শুধু মফস্বল শহরগুলোতে ঘাপটি মেরে থাকার চেষ্টা করছি। আপাতত মঠবাড়িয়া শহরে আছি। এখান থেকে নদী পথে মংলা চলে যাব। ওখান থেকে জাহাজে চড়ে হুগলি পগার পার হব।

মঠবাড়িয়ায় আগে বাস চলত না, এখন চলে। আমি সেদিন বাসে চড়ে বড় মাউছ্যা নামে একটা জায়গায় যাচ্ছি, ভর ভরন্তি বাসে, আমার ঠিক সামনের সিটে এক কামলা শ্রেণীর মহিলা উঠল, কোলে ন'দশ মাসের বাচ্চা।

আমাকে সিগারেট খেতে দেখে সে ভয়ানক ভ্রূকুটি করল। পাত্তা দিলাম না। মহিলাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম বাইরের দিকে। মহিলা সিটে বসে বাঁ কাঁধে শোয়াল তার বাচ্চাকে, আঁচল দিয়ে বাতাস করতে লাগল। বাচ্চাটার পা ঝুলে রইল তার মা'র বুকের ওপর, মাথাটা কাঁধ আর ঘাড়ের মাঝখানে। কালো, স্বচ্ছ চোখ মেলে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকল সে আমার দিকে। খোদা জানে এই খুদে মানুষটা কি ভাবছে মনে মনে। আর তখুনি আমার ভেতরে দুষ্ট বুদ্ধিটা জেগে উঠল।

আমি বসে আছি বাসের একেবারে পেছনের সিটে, সামনে যাত্রীদের কালো কালো মাথা। আড়চোখে বার কয়েক এদিক-ওদিক তাকালাম। না, কেউ আমার দিকে তাকিয়ে নেই। ঠিক এই সময় বাচ্চাটা তার মধুরঙা মুখখানা খুলল হামি দিতে। আর সাথে সাথে জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠেসে ধরলাম বাচ্চাটার ছোট্ট, গোলাপী জিভে।

বেশ বেশ!

যদি আপনি থাকতেন ওখানে! এমন ভয়ানক চিৎকার জীবনেও শুনিনি আমি; যন্ত্রণা আর ভয়ে বিকট গলায় কেঁদে উঠল বাচ্চা। আমার গায়ের রোম পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল। সাথে সাথে সিগারেটটা পায়ের নিচে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে ফেললাম।

বাচ্চার হঠাৎ গগনবিদারী চিৎকারে হতভম্ব হয়ে গেল মা। যাত্রীরা 'কি হয়েছে? কি হয়েছে?' বলতে লাগল। বাচ্চা তখনও সমানে চিৎকার করেই চলেছে। আমিও সহানুভূতিশীল হয়ে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে? বাচ্চার মা তখনও বুঝে উঠতে পারেনি সন্তানের কান্নার কারণ। সে বাচ্চার হাত দেখছে, পা দেখছে, জামা উল্টে পেট দেখছে। বাচ্চা ওদিকে তারস্বরে কেঁদেই চলেছে। এমন সময় ব্রেক কষে থেমে গেল বাস। কি ব্যাপার? না, গন্তব্যে পৌঁছে গেছি আমরা। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল যাত্রীদের মাঝে কে আগে নামবে তাই নিয়ে। এখান থেকে অনেকেই লঞ্চে দূর-দূরান্তে যাত্রা করবে। ধাক্কাধাক্কির মধ্যে আমিও আলগোছে নেমে পড়লাম। নামার ঠিক আগের মুহূর্তে শুনতে পেলাম বাচ্চার মা আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'খোদারে, মোর মনুর মুখে কেডায় জানি আগুন চাইপা ধরছে।' আমার চলার গতি দ্রুত হলো। এখানে একটা নির্জন জায়গায় আমার আরেকটা গোপন ঘাঁটি আছে। ওখানে আমার কিছু মাল-পত্র আছে। ওগুলো নিয়ে আসতেই যাচ্ছি। তারপর আজ রাতে কেটে পড়ব এখান থেকে।

তিন

আমি শিপলু। আমার বয়স আট। আর আমার প্রাণের বন্ধু টুবলুর বয়সও আট। দু'জনেই বড় মাউছ্যা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস থ্রীতে পড়ি। কিছুক্ষণ আগে আমরা দু'জনে দারুণ একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। আমাদের বাসা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে একটা পুরানো ইঁটের ভাটা আছে। এখন আর ওখানে কেউ যায় না। কিন্তু আমি আর টুবলু বাবা মা'র চোখ এড়িয়ে সুযোগ পেলেই ওখানে চলে যাই। চোর-পুলিশ খেলি। কখনও আমি হই চোর, টুবলু পুলিশ। আবার টুবলু চোর, আমি পুলিশ।

যা হোক, যা বলছিলাম। আজ দুপুরে, বাবা যখন অফিসে আর মা খাওয়া-দাওয়া সেরে দিবানিদ্রায় মগ্ন, এইসময় 'টুই টুই' পাখির ডাকে বিছানা থেকে ভূতের মত নিঃশব্দে নেমে এলাম আমি। খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি টুবলু। ওর হাতে একটা ঝোলা। ওতে কি কি আছে সব চোখ বুজে বলে দিতে পারি আমি। একটা জংধরা পুরানো হ্যান্ডকাফ, (শিপলুর বাবা দারোগা। কাজেই এই জিনিসটা জোগাড় করতে কষ্ট হয়নি ওর। ওদের ভাঁড়ার ঘর থেকে হ্যান্ডকাফটা চুরি করেছে টুবলু। চাচী এ ব্যাপারে কিচ্ছুটি টের পায়নি, মাহতাব চাচা তো নয়ই।) একটা লম্বা রশি (চোরের হাতে শুধু হ্যান্ডকাফ পরালেই চলবে না, তার কোমরে রশি বাঁধতেও হবে।) আর কিছু স্কচ টেপ যে চোর সাজে তার মুখ অন্যজন টেপ দিয়ে বেঁধে দেয়। চুরির সাজা আর কি।

তো টুবলু আসতেই আমাদের গায়ে যেন পাখা গজাল। প্রায় উড়ে চলে গেলাম গোপন আস্তানায়। আর সেখানে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল লোকটাকে দেখে। আমাদের চেয়েও বেঁটে লোকটা মাথায় কাকের বাসা, ডান পা-টা বাঁকা, মুখে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। লোকটা ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে ভাটির পশ্চিম দিকে, গুহামত জায়গাটায়। গুহা থেকে হাত দশেক দূরে আমাদের চোর-পুলিশ খেলার স্থান। ওখানে আমাদের কিছু গোপন জিনিসপত্র আছে। দ্রুত সব পরীক্ষা করে দেখলাম। না ঠিক আছে, হারায়নি কিছু। কিন্তু বেঁটে বামনটার আকস্মিক অনুপ্রবেশে সাংঘাতিক বিরক্ত হলাম দু'জনে। এ লোকটাকে এর আগে কখনও দেখিনি এদিকে। উড়ে এসে জুড়ে বসল নাকি? বেজায় মেজাজ খারাপ হলো। আর তক্ষুণি মাথায় দারুণ একটা বুদ্ধি এল। টুবলুকে ডেকে কানে কানে বললাম প্ল্যানটার কথা। উত্তেজনায় চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর। জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে আমার কথায়। আর সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে পড়লাম দু'জনে।

লোকটার ঘুম কি গভীর রে, বাবা! আমাদের খিকখিক হাসি, পায়ের শব্দ কিছুই টের পাচ্ছে না। যখন একসাথে লাফিয়ে পড়লাম ওর বুকের ওপর এবং চট করে হ্যান্ডকাফ জোড়া পরিয়ে দিলাম হাতে, ধড়মড় করে জেগে গেল সে। উঠে বসতে গেল। কিন্তু আমি ওকে মাটির সাথে জোরে চেপে ধরে থাকলাম আর টুবলু দক্ষ

হাতে লোকটার পা বেঁধে ফেলল দড়ি দিয়ে। দারোগার ছেলে হলে এ সব কাজ কারও কাছে শিখতে হয় না। লোকটা চেঁচামেচি শুরু করে দিল। কিন্তু আমি আর টুবলু জোরে মুখ চেপে ধরে থাকলাম। টুবলু ঝোলা থেকে স্কচ টেপ বের করে কষে লোকটার মুখে লাগিয়ে ফেলল। এখন যতই চিৎকার করো আর শব্দ শোনা যাবে না। অসহায়ভাবে ঘোঁত ঘোঁত করতে থাকল লোকটা। মজা পেয়ে হাততালি দিলাম আমরা। কিন্তু এটুকু মজায় আমাদের হবে না, আরও মজা পেতে হবে। বিশেষ করে চোরদের শাস্তি দেয়ার মধ্যে দারুণ মজা আছে। যদিও সে সুযোগ আমরা কেউই পাই না। আমরা অনেক কিছুই করতে পারি না বড়দের চোখ রাঙানি আর থাপ্পড়ের ভয়ে। বড়রা যেটা করতে নিষেধ করে ঠিক সেই কাজটা করতে যে কি মজা তা যদি ওরা জানত! বাবা-মা আর বড় ভাইয়ার শাসনের ঠেলায় ওষ্ঠাগত প্রাণ আমার। টুবলুরও। ওর বড় বোনটা তো পান থেকে চুন খসলেই বেধড়ক পিট্টি লাগায় বেচারা টুবলুকে। একটুও মায়া করে না। এজন্য বড়দের দেখতে পারি না আমরা। সবসময় ওদের অনিষ্ট করার চিন্তা গিজগিজ করে মাথায়। ইচ্ছে করে ওদের ধরে মারতে। কিন্তু শক্তিতে পারব না বলে সাহসে কুলোয় না। তবে একটা ধেড়ে ইঁদুরকে তো পেয়েছি। এবার এটাকে নিয়ে একটু মজা করা যাক।

চড়ুইভাতি খাওয়ার জন্য আমি আর টুবলু আমাদের গোপন আস্তানায় ছোট হাঁড়ি-পাতিল, ম্যাচ ইত্যাদি সব রেখে দিয়েছি। করলাম কি, শুকনো ডাল পাতা কুড়িয়ে এনে তাতে আগুন জ্বালালাম। তার মধ্যে দুটো লোহার শিক গুঁজে দিলাম। মা তার লাকড়ির চুলোয় আগুন উস্কে দিতে এই শিকগুলো ব্যবহার করে। আমি একটা শিক রান্নাঘর থেকে চুরি করেছি আর টুবলু ওরটা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে।

দেখতে দেখতে লোহার শিকের ডগাটা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু টুবলু বলল তার শিকের ডগা সাদাটে রঙের না হওয়া পর্যন্ত ওটা সে তুলবে না। টিভির ছবিতে এভাবে লোহার শিক গরম করতে দেখেছে ও।

আমার শিকটা যথেষ্ট গরম হয়েছে। আমি ওটা দিয়ে বামনটার পায়ে, হাতে আর মুখে ছ্যাঁকা দিতে শুরু করলাম। টুবলুও একটু পর তাই করতে লাগল। সেই সাথে দেখা গেল মজা।

টেপ দিয়ে মুখ বন্ধ বেঁটে লোকটা অদ্ভুত সব ভোঁতা, ফাঁপা শব্দ করতে লাগল। শরীর মোচড় খাচ্ছে মাটিতে কাটা সাপের মত। পা বাঁধা বলে উঠেও দাঁড়াতে পারছে না। ওর চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। চিবুক বেয়ে বিশ্রী রঙের তরল পদার্থ টপটপ করে পড়তে শুরু করল। আমরা বাঁটকুলটার দশা দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ি আর কি!

আচ্ছা, ওর বিস্ফারিত চোখের মধ্যে যদি গরম শিকটা ঢুকিয়ে দেয়া যায়?

ঠিক এই ভাবে।

ওয়াক থুঃ, মাংস পোড়ার কি বিশ্রী গন্ধ!

একটু পরে নড়াচড়া থেমে গেল লোকটার। চিৎ হয়ে পড়ে থাকল সে মাটিতে। চোখের জায়গায় মণি নেই, লাল ঘা দগদগ করছে। আমার গা গুলিয়ে উঠল। তবে আনন্দও হচ্ছে বেশ। খেলাটা জমেছিল চমৎকার। সুযোগ পেলে এরকম খেলা আরও খেলব বড়দের নিয়ে, একমত হলাম আমি আর টুবলু।

বড়দের আমরা ঘৃণা করি।
ওদের কষ্ট দিতে ভাল লাগে আমাদের।
ভাল লাগে গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দিতে।

[নরম্যান কাউফম্যানের 'ফ্লেইম'-এর ছায়া অবলম্বনে]

উদ্বাস্তু

শ্রমিক দিবসের পর থেকেই হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করল। সামার কটেজের লোকজন ফিরে যেতে লাগল যে যার বাড়ি। লস্ট লেকে জমতে শুরু করল বরফ। ওখানে সলি ভিনসেন্ট ছাড়া কেউ থাকে না। ভিনসেন্ট মোটাসোটা মানুষ। বছরখানেক আগে, বসন্তে লেকের পাড়ের বাড়িটি কিনেছে। সারাটা গ্রীষ্ম তার কেটেছে স্পোর্টস শার্ট পরে। কেউ কখনও তাকে শিকারে যেতে বা মাছ ধরতে দেখেনি। যদিও প্রতি হপ্তায়, ছুটির দিনে শহর থেকে বন্ধুবান্ধব এনে বাড়িতে বসে ফুর্তিফার্তি করে ভিনসেন্ট। বাড়ি কিনেই সে দরজার সামনে বিরাট এক সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে—সনোভা বীচ।

শহরে খুব কম আসত ভিনসেন্ট। একদিন দেখা গেল সে ডক'স বার-এ ঢুকেছে। তারপর মাঝে মাঝে সে আসতে শুরু করল, ব্যাক রুমে নিয়মিত জুয়াড়ীদের সাথে কার্ড খেলল।

পোকারটা ভালই খেলে ভিনসেন্ট, সুগন্ধী, দামী সিগার খায়। কিন্তু নিজের সম্পর্কে বলে না কিছুই। একদিন স্পেকস হেনেসি তাকে সরাসরি একটা প্রশ্ন করে বসলে জানায়, সে এসেছে শিকাগো থেকে। আগে ব্যবসা করত। এখন কিছুই করে না। তবে কিসের ব্যবসা করত জানায়নি ভিনসেন্ট।

ভিনসেন্ট হয়তো মুখে সব সময় তালা দিয়েই রাখত যদি না সেদিন স্পেকস হেনেসি তাকে সোনার মোহরগুলো দেখাত।

'এ জিনিস দেখেছে কেউ কখনও আগে?' জিজ্ঞেস করে হেনেসি তার বন্ধুবান্ধবদের। কেউ কিছু বলে না। তবে ভিনসেন্ট একটা মোহর তুলে নেয় টেবিলের ওপর থেকে।

'জন্মদিন, তাই না?' বিড়-বিড় করে ভিনসেন্ট। 'দাড়িঅলা লোকটা কে—বিসমার্ক?'

খিক-খিক হাসে স্পেকস হেনেসি। 'এবার ধরা খেয়ে গেছ, বন্ধু। ওটা বুড়ো ফ্রাঙ্ক জোসেফের ছবি। অস্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের নেতা ছিল, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। ব্যাঙ্কে এই তথ্যটাই দিয়েছে ওরা আমাকে।'

'কোত্থেকে পেয়েছ এ জিনিস? স্লট মেশিনে?' জানতে চায় ভিনসেন্ট। এদিক-ওদিক মাথা নাড়ে হেনেসি। 'একটা ব্যাগে। বোঝাই ছিল সোনার মোহরে।'

এই প্রথম ভিনসেন্টকে কোন ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখে সবাই। মোহরটা আবার হাতে নিয়ে মোটা আঙুলের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করে, 'ঘটনাটা বলবে আমাকে?'

গল্পবাজ হেনেসির উৎসাহের অভাব নেই। 'খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার।' বলতে শুরু করল সে। 'গত বুধবার অফিসে বসে আছি। এমন সময় এক ভদ্রমহিলা এসে জানতে চাইল আমি রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করি কিনা এবং বিক্রি করার মত কোন লেক প্রপার্টির সন্ধান জানা আছে কিনা আমার। বললাম, অবশ্যই জানা আছে। লস্ট

লেকের ধারে শূলজ কটেজটি বিক্রি হবে। আসবারপত্রসহ।

'মহিলা দেখতে চাইল বাড়িটি। বললাম, কোন অসুবিধা নেই। কাল দেখাতে পারব। কিন্তু মহিলা বলল, সে ওই রাতেই বাড়ি দেখতে চায়।

'আমি নিয়ে গেলাম তাকে বাড়ি দেখাতে। বাড়ি দেখে পছন্দ হয়ে গেল তার। বলল, কিনবে। নির্দেশ দিল কাগজপত্র ঠিক করতে। সে সোমবার রাতে এল এক ব্যাগ বোঝাই মোহর নিয়ে। তা'র ব্যাঙ্কের হ্যাঙ্ক ফেলচকে ডেকে এনেছিলাম দেখাতে মোহরগুলো নকল কিনা। সে বলল সব ঠিক আছে।' খিক-খিক হাসল হেনেসি। 'তখন আমি ফ্রানজ জোসেফের নামটা জানতে পারি।' ভিনসেন্টের কাছ থেকে মোহরটি নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিল সে। 'যা হোক, মনে হচ্ছে তুমি নতুন এক প্রতিবেশী পেয়ে যাচ্ছ। শূলজের বাড়ি থেকে তোমার কটেজের দূরত্ব আধা মাইলও না। ভাল কথা, মহিলার নাম হেলেন এস্টারহেজি। সম্ভবত হাঙ্গেরিয়ান রিফুজি। কাউন্টেস জাতীয় কিছু একটা হবে। হয়তো দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। এমন কোথাও লুকিয়ে থাকতে চায়, যেখানে কম্যুনিস্টরা তার খোঁজ পাবে না। তবে আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। কারণ মহিলা নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেনি।'

'কি পোশাক পরনে ছিল মহিলার?' জিজ্ঞেস করে ভিনসেন্ট।

'লাখ টাকা দামের পোশাক।' হাসে হেনেসি তার দিকে তাকিয়ে। 'কেন ওকে বিয়ে করার চিন্তা করছ নাকি? ওর টাকার জন্য? তবে মহিলাকে দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। কথা বলার ঢং অনেকটা অভিনেত্রী শা শা গেবর-এর মত। চেহারাতেও খানিকটা মিল রয়েছে। তবে মহিলার চুলের রঙ লাল। আমি যদি বিয়ে না করতাম, তাহলে–'

'বাড়িতে কবে উঠছে সে?' বাধা দেয় ভিনসেন্ট।

'বলেনি। তবে দু'একদিনের মধ্যেই হয়তো উঠে যাবে।'

হাই তুলে উঠে দাঁড়ায় ভিনসেন্ট।

'আরে, চললে কোথায়? খেলা মাত্র শুরু হয়েছে–'

'ক্লান্ত লাগছে,' বলল ভিনসেন্ট। 'বাড়ি যাব।'

বাড়ি ফিরে এল ভিনসেন্ট। তবে সে রাতে ঘুম এল না। সারাক্ষণ নতুন প্রতিবেশীর কথা ভাবল।

নতুন একজন প্রতিবেশী পেয়ে খুশি হয়নি ভিনসেন্ট। সে যতই সুন্দরী হোক না কেন। ভিনসেন্ট নিজেও এক ধরনের রিফুজি। উত্তর থেকে পালিয়ে এসেছে। শুধু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ছাড়া কারও সাথে যোগাযোগ নেই তার। এদেরকে বিশ্বাস করে সে। এরা ছিল তার ব্যবসার সহকারী। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের চেহারা আর দেখতে চায় না ভিনসেন্ট। কখনও নয়। এদের কেউ কেউ প্রতিহিংসা পরায়ণ আর ভিনসেন্টের প্রাক্তন ব্যবসায় প্রতিহিংসা ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে।

এসব ভেবে রাতে ভালভাবে ঘুমাতে পারল না ভিনসেন্ট। তবে বালিশের নিচে তার পুরানো ব্যবসার ছোট একটি স্যাভেনির কেন রেখে দিল সে তা কেউ বলতে পারবে না।

পরদিন ভিনসেন্ট সিদ্ধান্ত নিল নতুন প্রতিবেশীর ওপর নজর রাখবে। কারণ তার সন্দেহ হচ্ছে মহিলার প্রতি। মহিলা হাঙ্গেরিয়ান উদ্বাস্তু হলেও কে বলতে পারবে তাকে প্ল্যান করে এখানে পাঠানো হয়নি?

সকাল সকাল শহরে গেল ভিনসেন্ট। দামী একজোড়া বিনকিউলার কিনে আনল। তারপর নজর রাখতে শুরু করল শূলজের বাড়ির দিকে।

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে শূলজের বাড়ি পরিষ্কার দেখা যায়। একটা ছোট ভ্যান নতুন প্রতিবেশীর জিনিসপত্র নিয়ে এল। জিনিস বলতে কতগুলো বাক্স এবং ক্রেট। ভ্যানের লোকজন ধরাধরি করে নামাল বাক্সপেঁটরা। মনে হলো বেশ ভারী। বাক্সের মধ্যে কি সোনার মোহর আছে? ভাবল ভিনসেন্ট। অপেক্ষা করতে লাগল বাড়ির নতুন মনিবনী কখন আসে দেখার জন্য। ভ্যান চলে গেল কিন্তু মহিলার দেখা মিলল না। সমস্ত বিকেল বিনকিউলার চোখে ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে হাত এবং চোখ দুইই ব্যথা হয়ে গেল। ভিনসেন্ট বিনকিউলার রেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রান্নায়। খিদে লেগেছে। একটা স্টিক ভাজল সে। খেল। তারপর লেকের পাড়ে তাকাল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। শূলজের বাড়ির জানালায় জ্বলে উঠেছে আলো। তার মানে মহিলা এসেছে। কখন এল? ভিনসেন্ট যখন রান্নায় ব্যস্ত নিশ্চয়ই তখন।

আবার বিনকিউলার চোখে তুলল ভিনসেন্ট। যে দৃশ্য দেখল তাতে বিনকিউলারটি তার হাত থেকে প্রায় খসে পড়ে যাচ্ছিল।

মহিলার বেডরুমের পর্দা ওঠানো। মহিলা শুয়ে আছে বিছানায়। গায়ে কিছু নেই। সোনার মোহরে সমস্ত শরীর ঢাকা।

চোখ কচলে আবার বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করল ভিনসেন্ট। না, ভুল দেখেনি সে। সত্যি মহিলার গা ভরা সোনার মোহর, বাতির আলোতে ঝলকাচ্ছে। লাল টকটকে চুল তার, ডিম্বাকৃতি, মুখখানা বিষণ্ন, বড় বড় চোখ, উঁচু চোয়াল। ঠোঁটজোড়া দেখে মনে হলো হাসছে। সোনার মোহর ভরা গায়ে হাত বোলাচ্ছে।

ভিনসেন্ট টের পেল তার গলা শুকিয়ে এসেছে, দপদপ লাফাচ্ছে কপালের একটা শিরা। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল লম্বা, ফর্সা মোহরে ঢাকা শরীরটার দিকে। অনেকক্ষণ পরে বিনকিউলার নামাল ভিনসেন্ট। জানালার পাল্লা বন্ধ করল। তারপর থম মেরে বসে রইল। সে রাতেও ঘুম হলো না তার।

পরদিন সকালে ইলেকট্রিক রেজর দিয়ে দাড়ি কামাল ভিনসেন্ট। লোশন মাখল গায়ে। নতুন টাই পরল। তারপর মুখে চওড়া হাসি ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোল শূলজের কটেজের দিকে।

কটেজের দরজায় নক করল ভিনসেন্ট।

কোন সাড়া নেই।

আবার কড়া নাড়ল ভিনসেন্ট।

কেউ সাড়া দিল না।

ডজনখানেক বার ঘন ঘন কড়া নেড়েও লাভ হলো না কোন। কটেজের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ। ভেতর থেকে কারও সাড়া শব্দ মিলল না।

দরজা ভেঙে ঢুকতে পারে ভিনসেন্ট। মহিলাকে সত্যি কেউ পাঠিয়েছে কিনা জানে না সে। অবশ্য পকেটে ছোট্ট স্যুভেনিরটা আছে তার। যে কোন ঘটনার জন্য

প্রস্তুত। মহিলার সোনার মোহর মেরে দেয়ার ইচ্ছে তার নেই। মহিলাকে খুব পছন্দ হয়েছে তার। সত্যিকারের কাউন্টেস হবে হয়তো। এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে মন্দ হয় না। তবে জোর করে ঢোকা ঠিক হবে না ভেবে ফিরে গেল ভিনসেন্ট। সারাদিন জানালার ধারে বসে রইল সে। অপেক্ষা করল। মহিলার দেখা মিলল না। সম্ভবত কেনাকাটা করতে শহরে গেছে। তবে ফিরে আসবে। আর ফিরে আসলেই–

এবারও হেলেন কখন বাড়ি ফিরল দেখা হলো না ভিনসেন্টের। ওই সময় সে বাথরুমে ছিল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাথরুম থেকে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসতেই ভিনসেন্ট দেখতে পেল হেলেনের বাড়িতে আলো জ্বলছে। এবার আর দ্বিধা করল না ভিনসেন্ট। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল হেলেনের বাড়িতে। সদর দরজায় কড়া নাড়ার মুহূর্তে একটু ইতস্তত করল। শেষে টোকা দিল দরজায়। দরজা খুলে দিল হেলেন।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হেলেন, চেয়ে আছে অন্ধকারে। বাতির আলো পড়েছে তার লাল চুলে। জ্বলজ্বল করছে। পরনে লম্বা গাউন।

'বলুন?' বিড়বিড় করল হেলেন।

ঢোক গিলল ভিনসেন্ট। মেয়েটা এত সুন্দরী বুঝতে পারেনি। এই মেয়ের সাথে কথা বলতে হবে বুঝে শুনে।

'আমার নাম সলি ভিনসেন্ট,' অবশেষে বলল সে। 'আমি আপনার প্রতিবেশী। লেকের ওধারে থাকি। শুনলাম আপনি নতুন এসেছেন এখানে। তাই পরিচয় করতে এলাম।

'তো?'

হেলেন তাকিয়ে আছে ভিনসেন্টের দিকে। হাসছে না। নড়ছে না। অস্বস্তি লাগল ভিনসেন্টের।

'আপনি হেলেন, তাই না? শুনেছি আপনি হাঙ্গেরিয়ান। এদিকে বোধ হয় এই প্রথম এসেছেন। এখনও থিতু হতে পারেননি। আর–'

'আমি এখানে ভালই আছি।' বলল হেলেন। এবারও হাসল না সে, নড়াচড়াও করল না। স্রেফ মূর্তির মত তাকিয়ে আছে। ঠাণ্ডা, কঠিন, সুন্দরী একটি পাষাণ মূর্তি।

'শুনে খুশি হলাম। আপনি আমার বাড়িতে একবার পা দিলে ধন্য হব। আমার বাড়িতে টোকে ওয়াইন আছে, আছে বড় একটি রেকর্ড প্লেয়ার, বেশ কিছু ক্লাসিক মিউজিকসহ। এমনকি সেই বিখ্যাত সঙ্গীত হাঙ্গেরিয়ান র‍্যাপসডি'র দুর্লভ কালেকশনও রয়েছে আমার কাছে। এ ছাড়া–'

হঠাৎ হেসে উঠল মেয়েটা। হাসির দমকে গোটা শরীর কাঁপছে, কিন্তু বরফ-সবুজ চোখজোড়া হাসছে না তার। অবশেষে হাসি থামাল হেলেন। বরফ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নো। থ্যাঙ্কিউ। আমি এখানে ভাল আছি। আমাকে কেউ বিরক্ত না করলেই বরং খুশি হব।'

'তাহলে অন্য কোনদিন–

'আবারও বলছি আমি চাই না কেউ আমাকে বিরক্ত করুক। এখন বা অন্য কোন সময়। গুড ইভনিং মি.–' বলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল হেলেন।

বেকুব বনে গেল ভিনসেন্ট। তারপর রাগ হলো খুব। তার মুখের ওপর এভাবে দরজা বন্ধ করে দেয়া? কেউ সলি ভিনসেন্টকে অপমান করে পার পায়নি। অতীতে পায়নি, এখনও পাবে না। মেয়েটাকে একটা শিক্ষা দিতেই হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে ভিনসেন্ট কি জিনিস। রাগে ফুলতে ফুলতে বাড়ি ফিরে এল ভিনসেন্ট। ওরকম মেয়ে না হলেও তার চলবে। পুরুষ মানুষের টাকা থাকলে বিয়ে করা আবার সমস্যা নাকি?

টাকা। হ্যাঁ, মেয়েটার অনেক টাকা আছে। নিজের চোখে দেখেছে ভিনসেন্ট। নিশ্চয়ই ওই ক্রেটগুলো বোঝাই সোনার মোহরে। হেলেন ক্রেটের ভেতরে মোহর লুকিয়ে রেখেছে কম্যুনিস্টদের ভয়ে। কম্যুনিস্টরা জানতে পারলেই মোহরগুলো কেড়ে নেবে। কিন্তু ভিনসেন্ট নিচ্ছে না কেন? কে তাকে সাধু সেজে বসে থাকতে বলেছে? বিশেষ করে এত বড় অপমানের পরেও।

প্ল্যানটা সাথে সাথে মাথায় এল। শহরে গিয়ে কার্নি আর ফ্রমকিনকে খবর দিলেই হলো। ওরা সকল কাজের কাজী। মেয়েটা বাড়িতে একা! তিন মাইলের মধ্যে আর কেউ নেই। ঘটনা ঘটার পরে কেউ কোন সন্দেহও করবে না। ভাববে কম্যুনিস্টরা এসে মেরে রেখে গেছে মেয়েটাকে। যাবার সময় লুঠ করে নিয়ে গেছে সোনার মোহর।

পরদিন কার্নি আর ফ্রমকিনকে খবর দিল ভিনসেন্ট। বলল, রাত ন'টার মধ্যে বাসায় চলে আসতে। কাজ আছে। সাক্ষাতে বাকি কথা হবে।

কার্নি আর ফ্রমকিন যথাসময়ে হাজির হয়ে গেল ভিনসেন্টের বাড়িতে। ভিনসেন্ট তখনও বিষয়টি নিয়ে ভাবনায় মশগুল। তার চেহারা দেখেই কার্নি বুঝতে পারল কিছু একটা ভজকট আছে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল কার্নি।

হাসল ভিনসেন্ট। 'তোমাদের গাড়ি ঠিক আছে তো? কিছু মাল নিয়ে যেতে হবে শহরে।'

'কি মাল?' বলল ফ্রমকিন।

'তা এখন বলা যাবে না। আমি মাল নিয়ে আসব।'

'কোথায় ওটা?'

'মাল আনতেই বেরুচ্ছি।'

ও ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়িতে ওদেরকে বসে থাকতে বলে গেল ভিনসেন্ট। বলল, আধাঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

ওদেরকে বলেনি ভিনসেন্ট কোথায় যাচ্ছে। ওরা অনুসরণ করে কিনা বোঝার জন্য বাড়িটাতে বার দুয়েক চক্কর দিল ভিনসেন্ট। কার্নিরা পিছু নেয়নি বোঝার পরে হনহন করে এগোল হেলেনের কটেজের দিকে। বেডরুমের জানালায় আলো জ্বলছে। এবার হেলেনকে মজা দেখিয়ে ছাড়বে ভিনসেন্ট। সে কি জিনিস বুঝবে মেয়েটা।

হেলেনের কি দশা করবে ভেবে মুচকি হাসছিল ভিনসেন্ট। হঠাৎ খেয়াল করল নিভে গেছে বেডরুমের আলো। তার মানে ঘুমাবে হেলেন। ঘুমাবে মোহরের বিছানায়। ভালই হলো। ভিনসেন্টকে কড়া নাড়তে হবে না। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে। আঁতকে উঠবে হেলেন।

সদর দরজা ভাঙতে হলো না। খোলাই ছিল। পা টিপে টিপে এগোল ভিনসেন্ট। চাঁদের আলো গলে পড়ছে জানালা দিয়ে। প্রায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব কিছু। হঠাৎ গলার কাছটা ভারভার ঠেকল ভিনসেন্টের। খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লে এমন হয় তার।

বেডরুমের দরজা খুলে ফেলল ভিনসেন্ট। জানালার পর্দা তোলা বলে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত ঘর। আলো পড়েছে বিছানায় শুয়ে থাকা হেলেনের ওপর। তার গা ভর্তি সোনার মোহর। চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে। এমন সময় হেলেনের বরফ-সবুজ চোখজোড়া খুলে গেল। ভিনসেন্টের সাথে চোখাচোখি হলো। সেই ফাঁকা দৃষ্টি চোখে। হঠাৎ অদ্ভুত একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। সবুজ আগুনের মত জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল চোখজোড়া। হাত বাড়িয়ে দিল হেলেন। ডাকছে ওকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ভিনসেন্ট। হঠাৎ পচা কাদামাটির গন্ধ ভক্ করে লাগল নাকে। মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে নেই হয়ে গেল হেলেন। পরক্ষণে পেছন থেকে একটা ধাক্কা খেল ভিনসেন্ট। হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিছানায়। বিছানা কোথায়? এ তো পচা কাদা! উঠে বসতে গেল ভিনসেন্ট, হেলেন চট করে ওর হাত ধরে ফেলল, মুচড়ে নিয়ে গেল পিঠের ওপর। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল ভিনসেন্ট। ধস্তাধস্তি করতে লাগল। মেয়েটার গায়ে কি শক্তি! ওর সাথে কিছুতেই পেরে উঠছে না ভিনসেন্ট। মেয়েটা ঠাণ্ডা, শক্ত কি একটা জিনিস দিয়ে যেন বাড়ি মারল ওকে। আমার পিস্তল, ভাবল ভিনসেন্ট। নিয়ে গেছে পকেট থেকে।

একটু পরে গরম একটা তরল ধারা গড়িয়ে পড়তে শুরু করল ভিনসেন্টের মুখ বেয়ে। রক্ত! গা গুলিয়ে উঠল মেয়েটা ওর রক্ত চেটে খাচ্ছে দেখে।

হেলেন খাটের সাথে খুব শক্তভাবে বেঁধে ফেলেছে ভিনসেন্টকে। নড়তে পারছে না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। বাতাসে পচা মাটির গা গোলানো গন্ধ। শুধু বিছানা নয়, মেয়েটার গা থেকেও আসছে। মেয়েটা হাসছে।

'শেষ পর্যন্ত তুমি এলে, অ্যাঁ?' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা। 'তোমাকে আসতেই হলো, না? বেশ করেছ এসেছ। এখন থেকে তুমি এখানে থাকবে। আমি তোমাকে আমার পোষ্য করে রেখে দেব। তুমি বেশ মোটাতাজা আছ। গায়ে অনেক রক্ত। তোমাকে দিয়ে অনেক দিন চলে যাবে আমার।'

মেয়েটার মুখ থেকে কথা বলার সময় তীব্র দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে। মুখ সরিয়ে নিল ভিনসেন্ট। আবার হেসে উঠল মেয়েটা।

'এরকম প্ল্যানই করেছিলে তুমি, তাই না? আমি জানি তুমি কেন এসেছ। মোহরের জন্য। সোনার মোহর আর কাদা মাটি নিয়ে এসেছি আমি আমার দেশ থেকে। ওর ওপর সারাদিন ঘুমাই আমি। জেগে উঠি রাতের বেলা। আর রাতে যখন জেগে উঠব তখন তুমি থাকবে এখানে। কেউ আমাদের খোঁজ পাবে না। বিরক্ত করতেও আসবে না। তাগড়া শরীর তোমার। আমার খিদে মিটবে ভাল ভাবেই।'

ভিনসেন্ট কর্কশ গলায় বলল, 'না! তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে ঠাট্টা করছ। তুমি একটা উদ্বাস্তু–'

আবার হাসল মেয়েটা। 'হ্যাঁ। আমি উদ্বাস্তু। তবে রাজনৈতিক উদ্বাস্তু নই। জিভ বের করল সে। ভিনসেন্ট তার দাঁত দেখতে পেল। লম্বা, সাদা দাঁত, ঠোঁটের কোণা

দিয়ে বেরিয়ে আছে। এগিয়ে এল ভিনসেন্টের ঘাড় লক্ষ্য করে…

ওদিকে ভিনসেন্টের বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষায় থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে নিজেদের গাড়িতে উঠে বসেছে কার্নি এবং ফ্রমকিন।

ও আজ আর আসছে না,' বলল কার্নি। 'মনে হচ্ছে কোন ঝামেলা হবে। ওর চেহারায় ঝামেলার আভাস দেখতে পেয়েছি আমি। অদ্ভুত লাগছিল ওকে।'

'ঠিক,' সায় দিল ফ্রমকিন। 'কিছু একটা হয়েছে ভিনসেন্টের। তবে কোন ঝামেলা বাধার আগেই কেটে পড়ি চলো।'

[মূলঃ রবার্ট ব্লচের 'দ্য রিফুজী']

***